বাদশাহী আমল

ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত Travels in the Mogul Empire (1656-1668 A. D.) অবলম্বনে

বিনয় ঘোষ

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ
চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ
প্রকাশক
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রক
বরুণ চৌধুরী
দি বাণী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গে

বাদশাহী আমল কয়েক বছর পুনর্মুদ্রিত হয়নি। বর্তমানের বোঝার চাপে অতীতের বাদশাহী আমলের কথা মনেই পড়েনি। মনে পড়ল 'অরুণা প্রকাশনী'র আগ্রহের জন্য এবং সেজন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মুদ্রণকালে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি, নভেম্বর ১৯৭৭ থেকে জানুয়ারী '৭৮ পর্যন্ত। তাই আমার পক্ষে কপি বা প্রুফ কোনটাই দেখা বা সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। মোটামুটি আমার নির্দেশে প্রকাশকরাই সেই দায়িত্ব বহন করেছেন। কিন্তু ভুলত্রুটি যদি কিছু থাকে, ঐতিহাসিক তথ্যের বা বিষয়ের, তাহলে তার জন্য দায়ী আমি, প্রকাশক নন।

'বাদশাহী আমল' প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা। তবু আজকের দিনেও, বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, সেই পুরনো যুগের কথা রূপকথা মনে হবে না। তার কারণ জিনিসপত্রের মূল্য ছাড়া যাকে 'লাইফ-স্টাইল' বলে সেইদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় আজও আমরা নতুন এক 'বাদশাহী আমলে' বাস করছি, যদিও বাদশাহ সাজাহান বা ঔরঙ্গজীব কেউ আজ জীবিত নেই।

বিনয় ঘোষ

বৈশাখ ১৩৮৫
এপ্রিল ১৯৭৮

অনুবাদপ্রসঙ্গে

"One can read nothing more brilliant, vivid and striking than old Francois Bernier (nine years' physician to Aurangzebe), KARL MARX

বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিনি। সম্পূর্ণ অনুবাদ করার কোনো সার্থকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। অনুবাদ না বলে বরং 'বাদশাহী আমল' বার্নিয়েরের অবলম্বনে রচিত বলা যায়। সেকালের সব ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে এমন অনেক বিষয়ের বিবরণ পাওয়া যায়, যার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমানে নেই। যেমন যুদ্ধযাত্রার বিবরণ, কি রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের যান্ত্রিক বিবরণ। এ-সবের যে কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই, এমন কথা বলব না। যেমন, যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণের মধ্যে সেযুগের সামরিক ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল যেটুকু আছে তা বার্নিয়েরের বৃত্তান্ত থেকে এখানে অনুবাদ করে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমানযুগের যে-কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসের বইয়ে সে সব বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে। যা নেই তা হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণগুলি। সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণের জন্যই বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইতিহাস-সাহিত্যে স্থায়ী আসন দখল করে রয়েছে। যাঁরা মোগলযুগের ইতিহাস নিয়ে বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বার্নিয়েরের সম্পর্কে একথা বলেছেন। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, ১৮৫৩ সালে, কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরীশ এঙ্গেল্‌সের মতন সমাজ-বিজ্ঞানীরাও বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হননি। কার্ল মার্ক্স একখানি পত্রে এঙ্গেল্‌সকে লিখেছিলেন: "...One can read nothing more brilliant, vivid and striking than old Francois Bernier (nine years' physician to Aurangzebe) :" পত্রের উত্তরে এঙ্গেল্‌স লিখেছিলেন: "Old Bernier's things are really very fine. It is a real delight once more to read something by a sober old clear-headed Frenchman, who keeps hitting the nail on the head"...বার্নিয়েরের প্রসঙ্গে এই পত্র দু'খানির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণমূল্য খুব বেশি বলে, 'ভূমিকা'র মধ্যে আমি সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিয়েছি। *

* পরিশিষ্টে মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর চিঠির ইংরেজি অনুবাদ (মস্কো সংস্করণ) দ্রষ্টব্য

মনীষীরা যার জন্য বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তকে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করেন, সামাজিক ইতিহাসের উপকরণের জন্য, তার সমস্ত অংশ সযত্নে সংকলন করে অনুবাদ করেছি। সেইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের—(The History of the late Rebellion in the States of the Great Mogol এবং Remarkable Occurrences after the War)—নির্বাচিত অংশের সারানুবাদ করেছি। কেবল সেই অংশগুলির অনুবাদ করেছি যার মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের মালমশলা আছে। বাকি অংশ নিছক ঘটনাপ্রধান বলে বাদ দিয়েছি। ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল বার্নিয়েরের পত্রগুলি। সেই কারণে পত্রগুলির সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছি। কেবল কাশ্মীরে যুদ্ধযাত্রার বিবরণ-সম্বলিত পত্রগুলির অনুবাদ করিনি। এই পত্রগুলির মধ্যে যেটুকু সামাজিক ইতিহাসের উপাদান আছে, কার্ল মার্ক্স তাঁর পত্রে তা উল্লেখ করেছেন। 'ভূমিকায়' সেই পত্রের অনুবাদ করে দিয়েছি।

সংক্ষেপে বলা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের, বাদশাহী আমলের সামাজিক ইতিহাসের যা-কিছু সংকলনযোগ্য মূল্যবান উপাদান বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে আছে, তার সবটাই আমি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছি। আমাদের দেশের ইতিহাস-সাহিত্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অভাব খুব বেশি। ঐতিহাসিকরা রাজসিংহাসনের কাড়াকাড়ির দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, সিংহাসন ও রাজদরবারের বাইরে বৃহত্তম লোকসমাজের দিকে ততটা দৃষ্টি দেননি। যতদিন তা না দেবেন ততদিন ইতিহাস সম্বন্ধে দেশের লোকের বিভীষিকা দূর হবে না এবং ইতিহাসও প্রকৃত ইতিহাস বলে গণ্য হবে না। সেই কথা মনে করেই, মধ্যযুগের ভারতের একখানি প্রামাণ্য মূল ঐতিহাসিক বিবরণের অনুবাদ করেছি। এই ধরনের আরও অনেক মূল ভ্রমণবৃত্তান্তের ও স্মৃতিকথার অনুবাদ করার প্রয়োজন আছে। যোগ্য ব্যক্তিরা যদি সেগুলি একে-একে বাংলায় অনুবাদ করেন, তাহলে বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ছাড়া অবনতি হবে না। বরং তাতে আমাদের দৈন্য ঘুচবে।

অনুবাদপ্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলবার আছে। ইংরেজিতে যাকে literal translation বা আক্ষরিক অনুবাদ বলে, আমার সে-অনুবাদে কোনো আস্থা নেই। অনুবাদ মানে 'ভাষান্তর'। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব পদবিন্যাস, বাক্যরীতি ও বাচনভঙ্গি আছে। ইংরেজিতে যা এককথায় বলা যায়, বাংলায় হয়ত তা দশকথায় বলতে হয়। আমি সেইভাবে বার্নিয়েরের কথা ভাষান্তরিত করেছি।

সবসময় এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি যাতে বর্নিয়েরের কোনো বক্তব্য বিকৃত না হয়। যথাযথ অনুবাদ বলতে যদি অবিকৃত ভাষান্তর বোঝায়, তাহলে যথাযথ অনুবাদ করতে আমি কোথাও চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এতেও যাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না, তাঁরা মূল ফরাসী ভাষায় লিখিত (কারণ ইংরেজিও অনুবাদ) গ্রন্থ পড়তে পারেন। যে-গ্রন্থ অবলম্বন করে আমি অনুবাদ করেছি, তা ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ—Travels in the Mogul Empire (A.D. 1656—1668). By Francois Bernier: Second Edition Revised by Vincent A. Smith (Oxford, 1914).

অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৫৯ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৬১ পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়। 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদকের কাছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। অনুবাদপ্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় 'ভূমিকায়' বলেছি।

চৈত্র ১৩৬৩

বিনয় ঘোষ

ভূমিকা

‘ইতিহাস’ বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, একশ বছর আগেও সেরকম ইতিহাস লেখা হত না। ইতিহাসের লক্ষ্য কি, ইতিহাস রচনার পদ্ধতি কি, এসব সম্বন্ধে সেকালের পণ্ডিতদের কোনো স্পষ্ট ধারণাও ছিল না। সেইজন্য ‘প্রাচীনযুগ’ ও ‘মধ্যযুগের’ কোনো লিখিত ইতিহাস বিশেষ নেই, অন্তত ‘ইতিহাস’ বলতে আমরা এখন যা বুঝি তার কোনো নিদর্শন নেই। সেদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলতে ঘটনাপঞ্জী, তারিখের ফিরিস্তি, বংশপরিচয়, রাজা-বাদশাহের রোমাঞ্চকর কাহিনী ইত্যাদি বোঝাত। ঘটনা ও তারিখ কোনোটাই অবশ্য ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। ঘটনার ক্রম ইতিহাস এবং কালক্রম ও কালের পটভূমি ছাড়া ঘটনা অর্থহীন ও সঙ্গতিহীন। সুতরাং ঘটনাও ঐতিহাসিকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু তা হলেও ইতিহাস শুধু ঘটনাক্রম বা তারিখের ফিরিস্তি নয়—যুগের কথা, যুগের চলার গতি, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা, যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার উত্থান পতনের কথা—এই হল ইতিহাস। ইতিহাস সম্বন্ধে সেকালের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে এবং এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস-রচনা সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা চলে। দৃষ্টিকোণ ও রচনাপদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আজও মতভেদ থাকলেও ইতিহাস যে শুধু ঘটনাক্রম, রাজা বাদশাহের বংশচরিত বা জীবনচরিত নয়, একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। দেশের কথা, দেশের লোকের কথা, সর্বশ্রেণীর ও সর্বস্তরের লোকের জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার কথা নিয়েই ইতিহাস। কিন্তু এ হল ইতিহাসদর্শনের কথা, এখানে এ বিষয় আলোচ্য নয়।

ইতিহাস রচনার উপাদান কি এবং কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যায়? দেশের মধ্যে আজও যেসব ‘অসভ্য’ আদিমজাতির বাস আছে, তাদের জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মকর্ম, ভাষা, ব্যবহার্য হাতিয়ার, জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান করে নৃতত্ত্ববিদরা (Anthropologists) আদিমযুগের ইতিহাস রচনা করেছেন। শিলালেখ, প্রাচীন মুদ্রা, আসবাবপত্তর, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা (Archaeologists) প্রাচীনযুগের ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করেছেন। প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণকথা, লোককাহিনী ইত্যাদির সাহায্যে ঐতিহাসিকরা তার উপর চুন-বালি-রঙের

প্রলেপ দিয়েছেন। এই একই উপাদান নিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসও রচিত হয়েছে। এছাড়া মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'রাজবংশ পরিচয়' 'জীবনচরিত' ও 'স্মৃতিকথা'। পর্যটকদের 'ভ্রমণকাহিনী' বোধ হয় তার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। বর্তমান যুগে ইতিহাস রচনার পথও প্রশস্ত, উপাদানও পর্যাপ্ত। বর্তমান যুগ বলতে ছাপাখানার যুগকেই বোঝায়। ছাপাখানার দৌলতে যাবতীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ মুদ্রিত থাকে—নানাবিধ রিপোর্টে, গ্রন্থে ও পত্রিকাদিতে। সুতরাং ঐতিহাসিক মালমশলার কোনো অভাব নেই, এবং সেইসব মালমশলা সংগ্রহ করারও কোনো অসুবিধা নেই। ছাপাখানার আগের যুগে তা ছিল না, অর্থাৎ আমাদের দেশে দুশো বছর আগে, ইয়োরোপে পাঁচশো বছর আগে। ইতিহাসের উপাদান তখন নানাজায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হত, তার মধ্যে পর্যটকদের 'ভ্রমণকাহিনী' অন্যতম। মনে রাখতে হবে, তিন-চারশো বছর আগেও সেইসব 'ভ্রমণকাহিনী' ছাপা সম্ভব ছিল না, 'পাণ্ডুলিপির' আকারেই থাকত, এমন কি ইয়োরোপেও। যেমন বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ১৬৫৮ সাল থেকে ১৬৬৭ সাল পর্যন্ত বার্নিয়ের ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ফ্রান্সে, অর্থাৎ স্বদেশে ফিরে গিয়ে, ১৬৭০ সালে তিনি ফরাসী সম্রাট ত্রয়োদশ লুইর কাছ থেকে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত ছেপে প্রকাশ করার অনুমতিপত্র পান।

ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান

ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোধহয়, পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত পর্যটক আসেননি, এবং দেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে এত ভ্রমণবৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করে যাননি। ভারতের রাজা-বাদশাহ, ভারতের বৌদ্ধধর্ম, ভারতের ঐশ্বর্য, ভারতের শিল্পকলা, ভারতের শাস্ত্রচর্চা, ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ যুগে-যুগে বিদেশীদের আকর্ষণ করে টেনে এনেছে—রাজ-সিংহাসনের লোভে, অর্থের লোভে, জ্ঞানবিদ্যার লোভে। তাঁদের মধ্যে পর্যটকও এসেছেন অনেক, পুব থেকে, পশ্চিম থেকে। গ্রীক চীনা মুসলিম ইয়োরোপীয়—সকল জাতের, সকল দেশের পর্যটক এসেছেন ভারতবর্ষে। কেউ মনে করেছেন এ-দেশকে জ্ঞানবিদ্যা ও ধর্মসাধনার মহাতীর্থ, কেউ বা মনে করেছেন ধনরত্নসম্ভার লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য। প্রাচীনযুগে চীনা পর্যটকরা এসেছিলেন প্রধানত ভারতের মহান ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু মধ্যযুগে

ইয়োরোপীয় পর্যটকরা এসেছিলেন ধনরত্নের লোভে। তার আগে গ্রীক ও রোমান পর্যটকরা এসেছিলেন ধর্ম ও অর্থ, সংস্কৃতি ও সম্পদ, দুইয়ের লোভে নাবিকের বেশে, বণিকের বেশে, রাজদরবারের দূতের বেশে। তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। সকলেই জানেন, গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের (Megasthenes) ভারত-বিবরণ না থাকলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করা কঠিন হত। তাও তো মেগাস্থিনীসের আসল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী লেখকদের বিস্তৃত উদ্ধৃতি থেকেই তার পরিচয় পেয়েছি আমরা। বিশেষ করে রোমান ভৌগোলিক স্ট্র্যাবোর (Strabo) কাছে এর জন্য আমরা ঋণী। মেগাস্থিনীসের আগে আলেকজাণ্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসও (Nearchus) ভারতের কথা কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাও আমরা উদ্ধৃতি-আকারে পেয়েছি। এখন J. W. McCrindle-এর Ancient India as described by Megasthenes and Arrian ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থ থেকে মেগাস্থিনীসের ভারত-বিবরণ পরিষ্কার জানতে পারা যায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জনৈক আলেকজেণ্ড্রিয়ান নাবিক (হিপ্পলাস) ভারতীয় উপকূল ঘুরে (উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল) 'Periplus Maris Erythroei' নামে যে guide-book লিখে গেছেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তারও মূল্য অনেক (এ বিষয়ে Schoff-এর 'The Periplus of the Erythrean Sea' পঠিতব্য)। এইসব গ্রীক ও রোমান নাবিক দূত সেনাপতি ও পর্যটকদের পর চীনা পরিব্রাজকদের ভারতবৃত্তান্তের কথা উল্লেখ করতে হয়। খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রায় নবম শতাব্দী পর্যন্ত একাধিক চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন—

ফা হিয়েন (Fa Hian) : ৩৯৯ খ্রী-৪১৪ খ্রী

ইউয়ান চোয়াং (Yuan Chawang) : ৬২৯ খ্রী-৬৪৫ খ্রী

আই সিং (I-tsing) : ৬৭৩ খ্রী

সুঙ উন্ (Sung Yung)
হুয়ি সেঙ (Hwi Seng)
ও কুঙ (O Kung) প্রভৃতি } ৬০০ খ্রী-৮০০ খ্রী

এই চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ করে ফা হিয়েন ও ইউয়ান চোয়াঙের (হুয়েন সাঙ) ভ্রমণ-

বৃত্তান্ত না থাকলে সেযুগের ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস উদ্ধার করা যে কত কষ্টসাধ্য হত তা কল্পনা করা যায় না এই ভ্রমণবৃত্তান্ত যাঁরা বিস্তৃতভাবে জানতে চা'ন তাঁরা ফা হিয়েনের 'Travels' ও Watter এর 'Yuan Chwan' গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাসের এই প্রাথমিক উপাদানগ্রন্থের অনুবাদ কোনো ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে কি না আমি জানি না, তবে বাংলায় ইউয়ান চোয়াঙের একখানি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'বিশ্বভারতী' থেকে। এগুলি যদি কেউ তৈরি করে দেন তাহলে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হতে পারে।

প্রাচীন হিন্দুযুগ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান সম্বন্ধে মোটামুটি এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। মুসলমানযুগে য়োরোপীয় ও মুসলিম পর্যটক অনেকে আসেন ভারতবর্ষে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন ইবন বতুতা (Ibn Batuta—'the traveller of Islam')। ইবন বতুতা (১৩৫২ ১৩০৮ খ্রী) ভারতে আসেন মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে। তুঘলক-যুগের ভারত সম্বন্ধে বতুতার বিবরণের মধ্যে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সম্বন্ধেও অনেক কথা বতুতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পণ্ডিত হরিনাথ দে মূল গ্রন্থ থেকে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। Description of Bengal : Ibn Batuta : Translated by Harinath De। য়োরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে মার্কো পোলোর (Marco Polo) কথা সকলেই জানেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে (১২৯৩ খ্রী মার্কো পোলো চীন থেকে ফেরবার পথে দক্ষিণভারতের করোম্যাণ্ডেল ও মালাবার উপকূল ঘুরে গিয়েছিলেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে য়োরোপের বাণিজ্য-যুগের সূচনা হয় বলা চলে। বণিকসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে ধনরত্নের লোভে সেই থেকে এশিয়ায় যেসব য়োরোপীয় বণিক দুঃসাহসিক অভিযান করেন, তাঁদের মধ্যে ইতালীয় মার্কো পোলো অন্যতম। এসিয়া সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় বণিকদের এই ধারণা ও মনোবৃত্তি, মার্কো পোলোকে কেন্দ্র করে, বিখ্যাত মার্কিন নাট্যকার Eugene O'Neill তাঁর 'Marco Millions' নাটকে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। কৌতূহলী পাঠকদের নাটকখানি পড়তে অনুরোধ করছি। মার্কো পোলো ও ইবন বতুতার পর রুশ পর্যটক নিকিটিনের (Athanasius Nikitin) নাম করতে হয়। বহমনী সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে

(১৪৬ -১৪৮২ খ্রী) নিকিটিন দক্ষিণাপথে আসেন (১৪৭০ থেকে ১৪৭৪ খ্রী মধ্যে)। নিকিটিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত, 'India in the Fifteenth Century' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে (H R Major সম্পাদিত, Hakluyt Society থেকে ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত)। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের জন্য আবুল ফজলের বিখ্যাত 'আকবরনামা' থাকতে কোনো বিদেশী ভ্রমণকাহিনীর শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে জাহাঙ্গীর থেকে ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালের মধ্যে একাধিক ইয়োরোপীয় পর্যটক ও দূত ভারতবর্ষে আসেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন :

উইলিয়াম হকিন্স	(William Hawkins)	: ১৬০১-১৬১২
টমাস রো	(Sir Thomas Roe)	: ১৬১৫-১৬১৯
ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের	(Francois Bernier)	: ১৬৫৯-১৬৬৬
তাভার্নিয়ের	(Tavernier)	১৬৪০-১৬৬৭
ডাঃ ফ্রায়ার	(Dr. Fryer)	: ১৬৭২-১৬৮১
ওভিংটন্	Ovington	: ১৬৮৯ ১৬৯২
জেমেল্লি ক্যারেরী	(Gamelli Careri	: ১৬৯৫
নিক্কোলাও মনুচ্চি	(Niccolao Manucci	: ১৭০৪

ইংরেজ ক্যাপটেন উইলিয়াম হকিন্স নতুন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির' প্রতিনিধিরূপে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ১৬০৯ সালে। তার উদ্দেশ্য ছিল, সুরাটে ইংরেজদের একটি বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠার অনুমতি আদায় করা। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি জাহাঙ্গীরের অন্তরঙ্গ দোস্ত হয়ে ওঠেন এবং বাদশাহের সঙ্গে একত্রে মদ্যপানাদিও করতে থাকেন। জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে হকিন্স যে চিত্র এঁকে গেছেন তা এইজন্যই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতন অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। তাঁর এই বিবরণ ফস্টারের (W. Foster) 'Early Travellers in India' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে। হকিন্সের প্রতি জাহাঙ্গীর ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ১৬১২ সালে স্বদেশে ফিরবার পথে হকিন্সের মৃত্যু হয়। ১৬১৫ সালে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রো-কে রাষ্ট্রদূতরূপে পাঠান। রো সাহেব তাঁর দৌত্য-জীবনের যে দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে তা অমূল্য সম্পদ বলা চলে। চ্যাপলিন এডওয়ার্ড টেরীও (Edward Terry)

যেসব মজার কাহিনী লিখে গেছেন তার তুলনা হয় না। টেরীর কাহিনী ফস্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং রো সাহেবের দিনপঞ্জীও ফস্টারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে (Roe's 'Embassv : Edited by Sir W Foster, Hakluyt Socicty, 1899)।

ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতভ্রমণে আসেন। ১৬৫৮ সালের শেষে তিনি সুরাটে পৌঁছান এবং কিছুদিন দারাশিকোর সঙ্গীরূপে কাটান। সাজাহান তখন মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত এবং সেই সুযোগে তাঁর পুত্র সুজা, ঔরঙ্গজীব মুরাদ সিংহাসনলোভে বিদ্রোহী জ্যেষ্ঠ দারাশিকোর বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত। গৃহযুদ্ধের আগুনে মোগল সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হবার সম্ভাবনা। এইসময় বার্নিয়ের ভারতবর্ষে আসেন, এবং প্রথম দারাশিকো ও পরে ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে যান। এইসময় আরও একজন ফরাসী পর্যটকের সঙ্গে বার্নিয়েরের দেখা হয় তাঁর নাম তাভার্নিয়ের। বার্নিয়ে ও তাভার্নিয়ের একসঙ্গে বাংলাদেশে আসেন এবং রাজমহল থেকে তাঁরা দুজন দুদিকে চলে যান। বার্নিয়ের যান কাশিমবাজারের পথে এবং পরে বাংলাদেশ ঘুরে মসলিপত্তম ও গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন। গোলকুণ্ডায় থাকার সময়, ১৬৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিনি সম্রাট সাজাহানের মৃত্যুসংবাদ পান। ১৬৬৭ সালে তিনি সুরাট থেকে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। সম্ভবত এইসময় সুরাটেই তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক মঁসিয়ে শার্দার (M Chardin সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাভার্নিয়ের ও শার্দা দুজনেই জহুরী (jeweller) ছিলেন, বার্নিয়ের ছিলেন সুশিক্ষিত চিকিৎসক ও দার্শনিক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে যেসব বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসেন তাদের মধ্যে প্রখ্যাত হলেন ডাঃ ফ্রায়ার, ওভিংটন, ইতালীয় জেমেল্লি ক্যারেরী এবং বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক নিকোলাও মনুচ্চি। ডাঃ ফ্রায়ারের ('New Account of India') গ্রন্থের মধ্যে শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠাজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সাধারণভাবে ভারতের কথা কিছু জানা যায় না বিশেষ। তার কারণ ফ্রায়ার সুরাট ছাড়িয়ে বেশিদূর অগ্রসর হননি। ফ্রায়ারের মতন ওভিংটনও (১৬৮৯-১৬৯২) মোগল দরবারের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেননি এবং বোম্বাই ও সুরাটের ইংরেজ বণিকদের মুখে তিনি যা শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর 'Voyage to Suratt' গ্রন্থের মধ্যে।

জেমেল্লি কারেরী ১৬৯৫ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান এবং এইসময় এই সুযোগ পাওয়ার ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ অনেকদিক থেকে মূল্যবান হয়েছে। মনুচ্চিও দারাশিকোর অধীনে কিছুদিন গোলন্দাজের কাজ করেন, তারপর রাজা জয়সিংহের অধীনে কাজে বহাল হন। বোম্বাই ও গোয়ার কাছে কিছুদিন বাস করে তিনি শেষে মাদ্রাজ গিয়ে বসবাস করেন এবং ১৭১৭ সালে মাদ্রাজেই মারা যান। তাঁর লিখিত 'Storia do Mogar' আর্ভিন সাহেব (W Irvine) ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। অনূদিত গ্রন্থ 'A Pepys of Mogul India' (London, 1908) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এরকম প্রত্যক্ষ ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে মনুচ্চি ছাড়া বার্নিয়েরের ও তাভার্নিয়েরের কাহিনীর মূল্যই সবচেয়ে বেশি। প্রথম ও সময়ের মূল্য, দ্বিতীয় অভিজ্ঞতার মূল্য। বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের যে-সময় এসেছিলেন, সেটা ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্কটকাল বলা চলে। মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য তখন নিশ্চিত অস্তাচলের পথে। মোগলযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যা চূড়ান্ত বিকাশ হবার তা তখন হয়ে গেছে এবং অবনতির সূচনা হয়েছে। এইসময় বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের এদেশে আসেন। ব্যক্তি হিসেবে বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়েরের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্যের জন্য তাঁদের পর্যবেক্ষণের মধ্যেও পার্থক্য রয়ে গেছে। 'মধ্যযুগের ভারত' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্ট্যানলে লেন পুল তার 'ঔরঙ্গজীব' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-সম্বন্ধে বলেছেন:

> Bernier writes as a philosopher and man of the world; his contemporary Tavernier (1640 1667) views India with the professional eye of a jeweller; nevertheless his Travels contain many valuable pictures of Mughal life and character.
> (Aurangzib : S. Lane-Poole : Rulers of India Series.)

বার্নিয়ের তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন দার্শনিকের মতন, সত্যদ্রষ্টার মতন। কিন্তু তাঁর সমকালীন তাভার্নিয়ের ভারতবর্ষকে দেখেছেন জহুরী ব্যবসায়ীর দৃষ্টি দিয়ে। তাহলেও তাভার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনি মূল্যবান, কারণ মোগলযুগের জীবনযাত্রার ছবি তিনি কয়েকদিক দিয়ে ভালই এঁকেছেন। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের এদিক দিয়ে তুলনা হয় না। যেমন তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, তেমনি তাঁর যথাযথ বর্ণনার ক্ষমতা। সংস্কার বা স্বার্থের দিক থেকে তিনি কোনো ঘটনার বা কোনো বিষয়ের বিচার করেননি। যা দেখেছেন, উত্তরভারত থেকে

দক্ষিণভারত, দক্ষিণভারত থেকে পূর্বভারত পর্যন্ত, তা নিরপেক্ষভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে। কেবল জহরত বা মণিমাণিক্যের সন্ধানে তিনি আসেননি। মোগল দরবারের ঐশ্বর্য ও সম্পদ দেখে তিনি মোহমুগ্ধ হননি। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাজদরবার থেকে বাইরের বাজারঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্রাট, আমীর-ওমরাহ থেকে ভারতের সকলশ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং তাদের কথা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক [illegible] বর্ণনা করে গেছেন। তাঁর জহরত মণিমুক্তা ছাড়াও তেমনি তাঁর দৃষ্টি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছে। এর [illegible] 'সংবাদ' সমস্ত তিনি লক্ষ্য করে বর্ণনা করে গেছেন। মোগলদের রাজস্বব্যবস্থা, দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, সাধারণের অবস্থা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ক্রীড়াকৌতুক, বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ, [illegible], ধর্মাধর্ম, [illegible] ও শিল্পকলার অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কোনোটাই তাঁর পরের মুখে শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখা, নিজের বুদ্ধিবিবেচনা দিয়ে বোঝা। এইজন্যই বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তকে নিঃসন্দেহে মোগলযুগের, বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর অর্থাৎ ঠিক ব্রিটিশ পূর্বযুগের ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ মূল্যবান প্রামাণিক উপাদানগ্রন্থ বলা যায়

বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন এইজন্য অস্বীকার করা যায় না।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের

১৬২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্নিয়ের ফ্রান্সের আজু গ্রামে এক কৃষক-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চাষবাসই তাঁদের পৈতৃক পেশা ছিল এবং তাই করেই তাঁর পিতামাতা জীবনধারণ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই বার্নিয়ের দেশ-বিদেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন মনে হয়। তখন ইয়োরোপে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা বাইর্জগতের অজানা দেশের সন্ধানে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছেন। পৃথিবীর ভূগোল ও মানচিত্র তৈরি হচ্ছে নতুন করে। নতুন নতুন দেশ মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। নিজের গ্রাম ও নিজের দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ মানুষের মনে বাইরের মানুষকে জানবার, বাইরের দেশ দেখবার

প্রবল বাসনা জাগছে। এইসময় এক ফরাসী কৃষক-পরিবারে বার্নিয়েরের জন্ম হলেও তিনিও যুগপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২৬-২৭ বছর, তখন তিনি উত্তর-জর্মানি, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ১৬৪৭ থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন-চার বছর ধরে তিনি এইসব দেশে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছিলেন।

সেকালের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবলে বার্নিয়েরকে রীতিমত একজন শিক্ষিত লোক বলতে হয়। সাধারণ শিক্ষা নয় শুধু, নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে বার্নিয়েরের আগ্রহ ছিল প্রবল। ১৬৫২ সালের মে মাসে তিনি শারীরবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং মন্টিপেলিয়েরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। বিখ্যাত দার্শনিক গ্যাসেণ্ডি ছিলেন বার্নিয়েরের শিক্ষাগুরু। সেই বছর জুলাই মাসে তিনি ‘চিকিৎসাবিদ্যায় ‘লাইসেনসিয়েট’ পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন, আগস্ট মাসে চিকিৎসাবিদ্যায় ‘ডক্টর’ উপাধি পান এবং প্যারিস যাত্রা করেন। লেখাপড়ার মধ্যে ভ্রমণের নেশা তাঁর বলবতী ছিল। ১৬৫৪ সালে তিনি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে আসেন।

বার্নিয়ের একজন সাধারণ পর্যটক বা শৌখিন ট্যুরিস্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন দার্শনিক-পর্যটক। যা তিনি চোখে দেখতেন তা নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখতেন। যা তিনি শুনতেন, তা নিজের যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতেন। তাঁর সমকালীন অন্যান্য পর্যটকদের লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার একটা বিরাট পার্থক্য আছে। বার্নিয়েরের বৃত্তান্তের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী পর্যটকদের বৃত্তান্ত তুলনা করে পড়লে যে কোনো বুদ্ধিমান ও বিচারশীল পাঠক তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। বার্নিয়েরের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, বার্নিয়েরের বর্ণনাভঙ্গির ও বিশ্লেষণ-রীতির বৈশিষ্ট্য সহজেই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাখ্যায় ও বর্ণনায়, মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে, বার্নিয়ের যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর বললেও ভুল হয় না। শোনা যায়, এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তির জন্য বার্নিয়ের তাঁর শিক্ষাগুরু প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্যাসেণ্ডির কাছে ঋণী।

১৬৫৬ থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত বার্নিয়ের মিশর, জেদ্দা ও মক্কা ভ্রমণ করেন। কায়রোতে তিনি প্রায় একবছরের বেশি ছিলেন। মক্কা থেকে তাঁর হাবসীদের

দেশে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যান নি। একখানি ভারতীয় পোতে তিনি সুরাট (হিন্দুস্থান) যাত্রা করেন এবং বাইশ দিন সমুদ্রপথে কাটিয়ে ১৬৫৮ সালের শেষে বা ১৬৫৯ সালের গোড়ার দিকে সুরাটে উপস্থিত হন।

আজমীরের কাছে দারার সঙ্গে তখন ঔরঙ্গজীবের সেনাদলের যুদ্ধ হচ্ছে। ১৬৫৯ সালের ১২-১৩ মার্চ বার্নিয়ের যখন সুরাট থেকে যাত্রা করে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন পথে আমেদাবাদের কাছে দারার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে দারা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান। দারা তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সিন্ধু প্রদেশের দিকে পলায়ন করছেন। বার্নিয়ের বোধহয় পলাতক দারা ও তার সাঙ্গপাঙ্গের সঙ্গে গরুর গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। পথে তার দ্বিচক্র গো-যানটি বিকল ও অচল হয়ে যায়। কিন্তু তখন তাঁর যানবাহনের ব্যবস্থা করার সময় ছিল না। অতএব বিদেশী বন্ধুটিকে পথে মধ্যে ফেলে রেখেই তিনি পালাতে বাধ্য হন। পথেঘাটে তখন চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশি ছিল। বার্নিয়ের চোর-ডাকাতদের হাতে পড়ে নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত হন। কোনোরকমে প্রাণটি বাঁচিয়ে তিনি আবার আমেদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে দিল্লীগামী একজন সম্ভ্রান্ত মোগলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের অধীনে গৃহচিকিৎসকের চাকরি নিতে তিনি বাধ্য হন, কারণ তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। কিছুদিন পরে তিনি দানেশমন্দ খাঁর অধীনে চাকরি নেন। এই দানেশমন্দ খাঁ তখন খুব প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ওমরাহ ছিলেন। বার্নিয়েরকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। তার সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা লাভ করেই বার্নিয়ের রাজদরবারের অনেক গোপন কথা, আদব-কায়দা ইত্যাদি জানতে পারেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাশ্মীর-অভিযানেও বার্নিয়ের সঙ্গী ছিলেন। কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে তিনি বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। এইসময় বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়ের তাঁর সঙ্গী হন। রাজমহল পর্যন্ত একসঙ্গে এসে বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়ের বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বার্নিয়ের রাজমহল থেকে কাশিমবাজারের দিকে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ঘুরে বার্নিয়ের মসলিপত্তম্‌ ও গোলকুণ্ডা যান এবং সেখানে সাজাহানের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পান (১৬৬৬ সালের ২২ জানুয়ারি)। ১৬৬৬ সালে তিনি সুরাট থেকে যখন স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রসিদ্ধ পর্যটক শাঁর্দার সঙ্গে সেখানে তাঁর দেখা হয়।

১৬৬৯ সালে বার্নিয়ের মার্শাই-এ পৌঁছান। ১৬৭০ সালের ২৫ এপ্রিল তিনি ফরাসী সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত ছেপে প্রকাশ করবার 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্র পান।

১৬৭০-৭২ সালের মধ্যে বার্নিয়েরের জীবদ্দশায়, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের ফরাসী, ইংরেজী ও ডাচ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সারা ইওরোপে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৬৮৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ৬৮ বছর বয়সে প্যারিসে বার্নিয়েরের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষে বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে, কলকাতায়। সার্কুলার রোডে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। জন স্টুয়ার্ট মূল ফরাসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পরে ১৮৩০ সালে বোম্বাই-এর 'সমাচার প্রেস' থেকে বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের আর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলকাতার বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ১৯০৪ সালে একটি ইংরেজি সংস্করণ, ভূমিকা ও টীকাসহ প্রকাশিত হয়।

বার্নিয়ের প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেল্স

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্স আজ থেকে শতাধিক বছর আগে (১৮৫৩ সালে) বার্নিয়েরের এই ভ্রমণবৃত্তান্তের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের চিঠিপত্র থেকে সেই মন্তব্যের অংশটুকু আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। ১৮৫৩ সালের ২ জুন লণ্ডন থেকে কার্ল মার্ক্স এঙ্গেল্সকে লিখেছিলেন:

"প্রাচ্য শহরগুলির উত্থানের ইতিবৃত্ত বৃদ্ধ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের যেরকম চমৎকার জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছেন, তেমনভাবে আর কেউ কোথাও করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। নয় বছর তিনি সম্রাট ঔরঙ্গজীবের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যেমন মনোরম, তেমনি মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ। তখনকার সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বার্নিয়ের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বিশাল সেনাবাহিনী কিভাবে যুদ্ধযাত্রা করত, কেমন করে তাদের অভিযানকালীন আহারের সংস্থান করা হত, ইত্যাদি বিষয়েরও তিনি অবতারণা করেছেন। এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী দলই হল সর্বপ্রধান। পদাতিক সেনাদল আসলে তত বড় নয়, যতটা বাইরে থেকে গুজব শোনা যায়। প্রচুর বাজারের লোক বা চাকরবাকর

যারা সেনাদলের সঙ্গে থাকে, তাদের পদাতিক বলে গণ্য করা যায় না এবং তারা যোদ্ধাও নয়। লোকলস্কর দাসদাসী সব একত্রে গণনা করলে, সম্রাটের সঙ্গে প্রায় দুতিন লক্ষ সৈন্য থাকে বললে ভুল হয় না। থাকা স্বাভাবিক, যেহেতু রাজধানী ছেড়ে সম্রাট দীর্ঘকালের জন্য দূরে চলে যান, যুদ্ধযাত্রার সময়। মালপত্র কি লাগে আর না লাগে সে সম্বন্ধেও যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা এই লোকসংখ্যা দেখে আশ্চর্য হবেন না। কতরকমের তাঁবু, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র, আহার্য, কেবল পুরুষদের জন্য নয়, স্ত্রীলোকদের জন্যও যে সঙ্গে যায় এবং তার সঙ্গে কত হাতি ঘোড়া উট বলদ, মাহুত সহিস ভৃত্য, খাদ্যবিক্রেতা, বণিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদি যে থাকে, তার ঠিক নেই। হিন্দুস্থানের রাষ্ট্র ও শাসকের যে বৈশিষ্ট্য মর্যাদা আছে, তার জন্যই এরকম হয়। একথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দুস্থানের সম্রাটই হলেন দেশের ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। তার ফলে দিল্লী বা আগ্রার মতন শহর গড়ে উঠেছে প্রধানত সম্রাট ও তাঁর সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে। তাই সম্রাট যখন যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনী যায়, তখন শহরের প্রায় সকলশ্রেণীর লোককে তাঁর অনুগামী হতে হয়। এই জন্য হিন্দুস্থানের রাজধানীর শহরের সঙ্গে [illegible] প্যারিসের মতন শহরের ঠিক তুলনা করা যায় না। দিল্লী বা আগ্রার মতন শহরকে ঠিক সামরিক শিবির ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বৈশিষ্ট্য এই যে, বেশ উন্মুক্ত জায়গায় শহরগুলি গড়ে ওঠে।

"প্রায় চারলক্ষ সৈন্য নিয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন। এই বিশাল সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে বার্নিয়ের লিখেছেন: 'এত বড় সেনাবাহিনী এত লোকজন ও জীবজন্তুর অভিযানকালীন খাদ্যসংস্থানের কথা চিন্তা করলে অনেকে হয়ত কল্পনা করতে পারবেন না, কি করে এইভাবে যুদ্ধযাত্রা করা সম্ভব? তাঁরা হয়ত জানেন না, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কত সংযমী ও সরল। অশ্বারোহী সেনাদের মধ্যে দশজন বা বিশজনের মধ্যে একজন অভিযানের সময় মাংস খায় কিনা সন্দেহ। চালডাল মিশ্রিত খিচুড়ি পেলে, তাতে গরম ঘি ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি করে তারা খায়, তার বেশি কিছু তাদের দরকার হয় না। উটের সহিষ্ণুতার কথা অনেকেই জানেন, ক্ষুধাতৃষ্ণাও যে বিশেষ এদের আছে তা মনে হয় না। অভিযানের সময় তাদের আহারের তেমন প্রয়োজনই হয় না। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সেনাবাহিনী যখন হল্ট করে তখন আশপাশের উন্মুক্ত মাঠেপ্রান্তরে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেওয়া হয় চরে খাবার জন্য।

শহরে বা রাজধানীতে (যেমন দিল্লীতে) ছোটবড় বণিকরা যাঁরা বাজারে পণ্য-দ্রব্যর কেনাবেচা করেন তাঁরাও সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে বাইরে সেই কাজ করতে বাধ্য হন।… খাদ্যসংগ্রহ সম্বন্ধেও তাই করা হয়ে থাকে। দরিদ্র লোক যারা, তারা সেনাশিবিরের আশপাশের গ্রামে মধ্যে চলে যায়, যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করে আহারের সংস্থান করে। অনেকে কোদালকুড়ুল দিয়ে কেটে চষে মাঠ থেকে যা কিছু ফলমূল পায়, সৈন্যদের জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।"

"বার্নিয়ের ঠিকই বলেছেন সমস্ত প্রাচ্য দেশের বৈশিষ্ট্য হল—ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব। এই প্রসঙ্গে তুর্কি, পারস্য ও হিন্দুস্থানের নাম করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যই হল আমার মতে প্রাচ্যের অমরাবতীর সোপান স্বরূপ।"

কার্ল মার্ক্সের এই পত্রের উত্তরে এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার থেকে ৬ জুন তারিখে (১৮৫৩) লেখেন

"ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব সত্যিই সমস্ত প্রাচ্যদেশের অন্যতম সামাজিক বিশেষত্ব। এইসব দেশের ইতিহাসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে এই কথাটি বিশেষভাবে জানা দরকার। কিন্তু কি করে এরকম ঐতিহাসিক অবস্থার উদ্ভব সম্ভব হল, সামন্তযুগেও ভূসম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের কোনো জটিল বিকাশ সম্ভব হল না কেন? তার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, এসব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষত্ব। এসব দেশের মাটির এমনই গুণ, আবহাওয়ার এমন গুণ যে এরকম না হওয়াই আশ্চর্য। যেমন মনে করুন, বিশাল মরুভূমির বিস্তার দেখা যায়, একেবারে সাহারা থেকে আরম্ভ করে, আরব পারস্য ভারতবর্ষ ও তাতারির ভিতর দিয়ে, এশিয়ার উচ্চতম উপত্যকা পর্যন্ত। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে কৃত্রিম সেচব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য। এই ব্যবস্থা কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে চালু করা সম্ভব নয়, ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয় এ-সমস্যা। সংঘবদ্ধভাবে 'কমিউনের' তরফ থেকে, অথবা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের তরফ থেকেই একমাত্র এই ধরনের কৃত্রিম সেচব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভবপর। এইজন্যই দেখা যায়, প্রাচ্যদেশের প্রত্যেক গবর্নমেণ্টের প্রায় তিনটি করে সরকারী বিভাগ থাকে: (১) ফিনান্স (ঘরোয়া শোষণ), (২) যুদ্ধ (ঘরোয়া ও বৈদেশিক শোষণ) এবং (৩) সাধারণ পরিকল্পনা-বিভাগ (প্রতি উৎপাদনের জন্য)। ব্রিটিশ শাসকরা, ভারতবর্ষে একনম্বর ও দুনম্বর বিভাগ নিজেদের স্বার্থে ভালভাবেই পরিচালনা

করেছেন, কিন্তু তিন নম্বরটি তাঁরা একেবারে ত্যাগ করেছেন। তার ফলে ভারত-বর্ষের কৃষিব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি হয়েছে। অবাধ প্রতিযোগিতা ভারতীয় পরিবেশে ব্যর্থ হয়েছে। কৃত্রিম সেচব্যবস্থার অবনতির ফলে জমির ফসলশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাই দেখা যায়, এককালে যেসব জমিতে আবাদ করলে সোনা ফলত, পরে সেসব জমি পতিত হয়ে রয়েছে। সর্বত্রই তাই দেখা যায়—পালমিরায়, পেট্রায়, ইয়েমেনে, মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে, পারস্যে ও ভারতবর্ষে। এর থেকেই বোঝা যায়, কেন একটি মাত্র সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ফলে এক একটি সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র কয়েক শতাব্দীর মতন জনশূন্য হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

"প্রবীণ বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত সত্যই অপূর্ব, চমৎকার। এরকম বুদ্ধিমান বিচক্ষণ একজন ফারসী পর্যটকের কাহিনী যতবার পড়া যায়, তত ভাল লাগে পড়তে। এমন অনেক কথাই তিনি লিখেছেন ও বলেছেন, যার গভীর তাৎপর্য বুঝলে হয়ত বলতেন না। অনেক আপাতদুর্বোধ্য বিষয় তিনি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।"*

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতন স্পষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানীর এরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা-লাভ খুব কম লেখকের বা ঐতিহাসিকের ভাগ্যে জুটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বার্নিয়েরের মতন আরও অনেক বিদেশী পর্যটক নানাকার্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। উইলিয়ম হকিন্স, টমাস রো, তাভার্নিয়ে, ডাঃ ফ্রায়ার প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে প্রধান। এদেশের অনেক কথা তাঁরা তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের যতটুকু ঐতিহাসিক মূল্য থাকা উচিত, তা তাঁদের বিবরণেও আছে। প্রত্যেকেই দেখেছেন নিজের চোখ দিয়ে, বুঝেছেন নিজের বুদ্ধি ও মন দিয়ে। তাঁদের সকলের মধ্যে, সম্রাট ঔরঙ্গজীবের বিচক্ষণ ফরাসী চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের দৃষ্টির যেমন স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা আছে, বুদ্ধির যেমন তীক্ষ্ণতা আছে, মনের যেমন উদারতা ও দরদ আছে, তেমন আর কারও নেই। অনেকেই দেখেছেন 'টুরিস্টের' দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে, বার্নিয়ের দেখেছেন সমাজ-দার্শনিকের দরদী দৃষ্টি দিয়ে। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাই বাদশাহী আমলের 'সামাজিক ইতিহাস' হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান এবং যে-কোনো উপন্যাসের চেয়ে সুখপাঠ্য।

* Selected Correspondence. Karl Marx and F. Engels: (Lawrence & Wishart, London: 1943): Letters Nos. 22 & 23.

ভিন্সেণ্ট স্মিথ সম্পাদিত বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের ইংরেজি সংস্করণে যে সব টীকা টিপ্পনি আছে, সেগুলি ছাড়াও বিভিন্ন প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে আরও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাদটীকায় আমি সংগ্রহ করে দিয়েছি। বার্নিয়েরের বক্তব্য ভাল করে বুঝতে এগুলি সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সামাজিক ইতিহাসের অনুরাগী যাঁরা, তাঁরা এই 'বাদশাহী আমল' থেকে মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য ও চিন্তার খোরাক পাবেন।

রাজপুত্রকন্যাদের কথা

পৃথিবী ভ্রমণের দুর্নিবার বাসনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি দেশ ছেড়ে। ফিলিস্তিন ও মিশর ঘুরে ইচ্ছা হল লোহিতসাগরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কি আছে দেখতে হবে। তাই প্রায় একবছর কায়রোয় থাকার পর আবার বেরিয়ে পড়লাম এবং বত্রিশ ঘণ্টা পথচলার পর সুয়েজে পৌঁছলাম। সুয়েজ থেকে নৌকা করে সাগরতীরের কোল ঘেঁষে-ঘেঁষে এলাম জিদ্দা বন্দরে। মক্কা থেকে বেশি দূর নয়, মাত্র আধবেলার পথ। 'বে' আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন এবং আমিও ভেবেছিলাম যে নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহম্মদের এই পুণ্যতীর্থে পা বাড়াতে আমার ভয় হল। শুনলাম, খ্রীস্টানদের সেখানে যাবার অধিকার নেই। অবশ্য এ-অধিকার শুধু স্বাধীন খ্রীস্টানদের নেই, ক্রীতদাসদের আছে। সুতরাং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আটক থেকে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। দেশভ্রমণের নেশা পেয়ে বসেছে আমাকে, মুসাফির আমি, আমার বিশ্রাম নেই। ছোট একখানি বজরায় উঠে যাত্রা করলাম, এবারে বাসনা হল হাবসীদের রাজ্য দেখার। কিন্তু শুনলাম, সেখানেও কোনো ক্যাথলিক খ্রীস্টানের যাওয়া নিরাপদ নয়। কয়েকজন পর্তুগীজ পর্যটককে তারা নাকি একেবারে কেটে ফেলেছে। গ্রীক বা আর্মেনিয়ানের ছদ্মবেশে অবশ্য যাওয়া যেত, কিন্তু তাও ভরসা হল না। ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম হিন্দুস্থানেই যাব। একখানি ভারতীয় বজরায় উঠে পড়লাম এবং বাইশদিন পর সুরাটে পৌঁছলাম। মোগল বাদশাহ তখন হিন্দুস্থানের সম্রাট।[১]

হিন্দুস্থানে এসে দেখলাম, ভারতসম্রাট সাজাহান তখন রাজত্ব করছেন। সাজাহান হলেন জাহাঙ্গীরের পুত্র এবং আকবর বাদশাহের পৌত্র। তিনি হুমায়ুনের প্রপৌত্র এবং তৈমুরের বংশধর, সেই বিখ্যাত আমীর তৈমুর, যাঁকে আমরা 'তৈমুর লং' বা খোঁড়া তৈমুর বলে জানি। তৈমুর ও চেঙ্গিস খাঁর সংমিশ্রিত বংশধরদেরই 'মোগল' বলা হয়। এই মোগলরাই এখন হিন্দুদের হিন্দুস্থানে রাজত্ব করেন। কিন্তু মোগলবংশীয়রাই যে সমস্ত রাজকীয় সম্মান ও রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার একচেটে অধিকারী, তা নয়। রাষ্ট্রিক বা সামরিক কোনো বিভাগেই মোগলদের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। অন্যান্য জাতির লোকেরাও

১। বার্নিয়ের ১৬৫৮ সালের শেষে কিংবা ১৬৫৯ সালের গোড়ার দিকে সুরাটে পৌঁছন। ভারতের সম্রাট তখন সাজাহান।

অনেকে এইসব পদে বহাল আছেন, যেমন পার্সী আরবী ও তুর্কীরা। 'মোগল' বলতে কেবল তৈমুরবংশীয়দেরই বোঝায় না। যে কোনো ইসলামধর্মী বিদেশী শ্বেতাঙ্গকে 'মোগল' বলা হয়ে থাকে। কেবল ইয়োরোপীয় খ্রীস্টানদের বলা হয় 'ফিরিঙ্গী' (Franguis), এবং হিন্দুদের বলা হয় 'জেন্টিল' (Gentil)।২ হিন্দুদের গায়ের রং একটু কালো।

হিন্দুস্থানে পৌঁছে শুনলাম, সম্রাট সাজাহান রীতিমত বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর এবং তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যার পিতা।৩ তিনি তাঁর পুত্রদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন এবং নিজে প্রায় বৎসরাধিক কাল কঠিন পীড়ায় ভুগছেন। তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বলে সকলে মনে করেন। পিতার আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে পুত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। দুঃখে নয়, সিংহাসনলোভে। দিল্লীর রাজসিংহাসনে কে বসবেন, বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন কে, তাই নিয়ে লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছে গৃহযুদ্ধের মধ্যে। শুনলাম, প্রায় পাঁচ বছর ধরে নাকি গৃহযুদ্ধ চলছে, সিংহাসনলোভে ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধের কিছু-কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের আমার সুযোগ হয়েছিল। এখানে তা বর্ণনা করবার ইচ্ছা আছে।৪ প্রায় আটবছর আমি মোগল দর-

২। 'ফিরিঙ্গী' কথা ফার্সী 'ফরঙ্গী' থেকে এসেছে। মুসলমান আমলে যে কোনো ইয়োরোপবাসী শ্বেতাঙ্গকে 'ফিরিঙ্গী' বলা হত। 'জেন্টিল' কথা পর্তুগীজ 'Gentio' (জেন্টিয়ো) থেকে এসেছে এবং তার থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় স্ল্যাঙ, 'Gentoo' (জেন্টু) কথার উৎপত্তি। ইংরেজযুগের প্রথমদিকে সাহেবেরা সাধারণত হিন্দুদেরই 'জেন্টু' বলতেন এবং মুসলমানদের বলতেন 'মুর' (মুর—'Moros' থেকে 'Moors')। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত ইংরেজদের লেখা ভারতীয় ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এই 'Gentoo' ও 'Moor' শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়—অর্থ হল 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'।

৩। সাজাহান ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বার্নিয়ের যখন ভারতে এসে পৌঁছান তখন তাঁর বয়স ৬৫ কি ৬৬ বছর হবে। সাজাহানের কন্যা চারটি, দুটি নয়, বার্নিয়ের শুধু জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪। কিন্তু তা সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ করার দরকার বা ইচ্ছা নেই। কারণ গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ অনুবাদ করলে আসল 'ইতিহাস' জানার কৌতূহল মিটবে বলে আমার মনে হয় না। এই সময়কার বহু ঘটনাপ্রধান ইতিহাসের মধ্যে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী তাঁরা তা পড়তে পারেন। তার জন্য বার্নিয়েরের বিবরণ পড়ার, অনুবাদাকারে, কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ মোগল-যুগের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোনো পরিচয় তার মধ্যে তেমন পাওয়া যাবে না।

বাবের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম। চাকরি নিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমার আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় চোরডাকাতের উপদ্রবে আমার যা সম্বল ছিল সব প্রায় তখন শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া সুরাট থেকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্যতম নগরী আগ্রা ও দিল্লীতে পৌছতে আমার প্রায় সাত সপ্তাহকাল সময় লেগেছে এবং তাতে আমার বাকি যেটুকু সম্বল ছিল, চুরিচামারি লুটপাটের পর, তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। দিল্লীশ্বরের কাছে দিল্লীতে যখন পৌছলাম তখন আমি প্রায় পথের ফকির। বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হল, রাজপরিবারের চিকিৎসকের চাকরি, বাঁধা মাইনেতে। পরে আর একজন বিখ্যাত ওমরাহ ও বিশেষ ব্যক্তির অধীনেও চাকরি করেছি।[৫]

মোগল বাদশাহ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম দারা বা 'ডেরিয়াস'; দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুলতান সুজা বা 'বীর রাজকুমার'; তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব বা 'সিংহাসনের শোভা'; কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বা 'সার্থক কামনা'। কন্যা বেগম সাহেবা হলেন জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী আর কনিষ্ঠা রৌশনআরা বেগম বা আলোককুমারী। এইধরনের নামকরণ করা হল এদেশের রাজবংশের ধারা। যেমন সাজাহানের স্ত্রীর নাম 'তাজমহল' (মমতাজ), অর্থাৎ বিবিমহলের তাজস্বরূপ শ্রেষ্ঠা মহিষী। মমতাজের রূপ ছিল অতুলনীয় এবং তাজমহল নামে তাঁর যে স্মৃতিসৌধ আছে তা সারা দুনিয়ার এক বিস্ময়কর কীর্তি। মিশরের পিরামিড আমি দেখেছি কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের তাজমহলের তুলনায় মিশরের পিরামিড পাথরের অবিন্যস্ত স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। যা বলছিলাম। রাজবংশের কুমার-কুমারী বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের এরকম নামকরণের কারণ কি? ইয়োরোপের মতন তাঁদের 'অমুক স্থানের লর্ড' উপাধিতে ভূষিত করা হয় না কেন? আমার মনে হয়, তার প্রধান কারণ হল, ইয়োরোপের লর্ডরা যেমন ভূমির স্বত্বাধিকারী হতে পারেন, হিন্দুস্থানের রাজকুমার বা ওমরাহরা তা হতে পারেন না। সম্রাটই হলেন হিন্দুস্থানের সমস্ত ভূমি বা ভূসম্পত্তির মালিক, সুতরাং আর্লমার্কুইস ডিউক লর্ড এই জাতীয় উপাধি

৫। এই বিখ্যাত ব্যক্তি একজন পার্সী ব্যবসায়ী, নাম মহম্মদ সফী বা মুল্লা সফী। ১৬৪৬ সালে তিনি সুরাট আসেন এবং সেখান থেকে সম্রাট সাজাহান তাঁকে সাক্ষাতের জন্য তলব করেন। তার উপর প্রীত হয়ে সম্রাট তাঁকে তিনহাজারী মনসবদারীতে সম্মানিত করেন, 'বকশীর' পদে নিয়োগ করেন এবং 'দানিশমন্দ খাঁ' (পণ্ডিত বীর) উপাধি দেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাঁর আরও পদোন্নতি হয় এবং তিনি সাজাহানাবাদের (দিল্লীর) সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭০ সালে দিল্লীতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হিন্দুস্থানে দেখা যায় না। সম্রাট নিজে ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলে, তিনি তাঁর অধিকার বা স্বত্ব অন্যদের দান করেন, উপহার দেন, অথবা ভাতা বা বেতন হিসাবে দেন।[৬]

দারাশিকোর চরিত্র

জ্যেষ্ঠপুত্র দারার যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল। কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায়, আচার-ব্যবহারে তাঁর মতন ভদ্র ও শিষ্ট আর কোনো রাজকুমার ছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত বেশি উচ্চধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন, তাঁর মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আশেপাশে আর কেউ নেই এবং কোনো ব্যাপারে কারও সঙ্গে যে সলাপরামর্শ করা যেতে পারে, তা তিনি মনে করতেন না। এই হামবড়াই ভাবের জন্য তাঁকে কোনো উপদেশ বা পরামর্শ দিতে কেউ সাহস করতেন না। এইভাবে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে পর্যন্ত অপ্রীতি-ভাজন হয়ে উঠেছিলেন। সিংহাসনলোভে তাঁর ভাইদের গোপন চক্রান্তের কথা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে জানলেও, তাঁর এই উদ্ধত স্বভাবের জন্য কেউ তাঁকে কিছু জানাতে সাহস করেনি। আত্মম্ভরিতাই শুধু তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ নয়, তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যাকে যা খুশি বলতে এতটুকু ইতস্তত করেন না, হোমরাচোমরা ওমরাহদেরও না। কথায় কথায় তিনি সকলকে অপমান করেন, গালাগাল করেন, যদিও ক্রোধ তাঁর স্ফুলিঙ্গের মতন দপ্‌ করে জ্বলে উঠে থপ্‌ করে নিবেও যায়। মুসলমান হিসেবে তিনি নিজ ধর্মের ক্রিয়াকর্ম সবই করতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কোনও ধর্ম-গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুর মতন মিশতেন, খ্রীস্টানদের সঙ্গে খ্রীস্টানের মতন। তাঁর আশেপাশে সবসময় হিন্দু পণ্ডিত ও শাস্ত্রকাররা থাকতেন (Gentile Doctors or Pendets) এবং তাঁদের বৃত্তিদানেও তিনি কার্পণ্য করতেন না। এইকারণে অনেকে তাঁকে কাফের মনে করত। কিন্তু সে-কথা পরে বলব, হিন্দুস্থানের ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন। 'জেসুইট ফাদারদের' সঙ্গে তাঁর বিশেষ খাতির ছিল। শোনা যায়, রেভারেণ্ড ফাদার বুজির উপর তাঁর

৬। ইয়োরোপ ও ভারতের 'ভূমিস্বত্বের' (Proprietorship of Soil) পার্থক্য সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরীখ এঙ্গেল্‌সের পত্র দু'খানির কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। 'ভূমিকায়' পত্র দু'খানি অনুবাদ করে দিয়েছি।

প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর মতামত তিনি নাকি শ্রদ্ধাভরে শুনতেন।[৭] একদল লোক বলতেন যে দারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করেন না, সব ধর্মের প্রতিই তিনি কেবল কৌতূহলবশে আগ্রহ দেখান এবং মজা করার জন্য সকলের সঙ্গে মেশেন। কেউ কেউ বলেন যে সবটাই হল তাঁর রাজনৈতিক মতলববাজি, কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি সুবিধামত হিন্দুপ্রীতি ও খ্রীস্টানপ্রীতি দেখান। গোলন্দাজবাহিনীতে খ্রীস্টানদের সংখ্যা তখন বেশি ছিল বলে তিনি তাঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতেন, কারণ তাতে সামরিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যেত। হিন্দুপ্রীতি দেখাতেন দেশীয় নৃপতিদের ক্ষেত্রে, যাঁরা অধিকাংশই হিন্দু, এবং রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে বা বিদ্রোহে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও, দারার এই ধর্ম-উদারতার কৌশল খুব বেশি কাজে লাগেনি এবং তাতে তাঁর কোনো উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়নি। পরন্তু তাঁর ছোট ভাই ঔরঙ্গজীব তাঁর এই ভণ্ডামির সুযোগ নিয়ে তাঁকে 'কাফের' ও ধর্মদ্রোহী পাষণ্ড প্রতিপন্ন করে, তাঁর শিরশ্ছেদন করতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে। সে-কাহিনী পরে বলব।

সুলতান সুজার চরিত্র

সুলতান সুজার চরিত্রের সঙ্গে দারার অনেক দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও, তিনি আরও বেশি হিসেবী, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারেও অনেক বেশি মার্জিত ছিলেন। ষড়যন্ত্র করতে সুজার মতন ওস্তাদ আর কেউ ছিলেন না। নানারকম উপহার, পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে তিনি গোপনে ওমরাহদের হাত করতেন এবং যে-কোনো ষড়যন্ত্রে তাঁদের খেলার পুতুল করে তুলতেন। এইভাবে তিনি যশোবন্ত সিংহের (Jessomseingue) মতন বড় বড় হিন্দু রাজাদের পর্যন্ত নিজের দলে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁরও চরিত্রের একটি মারাত্মক দোষ ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তি তাঁর এত প্রবল ছিল যে তিনি তার ক্রীতদাস ছিলেন বললেও ভুল হয় না। স্ত্রীলোক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলে তাঁর

৭। কাত্রু (Catrou) তাঁর 'History of the Mogul Dynasty in India' (প্যারিস, ১৭১৫) নামক গ্রন্থে দারাশিকোর এই পাদরি-প্রীতির আরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। ভেনিসীয় পর্যটক মনুচ্চির (Signor Manucci) সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেই কাত্রু এই বই লিখেছেন। মনুচ্চি দীর্ঘদিন দিল্লী ও আগ্রার রাজদরবারে চিকিৎসক ছিলেন এবং দারার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাত্রু লিখেছেন: 'দারা যখন থেকে কর্তৃত্ব শুরু করলেন, তখন থেকেই তাঁর অহংকার ও অপরের প্রতি [illegible] [illegible] দেখা দিল। মুরিদের কয়েকজন

কোনো চেতনাই থাকত না। সারারাত, সারাদিন তিনি নাচগান-পান-হল্লার মধ্যে বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিতে পারতেন, অন্য কোনো বিষয়ে কোনো কাণ্ডজ্ঞানই থাকত না। তাঁর মোসাহেবদের তিনি দামি-দামি খিলাৎ দিতেন এবং তাঁদের তনখা খুশি মতন, নিজের মর্জি মতন, বাড়াতেন কমাতেন। সুতরাং কোনো ওমরাহের পক্ষেই তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার উপায় ছিল না। অন্তত স্বার্থের খাতিরেও তাঁদের সুলতান সুজার সঙ্গে প্রমোদ-সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিতে হত। তার ফলে তাঁর রাজ্যের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হল। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল এবং অভিযোগ জানাবার, বা আবেদন-নিবেদন করবার কোনো উপায় রইল না। কার কাছে কি জানাবে তারা? সুজা ও তাঁর ওমরাহরা দিনরাত মদ ও স্ত্রীলোক নিয়ে মশগুল থাকতেন।

সুলতান সুজা পার্সীদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, তুর্কীদের নন। ইসলামধর্ম বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত, গুলিস্তানের কবি শেখ সাদির মতে বাহাত্তর সম্প্রদায়ে। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান—তুর্কীপন্থী ও পার্সীপন্থী। তুর্কীরা মনে করেন, তাঁরাই মহম্মদের প্রকৃত বংশধর এবং পার্সীরা বিধর্মী কাফের। আবার পার্সীরা মনে করেন, তাঁদের আচরিত ধর্মই আসল ইসলামধর্ম, তুর্কীদের ধর্ম নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা অত্যন্ত তীব্র। সুলতান সুজার পার্সীপন্থী বা 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত হবার কারণ হল রাজনৈতিক। যেহেতু মোগলসাম্রাজ্যের অধিকাংশ আমীর-ওমরাহ 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং মোগল দরবারে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বেশি, সেইজন্য সুজাও সিয়াপন্থী, কারণ তাতে ওমরাহদের দিয়ে তাঁর কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

ঔরঙ্গজীবের চরিত্র

ঔরঙ্গজীব ভিন্ন প্রকৃতির। জ্যেষ্ঠ দারাশিকোর মতন তাঁর বাইরের চরিত্রে কোনো মাজাঘষা চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বন্ধুবান্ধব আমলা-অমাত্য নির্বাচনে তিনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার ছিলেন এবং এমন

সাহেব মাত্র তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জেসুইট ফাদারদের উপর দারার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। বিশেষ করে একজনের উপর, তাঁর নাম ফাদার বুজি। এই ফাদারটির প্রচণ্ড প্রভাব ছিল দারার উপর। এত বেশি প্রভাব যে দারা সিংহাসন লাভ করলে হয়ত সেই সঙ্গে খ্রীস্টানরাও হিন্দুস্থানের রাজা হয়ে বসতেন।

কাউকে কোনোদিন আমল দিতেন না, যার দ্বারা তাঁর নিজের কার্যসিদ্ধি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইভাবেই তিনি পদমর্যাদা পুরস্কারাদি বিতরণ করতেন। কতবার যে তিনি রাজদরবারে এবং ভাইদের কাছে ধনদৌলত, রাজৈশ্বর্যাদির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বীতরাগ ও বৈরাগ্যের ভাণ করেছেন এবং গোপনে সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছেন, তার ঠিক নেই। ছলাকলা ও কূটবুদ্ধিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না। যখন তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার হলেন, তখনও তিনি সকলের কাছে বলতেন যে প্রাদেশিক সুবাদারীতে তিনি খুশি নন, তাঁর দিল্ চায় ফকির হতে, দরবেশ হতে। সুবাদারীর ঝকমারি তাঁর পোষায় না, তাঁর বিবাগী মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। দানধ্যান, দয়াদাক্ষিণ্য করে, খোদাতাল্লার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাঁর জীবনের দিনগুলো শান্তিতে কাটাতে চান। অথচ তাঁর জীবন ঠিক এর উল্টো পথ ও নীতি ধরে চলেছে আগাগোড়া। একটার পর একটা চক্রান্ত না করে তিনি যেন স্বস্তিতে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সেই চক্রান্তের উপরে এমন একটা বৈরাগ্যের মুখোস লাগানো থাকত যে একমাত্র দারা ছাড়া বোধহয় আর কেউ তাঁর ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধির কথা জানতেন না। বাইরের বেশটা ফকির দরবেশের আলখাল্লা, ভিতরের মনটা কুচক্রী মতলববাজের। এই হলেন ঔরঙ্গজীব, সম্রাট সাজাহানের তৃতীয় পুত্র। ঔরঙ্গজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাজাহানেরও উচ্চধারণা ছিল না। দারা সেইজন্য তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে প্রায় বলতেন যে তাঁর সব ভাইদের মধ্যে ঐ 'নামাজী' (যিনি অত্যধিক নামাজ পড়েন) ভাইটিকে নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি।*

মুরাদের চরিত্র

অন্যান্য ভাইদের তুলনায় কনিষ্ঠ মুরাদ ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিহীন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল আমোদপ্রমোদ বিলাসব্যসন। তাতেই তিনি চব্বিশ ঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকতেন। এমনিতে অবশ্য তিনি উদার প্রকৃতির ও ভদ্র ছিলেন। তিনি প্রায় গর্ব করে বলতেন যে, কোনো রাজনৈতিক চক্রান্তের তিনি ধার ধারেন

* সম্রাট ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের অন্যান্য মহৎগুণ সম্পর্কে এমন অনেক কথা বার্নিয়ের পরে বলেছেন, যা তাঁর মতন একজন অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই বলা সম্ভব। ঔরঙ্গজীবের চরিত্র-বিশ্লেষণে বার্নিয়ের যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা আর কেউ দিতে পারেননি। এই গ্রন্থের 'দ্বিতীয় অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক

না এবং গোপন চক্রান্ত তিনি ঘৃণা করেন, কারণ ওটা কাপুরুষের ধর্ম, বীরের ধর্ম নয়। তাঁর ধর্ম বীরের ধর্ম, তাঁর নীতি বীরের নীতি, তলোয়ার ও বলপরীক্ষার প্রকাশ্য নীতি। মুরাদ অবশ্য সাহসী ছিলেন খুব। কিন্তু সাহস তাঁর যথেষ্ট থাকলেও, বুদ্ধি বিশেষ ছিল না। মুরাদের যতটা সাহস ছিল, তার এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকত, তাহলে বলা যায় না, হয়ত তিনিই বাকি তিন ভাইকে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়ে বসতে পারতেন।

বেগমসাহেবার প্রকৃতি

সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগমসাহেবা অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। সম্রাট তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাঁদের এই প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে রাজদরবারে ওমরাহমহলে নানারকমের কানাঘুষা গুজব পর্যন্ত রটেছিল।[৮] শেষ পর্যন্ত সম্রাট নিজে মোল্লাদের ডেকে ব্যাপারটার বিচার করে একটা ফয়সালা করতে বলেছিলেন। মোল্লারা নাকি বলেছিলেন যে, কন্যার সঙ্গে সম্রাটের এই সম্পর্ক রাখার অধিকার ন্যায়সঙ্গত, কারণ যে-বৃক্ষ তিনি নিজে রোপন করেছেন, তার ফল আস্বাদনের অধিকারও তাঁর আছে। মোল্লাদের এই কথার অর্থই বাইরে বিকৃত হয়ে রটেছিল। এই কন্যার উপর সাজাহানের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি পিতার সমস্ত দায়িত্ব বহন করতেন। সাজাহান যা আহার করতেন তা তাঁর তত্ত্বাবধানেই তৈরি করা হত, অন্যের তৈরি খাদ্য তিনি কখনও খেতেন না। এইজন্য মোগল দরবারে সম্রাটের এই কন্যার প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। সম্রাটের সঙ্গে তিনি ছায়ার মতন থাকতেন, তাঁর আমোদ-প্রমোদ, হাসিঠাট্টায় যোগ দিতেন, এবং কোনো গুরুতর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার সময় কন্যার মতামতের যথেষ্ট মূল্য দিতেন। বেগমসাহেবার ব্যক্তিগত ধনদৌলতও প্রচুর ছিল। কারণ তিনি সম্রাটের কাছ থেকে মোটা ভাতা ও উপহার তো পেতেনই, ওমরাহ আমলা-অমাত্যরাও যাতে তাঁর নেকনজরে থাকেন তার জন্য সর্বদাই তাঁকে নানারকম উপঢৌকন দিয়ে খুশি করার চেষ্টা

৮। ভ্যালেণ্টিন ও কাত্রুও এই গুজবের কথা উল্লেখ করেছেন। কাত্রু লিখেছেন: 'বেগম-সাহেবা শুধু যে সুন্দরী ছিলেন তা নয়, ছলাকলায় ও বুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। পিতা সাজাহানের প্রতি তাঁর এত দুর্বলতা ছিল এবং সম্রাট সাজাহানও এত বেশিমাত্রায় তাঁর কন্যার প্রতি প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখাতেন যে, বাইরে তাই নিয়ে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা চলত। মনে হয়, সমস্ত ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন গুজব মাত্র এবং ওমরাহদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার।'

করতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা যে সম্রাটের প্রীতিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ তাঁর ভগিনীর সহানুভূতি। দারা সবসময় এই ভগিনীর মন যুগিয়ে চলতেন এবং এমন কথাও নাকি বলতেন যে, তিনি যদি সম্রাট হতে পারেন তাহলে বেগমসাহেবাকে বিবাহের অনুমতি দেবেন। অনেকে হয়ত এই কথা শুনে ভাববেন যে বিবাহের প্রতিশ্রুতি আবার এমন কি ব্যাপার! কিন্তু হিন্দুস্থানের রাজবংশের কাহিনী যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে রাজকন্যার বিবাহের এই প্রতিশ্রুতি দানের তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়বে। রাজকুমারীদের সহজে বিবাহ দেওয়া হত না, পাছে জামাইরাও রাজ্যলোভী হয়ে ওঠেন সেইজন্য। রাজকন্যার বিবাহ রাজপুত্রের সঙ্গেই দিতে হত এবং রাজপুত্রের পক্ষে রাজ্যলোভী হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং রাজকুমারীদের বিবাহ দেওয়া হিন্দুস্থানে একটা কঠিন সমস্যা।

দেশভেদে প্রেমের কৌশল বর্ণনা

রাজকুমারী বেগমসাহেবার প্রণয়কাহিনী যা শোনা যায় তার মধ্যে দুটি কাহিনী আমি এখানে উল্লেখ করব। কেউ যেন ভাববেন না যে অকারণে আমি রোমান্স বা রূপকথা রচনা করতে বসেছি। যা আমি লিখছি তা সব ইতিহাসের ঘটনা এবং আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, হিন্দুস্থানবাসীর আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সম্বন্ধে যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ও স্বকর্ণে শুনেছি, তাই কোনোরকম অতিরঞ্জিত না করে বর্ণনা করা। প্রথমেই বলি, ইয়োরোপে প্রেম করা যত সহজ, এসিয়ায় তত সহজ নয়। ইয়োরোপের প্রেমিক-প্রেমিকারা অনেকটা নির্ভয়ে প্রণয়ের দুঃসাহসিক পথে অভিযান করতে পারেন, কিন্তু এসিয়ায় পদে-পদে বিপদের সম্ভাবনা। ফ্রান্সে প্রেম করা হল মজার ব্যাপার। ফরাসীরা হেসে, হৈ-হল্লা করে, হাততালি দিয়ে প্রেম উড়িয়ে দিতে পারে, এবং হাসির মতনই প্রেম সেখানে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এদেশে (এসিয়ায় ও হিন্দুস্থানে) প্রেম একটা ভয়াবহ ব্যাপার, প্রেম একবার করলে আর রেহাই নেই, তার শোচনীয় মর্মান্তিক ফলাফল ভোগ করতেই হবে। এইজন্য এসিয়াতিক প্রেমের পরিণতি সাধারণত ট্র্যাজিক।

বেগমসাহেবা সর্বদাই প্রায় অন্দরমহলে বন্দী হয়ে থাকতেন এবং পরিচারিকারা তাঁকে ঘিরে থাকত। বাইরের কোনো ব্যক্তি সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না। একজন ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলেন এবং তিনি যে খুব

উচ্চবংশজাত কেউ তা নন, সাধারণ একজন অমায়িক ভদ্রলোক। পরিচারিকারা সবসময়ে বেগমসাহেবাকে চোখে-চোখে রাখতেন, তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং কন্যার প্রণয়কাহিনীর খবর সম্রাটের কাছে ঠিক পৌঁছল। হঠাৎ একদিন সম্রাট অতর্কিতে এসে তাঁর কন্যার গোপন কক্ষে এমন এক অপ্রত্যাশিত সময়ে ঢুকে পড়লেন যে, বেগমসাহেবার প্রণয়ী কোনো দিশা না পেয়ে পাশের স্নানঘরের গরম জলের টবের মধ্যে আত্মগোপন করলেন। সম্রাট এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝতে পারেননি। কন্যার সঙ্গে বসে-বসে নানাবিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। শেষকালে, একথা-সেকথার পর, কথার মোড় ঘুরিয়ে হঠাৎ তিনি বললেন যে বেগমসাহেবার গায়ের রং আগের চেয়ে ময়লা হয়ে গেছে এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তিনি শরীরের তেমন তোয়াক্কা করেন না, প্রসাধন করেন না। এই কথা বলেই সম্রাট হুকুম দিলেন খোজাদের গোসলখানা খুলে দিতে এবং টবের জল গরম করার জন্য আগুন ধরিয়ে দিতে। আগুন ধরানো হল, গোসলখানায় টবের জল টগবগ করে ফুটতে লাগল এবং তার মধ্যে বেগমসাহেবার হতভাগা প্রেমিকও সিদ্ধ হতে লাগলেন। সম্রাট সাজাহান চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। খোজারা যখন বললে যে তার শেষ হয়ে গেছে তখন তিনি গম্ভীরভাবে কন্যার কক্ষ ত্যাগ করে উঠে গেলেন। এইভাবে বেগমসাহেবার প্রেমের পরিণতি হল, ফুটন্ত গরম জলে সিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল প্রেমিকের।

বেগমসাহেবার দ্বিতীয় প্রেমকাহিনীর পরিণতিও করুণ। এইবার বেগমসাহেবা একজন উচ্চবংশজাত সুদর্শন পার্সী যুবককে পছন্দ করে তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত খানসামা নিযুক্ত করলেন, নাম নজরখাঁ। ঔরঙ্গজীবের পিতৃব্য সায়েস্তা খাঁ এই যুবকটিকে নাকি বিশেষ স্নেহ করতেন এবং সম্রাটের কাছে বেগমসাহেবার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবও নাকি তিনি করেছিলেন। সম্রাট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে এই পার্সী যুবকের যে গোপন প্রণয়সম্পর্ক আছে তা সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন সম্রাট তাকে আমন্ত্রণ জানালেন দরবারে। যুবকটি আসতেই তিনি আমীর-ওমরাহদের সামনেই তাকে হাসিমুখে একটি পান দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। আপ্যায়নে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে যুবক নজরখাঁর বুক তখন ফুলে উঠলো। তিনি মহানন্দে সাজাহানের হাতে-করে-দেওয়া সুগন্ধি পান চিবোতে লাগলেন।

উপস্থিত কেউ ভাবতে পারেননি যে পানের মধ্যে বিষ আছে এবং সম্রাট তা নিজের হাতে নজরখাঁকে খেতে দিয়েছেন। পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে নজরখাঁ মনের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, বেগমসাহেবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে, নিজের পাল্‌কিতে গিয়ে উঠলেন।[১] পানের ক্রিয়া পাল্‌কির মধ্যেই হল, আর তাঁকে নামতে হল না। প্রেমের পান খেয়ে বেগমসাহেবার দ্বিতীয় প্রেমিকের প্রেমলীলা ও ভবলীলা দুই-ই সাঙ্গ হল।

কনিষ্ঠা রোশনআরার প্রকৃতি

রোশনআরা বেগম জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতন সুন্দরী বা বুদ্ধিমতী ছিলেন না। তা না হলেও, ভোগবিলাসী তিনি কম ছিলেন না। রোশনআরা ছিলেন ঔরঙ্গজীবের অনুরাগী এবং প্রকাশ্যেই তিনি দারা ও বেগমসাহেবার শত্রুতা ও বিরোধিতা করতেন। সেইজন্য তিনি খুব বেশি ব্যক্তিগত ধনদৌলত সঞ্চয় করতে পারেননি এবং রাজকার্যেও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্তঃপুরে থেকে তিনি অনেক গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের খবর পেতেন এবং তার প্রত্যেকটি পূর্বাহ্ণে ঔরঙ্গজীবকে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতেন।*

১। বাংলা 'পাল্‌কি' কথা সংস্কৃত 'পর্যঙ্ক' থেকে এসেছে। পর্তুগীজরা বলতেন 'Palanchino', ইংরেজরা 'Palanquin'.

* সম্রাট সাজাহানের পুত্রকন্যার স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করে বার্নিয়ের বলেছেন যে চার পুত্রের বদমেজাজের জন্য শেষজীবনে সাজাহান রীতিমত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কাটিয়েছেন। পুত্ররা সকলেই বিবাহিত ও বয়স্ক, কিন্তু তবু সমস্ত আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করে ভাইয়ে-ভাইয়ে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিল সিংহাসন নিয়ে। রাজদরবারের পরিবেশও বিষাক্ত হয়ে উঠল। সম্রাট তাদের শাস্তি দিতে পারতেন, বন্দীও করে রাখতে পারতেন, কিন্তু সাহস করেননি। চার পুত্রকে চারটি প্রদেশের সুবাদারি দিয়ে তিনি শান্ত করতে চাইলেন, কিন্তু তাতে উল্টো ফল হল। সুবাদারি পাবার পর পুত্রদের স্বেচ্ছাচারিতা আরও বাড়তে লাগল। স্বাধীন রাজার মতন তাঁরা বেপরওয়া ব্যবহার করা শুরু করলেন এবং রাজস্ব পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করে দিলেন সম্রাটকে। গৃহবিবাদ শেষে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। এই গৃহযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বার্নিয়ের। অনেক ইতিহাসের বইয়ে এই বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাই বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের এই অংশটুকু অনুবাদ করলাম না। এই অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণনার শেষে বার্নিয়ের লিখেছেন: "এইভাবে চার ভাইয়ের সাম্রাজ্যলাভের জন্য যে গৃহযুদ্ধের আগুন জলে উঠেছিল, তার অবসান ঘটল। প্রায় পাঁচ ছ'বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল, অর্থাৎ প্রায় ১৬৫৫ সাল থেকে ১৬৬০ কি ১৬৬১ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষে ঔরঙ্গজীব বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন।" এই কথা বলে বার্নিয়ের গৃহযুদ্ধের অধ্যায়টি শেষ করেছেন।

পরবর্তী অধ্যায়—'Remarkable Occurrences'—যুদ্ধান্তের পর রাজদরবারের প্রায় পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এর মধ্যে মোগলযুগের রাষ্ট্রীয় আদবকায়দার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে যদিও অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষ নেই। রাষ্ট্রীয় আচারেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে এই অধ্যায়ের সারানুবাদ করেছি। এই দুই অধ্যায় মূলগ্রন্থের অর্ধেকের কিছু কম তার মধ্যে যুদ্ধের বিবরণের অধ্যায়টি চারভাগের একভাগ। বাকি অর্ধেক হল ফ্রান্সের তাৎকালিক অর্থসচিব (চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে) মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখিত বার্নিয়েরের বিখ্যাত চিঠি ফরাসী পণ্ডিত মঁশিয়ে ভেয়ারের কাছে আগ্রা এবং দিল্লীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ সম্পর্কিত চিঠি ফরাসী কবি শাপলাঁর কাছে লিখিত হিন্দুস্থানের সমাজব্যবস্থার ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সম্বন্ধে চিঠি, ওরঙ্গজীবের কাশ্মীর অভিযান ও কাশ্মীর সম্পর্কে কয়েকখানি চিঠি এবং বাংলাদেশের সম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ। এর মধ্যে কলবার্ট, ভেয়ার ও শাপলাঁর কাছে লিখিত চিঠি তিনখানি এবং বাংলাদেশের বিবরণটি, আমার মনে হয় বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এই চিঠি তিনখানি ও বাংলাদেশের বিবরণটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছি, কাশ্মীরের কথা বাদ দিয়েছি—অনুবাদক

গৃহযুদ্ধোত্তর ঘটনা

যুদ্ধান্তের পর ঔরঙ্গজীব যখন হিন্দুস্থানের সম্রাট হলেন তখন রাজসভায় উজবেক তাতাররা ঔরঙ্গজীবের সমস্ত কার্যকলাপ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা দেখলেন, একে-একে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে ঔরঙ্গজীব রাজসিংহাসন দখল করলেন। তারা জানতেন যে সম্রাট সাজাহান জীবিত আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। ঔরঙ্গজীবের প্রতি তাঁদের অতীতের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁরা ভোলেননি, তার জন্য তাদের আতঙ্ক ও সঙ্কোচও ছিল যথেষ্ট। তবু উজবেক খাঁরা দুজনেই দূত পাঠালেন ঔরঙ্গজীবের দরবারে এবং তাঁদের বলে দিলেন, যথারীতি সম্রাটকে 'মুবারক' জানাতে (শুভেচ্ছা জানাতে)। যুদ্ধবিগ্রহের পর যদি স্বেচ্ছায় কেউ বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তার কি মূল্য দেওয়া উচিত, দূরদর্শী ঔরঙ্গজীব তা বিলক্ষণ জানতেন। তিনি এও জানতেন যে উজবেক খাঁরা প্রতিশোধের ভয়ে, অথবা কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন। তাহলেও তিনি তাঁদের যথারীতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠিত হননি। ঠিক এইসময় আমি রাজদরবারে নিজে উপস্থিত ছিলাম এবং স্বচক্ষে আমি সব দেখেছি। যা নিজে দেখেছি তার বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

তাতার দূতের কথা

তিন-তিনবার কপাল থেকে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে উজবেক রাষ্ট্রদূতরা সম্রাটকে সেলাম করলেন। তারপর তাঁরা ঔরঙ্গজীবের এত কাছে এগিয়ে গেলেন যে সম্রাট স্বচ্ছন্দে তাঁদের হাত থেকে চিঠি ক'খানা নিজেই নিতে পারতেন, কিন্তু নিলেন না। একজন ওমরাহ এই পত্র উপহারের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করলেন।[২] তিনি নিজে চিঠি গ্রহণ করলেন এবং খুললেন, তারপর সম্রাটের

১। বার্নিয়েরের এই প্রত্যক্ষ বিবরণের মধ্যে মোগল রাজদরবারের রাষ্ট্রীয় আদবকায়দা সম্বন্ধে অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে নজর রেখে এখানে তাই প্রত্যক্ষদর্শী বার্নিয়েরের এই বিবরণের আমি সারানুবাদ করেছি।—অনুবাদক

২। 'ওমরাহ' কথাটি কিন্তু 'আমীর' শব্দের বহুবচন, মোগল রাজদরবারের কর্মচারীদের

হাতে সেগুলি অর্পণ করলেন। সম্রাট সেই পত্র গম্ভীরভাবে পাঠ করলেন এবং পাঠান্তে আদেশ দিলেন রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যেককে 'শিরোপা' উপহার দিতে। অর্থাৎ পাগড়ি, জরির কারুকার্য করা মেরজাই এবং কোমরবন্ধনী তাতার দূতদের উপহার দিতে সম্রাট আদেশ দিলেন। তারপর উজবেক খাঁরা যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, দূতরা তাই নিয়ে এলেন। তার মধ্যে ছিল কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট নীলরঙের নীলোপল বা বৈদূর্যমণি (Lapis Lazuli)।[৩] ভাল-ভাল তেজী তাতার অশ্ব কয়েকটি, উটের পিঠে বোঝাই নানারকমের ফল আপেল আঙুর ইত্যাদি। বোখারা সমরকন্দ থেকেই প্রধানত এইসব ফল দিল্লীর দরবারে আমদানি করা হত। এছাড়া কয়েক জোড়া শুক্‌নো বোখারাই ফলও ছিল তার মধ্যে।[৪]

উজবেক খাঁদের উপঢৌকনের প্রাচুর্য দেখে ঔরঙ্গজীব প্রীত হলেন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রশংসা করলেন। এমন ফল, এমন ঘোড়া,

শব্দে সংবদ্ধভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণত লেখকরা ও বিদেশী পাঠকরা আমীর ও 'ওমরাহ' একই অর্থে (একবচনে) ব্যবহার করেন।

Amir, corruptly ***Emir***. A nobleman, a Mohammedan of high rank.

Amra or Umra, corruptly ***Omrah***. The nobles of a native Mohammedan court collectively.—(Wilson's Glossary)

৩। 'Lapis-Lazuli' গাঢ় নীলবর্ণের মূল্যবান পাথরবিশেষ, নীলোপল বা বৈদূর্যমণি বলা হয়। এই পাথর গুঁড়ো করে পারস্য কাশ্মীর ও দিল্লীর লিপিকররা পাণ্ডুলিপি চিত্রণের জন্য নীল রং তৈরি করতেন। বৈদূর্যমণিচূর্ণের এই নীলরঙের উজ্জ্বলতার সঙ্গে আজকালকার রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নীলরঙের কোনো তুলনাই হয় না। এইসব মণিরত্ন রাষ্ট্রদূতরা উপঢৌকন দিতেন, বোধহয় তাজমহলের জন্য। তাজমহল তৈরি যদিও ১৬৪৮ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাহলেও তার কারুকাজ শেষ করতে নিশ্চয় আরও দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল ('built by Titans, finished by Jewellers')। ১৮৬৯ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত একখানি ফারসী পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাজমহল নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাতে বলা হয়েছে যে নীলোপল সিংহল থেকে আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু একথাও প্রসঙ্গত বলা হয়েছে যে তাজমহল নির্মাণে যেসব মূল্যবান মণিরত্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশই রাজামহারাজা-নবাবরা স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন অথবা বিদেশের রাজারা উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

৪। বোখারার এই শুকনো খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি ফলকেই আমরা 'আলুবোখারা' বা আলু-বখরা (চলতি কথায়) বলি কি ?

এমন উট নাকি আর কোথাও দেখা যায় না। তারপর সমরকন্দের মাদ্রাসা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করে তিনি তাঁদের বিদায় দিলেন।[৫]

অভ্যর্থনাদির পর তাতার দূতরা ফিরে এলেন বেশ খুশি হয়ে। ভারতীয় রীতিতে মাথা হেট করে 'সেলাম' করার জন্য তারা বিশেষ বিরক্ত হননি। 'সেলামের' পদ্ধতিটা বাস্তবিকই বিসদৃশ, কোথায় যেন একটা গোলামির চিহ্ন তার মধ্যে রয়েছে। সম্রাট যে নিজে হাতে করে তাঁদের কাছ থেকে পত্র নেননি, তাতেও তাঁরা তেমন ক্ষুব্ধ হননি। তাঁদের যদি মাটিতে মুখ দিয়ে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করতে হত, অথবা তার চেয়েও লজ্জাকর কোনো উপায়ে, তাহলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা তা বিনা দ্বিধায় করতেন। একথা ঠিক যে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এইভাবে অভিবাদন জানাতে বলা হয়নি, অথবা ওমরাহ মারফত পত্রও গ্রহণ করা হয়নি। এই মর্যাদা একমাত্র পারস্যের রাষ্ট্রদূত মোগল-দরবারে পেয়ে থাকেন, তাও সবসময় পান না।

উজবেক রাষ্ট্রদূতরা প্রায় চারমাস দিল্লীতে ছিলেন। দীর্ঘদিন থাকার জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যহানি হয়। তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা অনেকে রোগে ভুগে মারাও যান। তাঁরা হিন্দুস্থানের অত্যধিক গরম সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছিলেন কি না তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। নিজেদের নোংরা জীবনযাত্রার জন্য, অথবা হয়ত অত্যধিক ভোজনপটুর যতটা পরিমাণ খাদ্য খাওয়া উচিত তা না খাওয়ার জন্য, তাদের মৃত্যু হয়েছিল। এই উজবেক তাতারদের মতন সংকীর্ণচিত্ত ও অপরিচ্ছন্ন নোংরা জাত আমি আর দেখিনি। দূতাবাসের কর্মীরা সম্রাট

৫। সমরকন্দ এককালে তৈমুরের রাজধানী ছিল এবং তখন তার রূপ ছিল অন্যরকম। 'সমরকন্দের মধ্যস্থলে ছিল রিজিস্থান, একটি স্কয়ার, তার মধ্যে তিনটি বিখ্যাত মাদ্রাসা—উলুগ-বেগ, শের্ দর্ ও তিল্লা করি। স্থাপত্যের সৌন্দর্যে ইতালীর শহরের স্কয়ারগুলির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। শের্ দর মাদ্রাসা ১৬০১ সালে তৈরি হয় এবং তার সিংহদ্বারের মাথায় দুটি সিংহ থেকে নাম হয় 'শের্ দর্'। নীল, সবুজ, লাল ও সাদা এনামেল করা ইট দিয়ে মাদ্রাসাটি তৈরি এবং সমরকন্দের উক্ত তিনটি মাদ্রাসার মধ্যে এই শের্ দর্ই অন্যতম ও বৃহত্তম। ১২৮ জন মোল্লা এই মাদ্রাসার ৬৪ খানা ঘরে বাস করতেন। 'তিল্লা-করি' অর্থে স্বর্ণাচ্ছাদিত', ১৬১৮ সালে তৈরি এই মাদ্রাসার ৫৬টি ঘর ছিল। কিন্তু আয়তনে সবচেয়ে ছোট হলেও 'উলুগ-বেগ' মাদ্রাসাই সবচেয়ে বিখ্যাত, ১৪২০ (বা ১৪৩৪) সালে তৈমুর নিজে তৈরি করেছিলেন। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার জন্য এই উলুগ্-বেগ্ মাদ্রাসা পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে খ্যাতি অর্জন করেছিল।' (Encyclopaedia Britannica, 9th ed. 1886)

ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে যা হাতখরচ পেতেন, তা খরচ না করে কৃপণের মতন তাঁরা জমাতেন এবং দীনহীনের মতন জঘন্যভাবে দিন কাটাতেন। তা সত্ত্বেও এ হেন জীবদের বিদায় দেওয়া হল মহাসমারোহে। সম্রাট প্রত্যেককে মূল্যবান শিরোপা দিলেন দুটি করে এবং নগদ আট হাজার করে টাকা। এছাড়া তিনি খাঁ-দের জন্য উপঢৌকনও পাঠালেন—সুন্দর সুন্দর শিরোপা, সোনারুপো ও জরিবকারুকরা নানারকমের কাপড়, কয়েকখানা কার্পেট, এবং দুই খাঁর জন্য মণিরত্নখচিত দুখানি কৃপাণ।

আমার একজন উজবেক বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে এই রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন সম্রাটের চিকিৎসক বলে। আমিও তিনবার দূতাবাসে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু সংগ্রহ করে নেব। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব! তাঁরা রাষ্ট্রদূত হলেও নিজের দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। এমনকি তাঁরা নিজের দেশের ভৌগোলিক সীমানাটুকু সম্বন্ধেও অজ্ঞ। স্বদেশ সম্বন্ধে এরকম নীরেট অজ্ঞতা সচরাচর দেখা যায় না। তাতাররা যে একসময় চীন জয় করেছিল, সে সম্বন্ধেও তাঁরা কিছুই জানেন না।[৬] মোটকথা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমি বিশেষ নতুন কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারিনি। একবার আমার প্রবল বাসনা হল, তাঁদের সঙ্গে বসে খানা খাবার। খানাটেবিলে কাউকে বসতে দিতে তাঁদের অবশ্য বিশেষ আপত্তি নেই দেখলাম। নিমন্ত্রিত হয়ে একদিন খানা খেতে বসলাম। খাব কি? খাদ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই, একমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়ার মাংস ছাড়া। তাহলেও খেতে যখন বসেছি, তখন খেতে কিছু হবেই। না খেলে, আমার ব্যবহারে হয়ত তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন। তাঁদের কাছে যা পরম সুস্বাদু খাদ্য, আমার কাছে তা যে অখাদ্য তা প্রকাশ করবার উপায় নেই। খাবার সময় আমি আর একটি কথাও বললাম না। দেখলাম, গোগ্রাসে তাঁরা পোলাও গিলতে

৬। ১১০০ খ্রীস্টাব্দে তাতারবাহিনী চীনে প্রথম অভিযান করেছিল। বার্নিয়ের বোধ হয় সেই অভিযানের কথা বলছেন না। তখন তাতাররা বিতাড়িত হয় এবং ১৬৪৪ সালে পুনরায় অভিযান করে চীন জয় করে। শুন্‌চি বা চুন্‌-চি সম্রাট হন চীনের। বার্নিয়ের এই চীন-বিজয়ের কথা বলছেন। তখন যে মাঞ্চু-তাতার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের বংশধররাই চীনে রাজত্ব করেন।

লাগলেন।[৭] চামচ দিয়ে খেতে তারা জানেন না। বেশ পেট ভরে খেয়েদেয়ে তাঁরা খোশমেজাজে দু'চারটে কথা আলাপ করতে লাগলেন। বুঝলাম, এতক্ষণে আলাপ করবার মতন তাঁদের মেজাজ হয়েছে। প্রথমেই তাঁরা আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, উজবেকদের মতন বলিষ্ঠ জাত আর নেই এবং তীরধনুকের ব্যবহারে তাঁদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে না। কথাটা বলা মাত্রই তীরধনুক আনার হুকুম দেওয়া হল। হিন্দুস্থানের তীরধনুকের চেয়ে আকারে অনেক বড়। ধনুকে তীর চড়িয়ে একজন বললেন যে, এই তীর দিয়ে তাঁরা যে কোনো ষাঁড় বা ঘোড়াকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারেন। তারপর আরম্ভ হল উজবেক মেয়েদের বীরত্বের সব চমকপ্রদ কাহিনী। সে-কাহিনী আর শেষ হয় না। তার মধ্যে একটি কাহিনী শুনে আমিও চমৎকৃত হয়েছিলাম। উজবেকী ঢঙে তার বর্ণনা করব কি?

কাহিনীটি এই: ঔরঙ্গজীব একবার উজবেকদের দেশ জয় করতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য উজবেকদের একটি গ্রামে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করছিল। সেই সময় এক উজবেক বৃদ্ধা রমণী এসে সৈন্যদের বলেন: বাছারা, আমার কথা শোন। এইভাবে লুটতরাজ করো না। আমার মেয়েটি এখন বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়েছে তাই, তা না হলে টের পেতে। যাই হোক, কন্যার আমার ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে,

৭। ফার্সী 'পলাও' থেকে 'পোলাও' কথার উৎপত্তি, মুসলমান আমলের বিখ্যাত খাদ্য। ওভিংটন্ সাহেব তাঁর A Voyage to Suratt, in the year 1689' নামক গ্রন্থে (১৬৯৬ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত) 'পোলাও' সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছেন: 'Palau, that is Rice boiled so artificially, that every grain lies singly without being added together, with Spices intermixt and a boil'd Fowl in the middle, is the most common Indian Dish, and a dumpoked Fowl that is boil'd with butter in any small Vessel, and stuft with Raisons and Almounds is another' (৩৯৭ পৃষ্ঠা) পোলাও বিলাসীরা এই বর্ণনা পড়ে খুশি হবেন। নানারকমের মশলাপাতি ও ঘি দিয়ে চাল এইভাবে সিদ্ধ করে রান্না তার মধ্যিখানে একটি সিদ্ধ মুর্গী, এই হল পোলাও অর্থাৎ মুর্গীর পোলাও। অবশ্য ওভিংটন্ বললেও, এই খাদ্য মোগলযুগে 'common' (সাধারণের খাদ্য) ছিল না, তিনি যে মহলে খোরাকেরা করতেন অর্থাৎ ওমরাহ-মহলে ও রাজদরবারে, সেখানে হয়ত 'common dish' ছিল। 'Dumpoked' কথাটি সাহেব কিন্তু ফার্সী 'দম্‌পুখ্‌ত' থেকে ইংরেজি করেছেন, অর্থ হল 'steam-boiled' বা বাষ্পে সিদ্ধ। আজকালকার দিনে 'দম্‌পুখ্‌ত' বা 'স্টীমসিদ্ধ' মুর্গীর কথা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই।

সময় থাকতে সরে পড়।' বৃদ্ধার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না, করবার কথাও নয়। তারা নিজেদের কাজ হাসিল করে, অশ্বপৃষ্ঠে লুঠের মাল বোঝাই করে নিয়ে চলতে থাকল। গ্রামের কিছু লোকজনও বন্দী করে নিয়ে চলল দাসদাসী হিসেবে, তার মধ্যে ঐ বৃদ্ধাও একজন। কিছুদূরে যেতেই পথে বৃদ্ধার সেই গৃহাভিমুখী কন্যাকে দেখা গেল। বৃদ্ধা তা দেখেই হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেলল। কন্যাকে কিন্তু তখনও স্পষ্ট দেখা বা চেনা যাচ্ছিল না। দুরন্তবেগে ধাবমান অশ্বের খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলির ধূম্রজাল ভেদ করে ঘোড়সওয়ার উজবেক কন্যার মূর্তি দূর থেকে আবছা ভেসে উঠল বৃদ্ধা মায়ের চোখের সামনে। ক্রমে সেই মূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকল। দেখা গেল, অশ্বপৃষ্ঠে ধনুর্বাণধারী উজবেক কন্যার দৃপ্ত মূর্তি, নির্ভীক যোদ্ধার মতন তেজোদ্দীপ্ত। দূর থেকে তখনও সে বলছে, কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে সে শত্রুদের মুক্তি দিতে রাজী আছে, যদি সমস্ত লুঠের সম্পত্তি ও গ্রামের বন্দী লোকজনদের ফিরিয়ে দিয়ে তারা নির্বিবাদে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। মোগল সৈন্যরা উজবেক যুবতীর কথায় কর্ণপাত করল না, বীরাঙ্গনার বীরত্বে তারা বিশ্বাসী নয়। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে তিন-চারটি তীর এসে সৈন্যদের গায়ে বিঁধল এবং সেই তিন-চারজনেরই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল। মোগল সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীর বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে উজবেক কন্যা আবার তীর ছাড়ল এবং ঠিক সেই এক-একটি তীরে একজন করে মারা গেল। এইভাবে সেনাদলের প্রায় অর্ধেক ধনুর্বাণে নির্মূল করে, উজবেক কন্যা তলোয়ার হাতে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বাকি অর্ধেকের শিরশ্ছেদন করল।[৮]

তাতার রাষ্ট্রদূতেরা দিল্লীতে যখন অবস্থান করছিলেন তখনই ঔরঙ্গজীবের কঠিন অসুখ হয়। জ্বরের প্রাবল্যে তিনি প্রায়ই ভুল বকতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে যেত।[৯] চিকিৎসকরা হতাশ হলেন এবং বাইরে রটে গেল যে তিনি মারা গেলেন। তাঁর অসুখের সংবাদটা অবশ্য নিজের কোনো গোপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য রৌশনআরা বেগম গোপন করে রেখেছিলেন। এই গোপনতাই হল গুজবের কারণ। শোনা গেল, রাজা যশোবন্ত সিংহ নাকি সম্রাট সাজাহানকে

৮। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের ডাচ সংস্করণে (আমস্টার্ডাম, ১৬৭২ সাল) এই কাহিনীটির একটি চমৎকার খোদাই-চিত্র আছে। ইংরেজি সংস্করণে ছবিটি নেই।

৯। ঔরঙ্গজীবের অসুখের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। ঔরঙ্গজীব পীড়িত হন—১৬৬২ সালের মে-আগস্ট মাসে (Indian Antiquary, ১৯১১)।

কারামুক্ত করবার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করেছেন। মহবৎ খাঁ, যিনি নির্বিবাদে ঔরঙ্গজীবের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত কাবুলে সুবাদারি থেকে পদত্যাগ করে, লাহোরের মধ্য দিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়েছেন সম্রাট সাজাহানকে মুক্ত ও পুনরভিষিক্ত করার জন্য। বন্দী সাজাহানের প্রহরী খোজা আতবর খাঁও সম্রাটের কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য অস্থির।

এদিকে ঔরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মুয়াজ্জম পূর্ণোদ্যমে ওমরাহদের সঙ্গে সিংহাসন দখলের সলাপরামর্শ করতে লাগলেন। ছদ্মবেশে তিনি গভীর রাত্রিতে রাজা যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে তাঁর পক্ষে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। অন্যদিকে রোশন-আরা বেগম কয়েকজন ওমরাহ ও ফিদাই খাঁর (ঔরঙ্গজীবের বৈমাত্রেয় ভাই) সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঔরঙ্গজীবের তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের (তখন সাত-আট বছরের ছেলে) পক্ষে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

দুই দলেরই অভিপ্রায় হল সম্রাট সাজাহানকে মুক্তি দেওয়া। অন্তত বাইরে জনসাধারণকে তাই তাঁরা বোঝালেন। কিন্তু একমাত্র বাইরে মুখরক্ষা করা ছাড়া এই অভিপ্রায়ের মধ্যে অন্য কোনো সদুদ্দেশ্য ছিল না। আমি অন্তত আদৌ তাঁদের কোনো সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস করি না। আমি জোর করেই বলতে পারি যে রাজদরবারের আমীর ওমরাহদের মধ্যে তখন অন্তত এমন একজনও ছিলেন না যিনি সম্রাট সাজাহানের মুক্তি ও পুনরভিষেক মনে-প্রাণে কামনা করতেন। একমাত্র যশোবন্ত সিংহ ও মহবৎ খাঁ প্রকাশ্যে বৃদ্ধ সম্রাটের কোনো বিরোধিতা করেননি। তাছাড়া ওমরাহদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ সম্রাটের প্রতি ঔরঙ্গজীবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। তাঁদের ধর্মই তা নয়, ন্যায়বিচার বা সাধুতা সততার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই। যিনি যখন সিংহাসন দখল করেন, তাঁরা তখন তাঁর খোশামোদ করে আমীরত্ব বজায় রাখেন। ওমরাহরা খুব ভালভাবেই জানতেন যে বৃদ্ধ সাজাহানকে কারামুক্ত করার অর্থ হল পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহকে মুক্ত করা। সকলেই বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার ভয় করতেন, খোজা আতবর খাঁ পর্যন্ত, কারণ বন্দী সাজাহানের প্রতি অকথ্য রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে খোজা খুবই সচেতন ছিলেন।

অসুস্থতার মধ্যেও ঔরঙ্গজীব স্থিরচিত্তে রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং

বন্দী বৃদ্ধ পিতার দিকে নজর রাখতেন। যদি তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তাহলে বৃদ্ধ সাজাহানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি পুত্র সুলতান মুয়াজ্জমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওদিকে আবার খোজা আতবর খাঁর কাছে প্রায়ই চিঠি লিখতেন, বৃদ্ধ সাজাহানের উপর কড়া নজর রাখার জন্য। বাইরের গুজব বন্ধ করবার জন্য অসুস্থ অবস্থায় তিনি একাধিকবার রাজদরবারে ওমরাহদের সামনে দর্শন দিয়েছেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি মূর্চ্ছা যান এবং মূর্চ্ছার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে যাবার আগে যশোবন্ত সিংহ ও কয়েকজন হোমরাচোমরা ওমরাহকে ডেকে পাঠান, তিনি বাঁচা কি মৃত স্বচক্ষে দেখে যাবার জন্য। মূর্চ্ছার পর থেকেই তিনি ক্রমে সুস্থ হতে থাকেন।

একটু সুস্থ হয়েই ঔরঙ্গজীব চেষ্টা করেন, দারার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্র সুলতান আকবরের বিবাহ দেবার জন্য। কিন্তু চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হল। সাজাহান ও তাঁর কন্যা জাহানারাবেগমের উপরেই দারার কন্যার দায়িত্ব ছিল। তাঁরা কিছুতেই ঔরঙ্গজীবের প্রস্তাবে রাজী হলেন না। রাজকুমারীর মনে মনে ভয় হল এবং তিনি স্থির করলেন যে যদি তাঁকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে ঔরঙ্গজীব এই বিবাহ দেন, তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকবে না। পিতৃহন্তার পুত্রকে তিনি প্রাণ থাকতে বিবাহ করবেন না।

সাজাহানের কাছে ঔরঙ্গজীব কিছু মণিরত্নও চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসনটি আরও বেশি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা। বন্দী সাজাহান ক্রুদ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজীবের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে তিনি যেন তাঁর রাজকার্য নিয়েই থাকেন, সিংহাসন নিয়ে মাথা না ঘামান। ধনদৌলত মণিরত্নের কোনো কথা সাজাহান আর শুনতে চান না, ওসবের প্রতি তাঁর আর কোনো আসক্তি বা আগ্রহ নেই। ধনরত্ন নিয়ে যদি বেশি কাড়াকাড়ি চলতে থাকে, তাহলে তিনি যে-কোনো মুহূর্তে লোহার হাতুড়ির আঘাতে মণিরত্নের সমস্ত সম্ভার চূর্ণ করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হুকুম দেবেন।

ডাচ দূতের কাহিনী

এইবার হল্যাণ্ডের পালা। ডাচদেরও দেরি হল না বাদশাহ ঔরঙ্গজীবকে 'মোবারক' জানাতে। দেরি হবার কথাও নয়। তাঁরাও স্থির করলেন যে,

মোগল দরবারে একজন দূত পাঠাবেন এবং সুরাটের বাণিজ্য-কুঠির কর্মকর্তা মঁসিয়ে আদ্রিকানকে[১০] দূত মনোনয়ন করলেন। আদ্রিকান বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। দরবারে দূত হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের দেশের জন্য অনেক কাজ করে এসেছিলেন। যদিও ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দুদমনীয় প্রকৃতির সম্রাট গোঁড়া মুসলমান হিসেবেও অত্যন্ত সচেতন এবং খ্রীস্টধর্মীদের প্রতি সাধারণত বিরূপ মনোভাবাপন্ন, তাহলেও এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ শিষ্টতা ও নম্রতার পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজদরবারে তিনি যেভাবে ডাচ রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মঁসিয়ে আদ্রিকান যখন ভারতীয় পদ্ধতিতে 'সেলাম' জানিয়ে দরবারগৃহে প্রবেশ করেন, তখন ঔরঙ্গজীব খুশি হয়ে তাকে বলেন সেলামের পরিবর্তে য়োরোপীয় পদ্ধতিতে 'স্যালুট' জানাতে। সম্রাটের কথায় আদ্রিকান সাহেবী কায়দায় জাঁদরেল ভঙ্গিতে স্যালুট করেন। সম্রাট অবশ্য ওমরাহ মারফত তাঁর পরিচয়পত্র গ্রহণ করলেন নিজে হাতে নিলেন না। এটা তিনি কোনো অসম্মান দেখানোর জন্য করেননি, এইটাই হল বাদশাহী রীতি। উজবেক রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকেও এইভাবে তিনি পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছিলেন।

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি শেষ হবার পর ঔরঙ্গজীব ডাচ রাষ্ট্রদূতকে তাঁর উপঢৌকন দিতে আদেশ করলেন। এটাও একটা রাজদরবারের রীতি। প্রথমে সম্রাট নিজে একটি শিরোপা উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। ডাচ দূত যেসব উপহার দিলেন তার মধ্যে লাল ও সবুজ রঙের কাপড়, বড় বড় ভাল আয়না, চীনা ও জাপানী-কাজ করা নানাবিধ জিনিস[১১]—তার

১০। দার্ক ভ্যান্ আদ্রিকেন্ (Dirk Van Adrichem) ১৬৬১ থেকে ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত সুরাটের ডাচ কুঠির ডিরেক্টর ছিলেন। তিনিই বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে একখানি ফরমান আদায় করে (দিল্লী, ২৯ অক্টোবর, ১৬৬২ সাল) বাংলাদেশে ও উড়িষ্যায় বাণিজ্যের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা করে নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়ে তিনি এই ফরমানটি আদায় করে নিয়ে আসেন।

১১। মোগলযুগের ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা রাজদরবারের ছবির মধ্যে জাপানী ও চীনা ফুলদানি ইত্যাদি যথেষ্ট দেখা যায়। তার থেকে বোঝা যায় যে চীনা ও জাপানী দ্রব্যাদি মোগল দরবারে অনেকে উপহার দিতেন।

মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একটি পালকি ও একটি তখ্‌ৎ-রওয়ান।[১২] শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে দুটি জিনিসই চমৎকার।

বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের যতদিন সম্ভব বাদশাহ আটকে রাখতে চান। বোধ হয় তাঁর ধারণা এই যে বিদেশী দূতরা তার রাজদরবারে উপস্থিত থাকলে বাইরের সাধারণ লোকের কাছে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই বিদেশী সম্রাটরা তার দরবারে সাগ্রহে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। তা না হলে আর এমন কোনো কারণ নেই যার জন্য তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এতদিন ধরে রাজধানীতে আটকে রাখতে পারেন। লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য। আমীর ওমরাহদের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা নানাবেশে রাজদরবারের শোভাবর্ধন করবেন, এইটাই হল বাদশাহের মনোবাসনা। মঁসিয়ে আদ্রিকানকে সেইজন্য তিনি সহজে ছাড়লেন না। আদ্রিকানের সেক্রেটারি মারা গেলেন, অন্যান্য কয়েকজন দূতাবাসের কর্মচারীরও মৃত্যু হল। তখন ওরঙ্গজীব ডাচ রাষ্ট্রদূত আদ্রিকানকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি দিলেন। বিদায়কালে তিনি আর-একটি শিরোপা উপহার দিলেন তাঁকে এবং বাতাভিয়ার[১৩] গবর্নরের জন্য একটি আলাদা শিরোপা দিলেন, অত্যন্ত মূল্যবান। তার সঙ্গে একটি ভোজালিও দিলেন, মণিমুক্তাখচিত। স্বতন্ত্র একটি বিনয়পত্রে অভিনন্দন জানাতেও ভুললেন না।

ডাচ রাষ্ট্রদূতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মোগল বাদশাহের নেকনজরে আসা এবং হল্যাণ্ড যে একটা উন্নত দেশ, ডাচরা যে একটা বিরাট ব্যবসায়ী জাত, এই উচ্চধারণা তাঁর মনে জাগানো। আদ্রিকান জানতেন যে যদি কোনোরকমে তিনি এইভাবে মোগল সম্রাটকে অভিভূত করতে পারেন, তাহলে হিন্দুস্থানে তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ করে নিতে পারবেন। তাঁরা যেসব জায়গায় এর মধ্যে বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানকার সুবাদারদের উৎপীড়ন ও

১২। 'তখ্‌ৎ-রওয়ান কথার অর্থ 'চলন্ত সিংহাসন'। 'তখ্‌ৎ' অর্থে আসন বা সিংহাসন এবং 'রওয়ান' অর্থে ভ্রাম্যমান, চলমান।

Takhta or Takht-rawan. A plank or platform on which public performers' singers and dancers are carried on men's heads in festival and religious processions —Wilson's Glossary

১৩। বাতাভিয়ার গবর্নর 'ইস্ট ইণ্ডিজে'র সমস্ত ডাচ বাণিজ্যকুঠির প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের গবর্নর-জেনারেল ছিলেন।

বাধাবিপত্তি থেকেও তাঁরা মুক্তি পাবেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক এই মর্মের একটি ফরমান তিনি ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। বাদশাহকে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে তাঁদের দেশের সঙ্গে হিন্দুস্থানের বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলে হিন্দুস্থানেরই ঐশ্বর্য বাড়বে। কিন্তু হিন্দুস্থানের কতটা ঐশ্বর্য তাঁরা পাকেচক্রে ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠন করতে পারবেন, সেকথা আর জানানো দরকার বোধ করেননি।

ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের অন্যদিক

ঠিক এই সময় একজন বিখ্যাত ওমরাহ বিশেষ ব্যস্ত হয়ে এসে একদিন সম্রাটকে বলেন যে সবক্ষণ তিনি যেরকম রাজকার্য নিয়ে চিন্তা করেন, তাতে তাঁর স্বাস্থ্য হানি হবার সম্ভাবনা আছে, এমনকি তাঁর মানসিক সজীবতা পর্যন্ত এতে নষ্ট হতে পারে। শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার কথাগুলো সম্রাটের কানে পৌঁছল বলে মনে হল না। তিনি অন্য আর-একজন ওমরাহের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে যা বললেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি আমি সেই ওমরাহের এক চিকিৎসক পুত্রের কাছ থেকে শুনেছি। পুত্রটি আমার বিশেষ বন্ধু। সম্রাট ঔরঙ্গজীব বলেছিলেন :

> আপনারা সকলেই সুধীজন, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আপনারা জানেন সঙ্কটের সময় সম্রাটের কর্তব্য কি। জাতির বা দেশের সঙ্কটকালে সম্রাটের একমাত্র কর্তব্য হল তাঁর নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করে, প্রয়োজন হলে নিজে তলোয়ার হাতে নিয়ে, প্রজাদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া। রাজার এই কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু তবু আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষী ওমরাহটি আমাকে বোঝাতে চান যে প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার নাকি মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তার জন্য একটি বিনিদ্র রাত্রিও যাপন করা আমার উচিত নয়, একদিনের জন্যও আমার আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা ঠিক নয়। তাঁর মতে আমার উচিত সবসময় নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা এবং আমার ভোগবিলাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। হয়ত তিনি চান যে-কোনো একজন উজীরের উপর সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পাই। তিনি জানেন না বোধ হয় যে রাজার ছেলে হয়ে যখন জন্মেছি এবং রাজসিংহাসনে বসেছি, তখন ঈশ্বর আমাকে নিজের জন্য বাঁচার ও চিন্তা করার সুযোগ দেননি, আমার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যও

চিন্তা করার আদেশ দিয়েছেন। যেখানে প্রজাদের সুখ নেই, সেখানে আমারও সুখ নেই। প্রজাদের সুখই আমার সুখ। প্রজাদের সুখ ও শান্তিই আমার সর্বক্ষণ চিন্তার বিষয়। একমাত্র ন্যায়বিচার, রাজকীয় কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সাময়িকভাবে এ চিন্তা বিসর্জন দেওয়া যায়, তাছাড়া অন্য কোনো সময় নয়। নিশ্চিন্ততা বা অন্যের উপর নিজের দায়িত্ব চাপানোর কুফল যে কিরকম ভয়াবহ হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার বোধ হয় কোনো ধারণা নেই। এইজন্যই তো মহাকবি সাদী বলেছেন: 'রাজা হয়ে জন্মো না রাজা হয়ো না। যদি রাজা হও তাহলে প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার রাজ্য তুমি নিজেই শাসন করবে।' আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটিকে গিয়ে বলুন যে তিনি যদি বাস্তবিকই আমার প্রিয়পাত্র হতে চান, তাহলে এরকম সদুপদেশ আমাকে দেওয়ার বা অকারণে আমার মোসাহেবি করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে আর যেন কোনো-দিন তিনি এই ধরনের অযাচিত উপদেশ দিতে না আসেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাসের জন্য মানুষের সহজ প্রবৃত্তি এমনিতেই যথেষ্ট সজাগ তাকে জাগাবার জন্য কোনো উপদেশের প্রয়োজন হয় না। ঘরে আমাদের স্ত্রীরাই সেকাজ অনেকটা করতে পারে, বাইরের পরামর্শদাতার দরকার হয় না তার জন্য।

খোজার বিচিত্র প্রেমকাহিনী

এই সময় আরও একটি বেশ মজার ঘটনা ঘটে। বাদশাহের বেগমমহলে তাই নিয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে যায় এবং খোজারা কখনও প্রেমে পড়তে পারে না বলে আমার মনে যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাও বদলে যায়। ঘটনাটি বেশ মজার ঘটনা এবং সত্য ঘটনা। দিদার খাঁ নামে বাদশাহের হারেমের একজন খোজা ছিল, সে একটি আলাদা বাড়ি তৈরি করেছিল ফূর্তি করার জন্য এবং সেখানেই সে মধ্যে মধ্যে ঘুমুত। হঠাৎ সে এক হিন্দু কেরানীর[১৪] সুন্দরী ভগিনীর

১৪। বার্নিয়েরের পাণ্ডুলিপিতে Un Ecrivain Gentil" কথাটি আছে। অর্থ হল হিন্দু লেখক, লিপিকর বা কেরানী। এইসময় রাজস্ব আদায়, হিসাবপত্র রাখা, রাজদরবারের পত্রনবীশের কাজ করা প্রায় হিন্দুদেরই একচেটিয়া ছিল। হিন্দু চৌধুরী, হিসাবনবীশ ও পত্রনবীশরা সকলেই ফারসী ভাষায় রীতিমত দুরস্ত ছিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান 'ক্যালকাটা রিভিউ' (No CIV, 1871) পত্রিকায় 'A Chapter from Muhammadan History" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন:

প্রেমে পড়ে। কিছুদিন দুজনের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্কের কথা নিয়ে কানাঘুষা চলতে থাকে। কিন্তু কারও মনে ব্যাপারটা সন্দেহের গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। যতই যাই হোক, খোজা তো! কি আর এমন ঘটতে পারে। কোনো মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে খোজা আবার প্রেমে পড়বে কি। আর যদিও বা দৈবচক্রে পড়ে তাহলেও এমন কিছু তাদের মধ্যে ঘটতে পারে না, যা নিয়ে কানাঘুষা চলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোজার প্রেম কবির প্রেমকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রেমের জল অনেকদূর পর্যন্ত গড়াল। দিদার খাঁ ও কেরানী ভগিনীর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকল। প্রতিবেশীরা সকলে হিন্দু কেরানীকে সাবধান করে দিল। অনেকে কটু কথায় অপমান করতেও ছাড়ল না। কেরানী ভদ্রলোক তাদের কথায় বিচলিত ও অপমানিত হয়ে একদিন তার ভাগিনী ও খোজাটিকে ডেকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে তাদের সম্বন্ধে যে সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্য হয় তাহলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সত্য প্রমাণ হতে খুব বেশি দেরি হল না। একদিন দেখা গেল, এক ঘরে একই শয্যায় সেই ভগিনী খোজাসহ শয়ন করে আছে। হিন্দু ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দিদার খাঁ ও তাঁর ভগিনীকে হত্যা করলেন। হারেম ও বেগম-মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। হারেমের অন্যান্য খোজারা ষড়যন্ত্র করল, কেরানীকে তারা হত্যা করবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কানে পৌঁছতেই তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা করলেন। অবশ্য সম্রাট সেই হিন্দু কেরানী ভদ্রলোককে বাধ্য করলেন ইসলামধর্মে দীক্ষা নিতে। খোজা দিদার খাঁর অপূর্ব প্রেমকাহিনীর এইভাবে শেষ হল।

রাজকুমারীর প্রেম

খোজার প্রেম শেষ হতে না হতে রাজকন্যার প্রেম আরম্ভ হল। ঠিক যে সময় দিদার খাঁর প্রেমের ব্যাপার ঘটে, সেই সময় রোশন-আরা বেগম অন্তঃপুরে দুজন ভদ্রলোককে (?) প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন বলে গুজব রটে। সম্রাট ঔরঙ্গজীব আদ্যোপান্ত কাহিনী শুনে ক্রুদ্ধ হন। তাহলেও ঔরঙ্গজীব তাঁর ভগিনীর সঙ্গে শুধু সন্দেহের বশে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি।

"The Hindus from the 16th century took so zealously to Persian education, that, before another century had elapsed, they had fully come up to the Muhammadans in point of literary acquirements."

সম্রাট সাজাহান যেভাবে তাঁর কন্যার প্রেমিককে ফুটন্ত গরম জলের টবে দগ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, ঔরঙ্গজীব তা করেননি। ঘটনাটি আমি এক বৃদ্ধার মুখ থেকে যা শুনেছিলাম তাই এখানে বর্ণনা করছি। বৃদ্ধার অন্তঃপুরে অবাধগতি ছিল। দুজন যুবকের সঙ্গে রৌশন-আরার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল এবং তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ বোধ হয় প্রেমালাপ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। রৌশন-আরা তাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখেছিলেন শোনা যায়। একদিন তিনি সেই যুবকের উপর ভার দিলেন, অন্তঃপুর থেকে তাঁর পরিচারিকাদের বাইরে পাঠিয়ে দিতে। রাত্রির অন্ধকারে যুবকটি যখন তাদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রহরীর চোখে পড়ার জন্যই হোক বা আতঙ্কেই হোক, পরিচারিকারা পালিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে গভীর রাতে যুবকটি একাকী দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। এমন সময় কোনো প্রহরী তাকে পাকড়াও করে আটকে রাখে এবং পরে সম্রাটের কাছে ধরে নিয়ে যায়। সম্রাট ঔরঙ্গজীব হঠাৎ উত্তেজিত না হয়ে তাকে প্রশ্ন করতে থাকেন। প্রশ্নের উত্তর থেকে তিনি শুধু এইটুকু জানতে পারেন যে রাত্রে প্রাচীর টপকে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল। যুবকটির অপরাধের কোনো সঠিক প্রমাণ তিনি পেলেন না তার উত্তর থেকে। সুতরাং কোনো কঠোর দণ্ড না দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন, যেভাবে যুবকটি এসেছিল ঠিক সেইভাবে প্রাচীর টপকে যেন চলে যায়। বাঁশের চেয়ে চিরকালই কঞ্চি দড়। সম্রাটের আদেশে ও বিচারে খোজাদের তুষ্টি হল না। যুবকটি যখন প্রাচীরের উপর উঠল তখন খোজারা তাকে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচের প্রাকারের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর তার কি হল-না-হল জানা যায়নি।

দ্বিতীয় প্রেমিকের বিচারও ঠিক এইভাবে করা হল। একদিন তাকেও গভীর রাতে বাগানের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরতে দেখা গেল। খোজারা তো তাকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে গেল বাদশাহের কাছে। সম্রাট তাকেও প্রশ্ন করে শুনলেন যে সে সামনের ফটক দিয়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। সম্রাট আদেশ দিলেন তাকে সোজা ফটক দিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে। নিশ্চয় অন্যেরা শুনে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। অপরাধীকে সোজা ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? ঔরঙ্গজীব খোজাদের কঠিন দণ্ড দেবেন স্থির করলেন। কারণ তাদের পাহারার গুণে যদি সোজা ফটক দিয়েও বাইরের লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে তাহলে বেশিদিন আর অন্তঃপুরের সম্মানরক্ষা রা সম্ভব নয়। শুধু সম্মানরক্ষা নয়, সম্রাটের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তারও

জন্যও খোজাদেব এই উদাসীন পাহারায় চলবে না। প্রেমিকের উত্তর শুনে সম্রাট তাকে না দণ্ড দিয়ে খোজাদের কঠোব দণ্ড দিলেন।

আরও পাঁচজন দূতের কথা

এই ঘটনার কযেক মাস পবে পাঁচজন বাষ্ট্রদূত দিল্লীতে এসে পৌছলেন, প্রায় একই সময়। প্রথম দূত এলেন মক্কাব শরীফেব কাছ থেকে। তিনি যা উপঢৌকন নিয়ে এলেন তাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কযেকটি আববী ঘোড়া। একটি খেজুব পাতাব ব্রাশও তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। এই ব্রাশ দিয়ে মক্কার বিখ্যাত কাবা-মসজিদেব প্রাঙ্গণ ঝাড়া হয় সেইজন্যই এই উপহাব। দ্বিতীয় দূত এলেন ইযেমেন থেকে, তৃতীয় দূত বসরা থেকে, দুজনেই আববী ঘোড়া উপহাব এনেছিলেন সম্রাটেব জন্য। আবও দুজন বাষ্ট্রদূত এসেছিলেন ইথিওপিযা থেকে। প্রথম তিনজন দূতকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি, কারণ তাঁবা এমন বেশে এসেছিলেন যে, তাঁদেব রাজ্যব দূত বলেই মনে হয় না। তাঁদের হাবভাব দেখে যে কেউ মনে কববেন যে উপঢৌকন দিয়ে কিছু টাকাপযসা আদায কবাব জন্যই যেন তাঁরা হিন্দুস্থানের সম্রাটেব কাছে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেক আববী ঘোড়া এনেছিলেন নিজেরা ব্যবহার করবেন বলে। তাব জন্য কোনো শুল্ক তাঁদেব দিতে হয়নি। সেইসব আববী ঘোড়া এবং আরও নানাবকমের জিনিস যা তাঁবা সঙ্গে এনেছিলেন, তাই বেচে হিন্দুস্থানের অনেক মূল্যবান জিনিস কিনে তাঁরা বিনা শুল্কে দেশে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁদেব ব্যবসা কবা, দৌত্যগিরি কবা নয়। সেইজন্যই তাঁরা বাষ্ট্রদূতের যোগ্য মর্যাদা পাননি সম্রাটের কাছ থেকে, পেতেও পারেন না।

ইথিওপিয়ার সম্রাটের দূত ঠিক এই ধরনের ছিলেন না। হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপাব সম্বন্ধে তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল এবং তিনি হিন্দুস্থানে তাঁর নিজেব বাজ্যেব সুনাম অর্জনের জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেইজন্যই তিনি দূত হিসেবে যাঁদেব পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধেয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। দুজনকে তিনি রাজপ্রতিনিধিরূপে মনোনয়ন কবেছিলেন এবং দুজনেই খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী। এঁকে আমি চিনতাম, কারণ মক্কায় এঁব সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল, কিছু হাবসী ক্রীতদাস বিক্রি করে সেই টাকায় হিন্দুস্থানের মূল্যবান জিনিস কিছু কেনার ব্যবস্থা করা। হাবসী ক্রীতদাসদের এইভাবে তখন

বাজারে পণ্যের মতন বিক্রি করা হত। আফ্রিকার মহান্ খ্রীস্টান সম্রাটের এই দাস-ব্যবসাই ছিল অন্যতম ব্যবসা!

ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় দূত হলেন একজন আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ব্যবসায়ী, আলেপ্পোতে জন্ম এবং হাবসীদের দেশে 'মুরাদ' বলে পরিচিত। এঁর সঙ্গেও আমার মক্কাতেই পরিচয় হয়েছিল। মক্কাতে আমরা দুজন একটি ঘরে কিছুদিন একসঙ্গে বাস করেছিলাম। মুরাদই আমাকে হাবসী দেশে যেতে নিষেধ করেছিলেন। প্রত্যেক বছর মুরাদের প্রধান কাজ হল, ইংরেজ ও ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুদের কাছে মনোরম উপহার নিয়ে যাওয়া এবং তার বিনিময়ে কিছু ভাল ভাল জিনিস প্রত্যুপহার আনা। ক্রীতদাস বিক্রি করার জন্যও তিনি প্রতি বৎসর মক্কাতে আসেন।*

দূতাবাসের খরচ-খরচার জন্য আফ্রিকার সম্রাট অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করলেন না। ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তিনি ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে বত্রিশজন ক্রীতদাস দিয়ে দিলেন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে, নগদ টাকাকড়ি বিশেষ দিলেন না। মক্কার বাজারে ক্রীতদাসদের বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। বিক্রির অর্থ যা পাওয়া যাবে তাতে দূতাবাসের খরচ স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যাবে। এক-আধজন নয় বত্রিশজন ক্রীতদাস তাও আবার বুড়ো হাবড়া নয়, নওজোয়ান তরুণ-তরুণী। মক্কায় তখন জোয়ান ক্রীতদাসদের বাজারদরও ভাল, প্রায় পাঁচ ছয় পাউণ্ড (ষাট সত্তর টাকা আন্দাজ) করে প্রত্যেকের দাম। এছাড়াও সম্রাট বাছা-বাছা আরও পাঁচিশজন ক্রীতদাস মোগল বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠালেন। সকলেই বয়সে তরুণ, খোজা করবার মত। খ্রীস্টান সম্রাটের উপযুক্ত উপঢৌকন বটে। কিন্তু আফ্রিকার এই খ্রীস্টানদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে যথেষ্ট। রাষ্ট্রদূতরা আরও অন্যান্য ভেট সঙ্গে নিলেন। পনরটি তেজী ঘোড়া, আরবী ঘোড়ার মতন, ছোট ছোট একজাতীয় খচ্চর, সুন্দর ডোরাকাটা, বাঘের চেয়ে সুন্দর, এমন কি জেব্রার চেয়েও। একজোড়া হাতির দাঁত—প্রত্যেকটি দাঁত এত বড় যে একজন জোয়ান লোক মাটি থেকে চেড়ে তুলতে পারবে না। তাছাড়া, একজোড়া ষাঁড়ের শিঙ, এত বড় যে দিল্লীতে পৌঁছানোর পর আমি তার মুখের হাঁ মেপে দেখেছিলাম, প্রায় একফুট হবে।

ইথিওপিয়ার রাজধানী থেকে এইসব দাসদাসী, ঘোড়া, খচ্চর, দাঁত, শিঙ

* দাস-ব্যবসা (Slave-trade) তখন কিরকম ব্যাপকভাবে চলত, এই কাহিনী থেকে তা অনেকটা অনুমান করা যায়।

ইত্যাদি নিয়ে রাষ্ট্রদূতরা রওয়ানা হলেন। লোকালয়হীন নির্জন প্রান্তরের উপর দিয়ে তাঁরা চলতে লাগলেন। এক-আধদিনের পথ নয়, প্রায় দুমাসের পথ। দুমাস এইভাবে পথ চলে তাঁরা একটা বন্দরে পৌঁছলেন, ব্যাবেলম্যাণ্ডেলের কাছে, মক্কার বিপরীত তীরে। ক্যারাভানের রাস্তা দিয়ে তাঁরা যাননি, তাহলে চল্লিশ দিনে পৌঁছান যেত। অন্য হাঁটাপথে গিয়েছিলেন, বিশেষ কারণে। বন্দরে পৌঁছে তাঁরা সমুদ্র পার হয়ে মক্কা যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কবে তরী ভিড়বে বন্দরে, আর কবে তাঁরা সাগরপারে মক্কায় পৌঁছবেন তার ঠিক নেই। বন্দরে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। খাদ্যদ্রব্যের নিদারুণ অভাবের জন্য অনাহারে কয়েকজন ক্রীতদাস মারা গেল মক্কা পর্যন্ত তাদের আর পৌঁছানো হল না।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তরীও ভিড়ল বন্দরে এবং তাঁরা মক্কায় পৌঁছলেন। মক্কায় পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে ক্রীতদাসের বাজার মন্দা, আমদানির প্রাচুর্যের জন্য। অল্প দামেই দাস দাসীদের বিক্রি করতে হল। উপায় নেই, টাকার দরকার। দাসদাসী বিক্রির নগদ মূল্য হাতে পেয়েই রাষ্ট্রদূতরা সমুদ্রপথে সুরাট যাত্রা করলেন এবং পঁচিশ দিন পরে হিন্দুস্থানের সুরাটে পৌঁছলেন। বাদশাহকে উপঢৌকন দেবার জন্য যে সব দাসদাসী ও ঘোড়া ছিল, তাঁর মধ্যে কিছু মরে গেল, ঠিক মতন না খেতে পেয়ে। খচ্চরগুলোও সব বাঁচল না, তবে তাদের সুন্দর চামড়া ছাড়িয়ে রাখা হল বাদশাহের জন্য। মৃত ক্রীতদাস বা ঘোড়ার চামড়া আর ছাড়ানো হল না। সমুদ্রের জলেই তাদের ফেলে দেওয়া হল।

সুরাটে যখন রাষ্ট্রদূতেরা পৌঁছলেন তখন বিদ্রোহী মারাঠা বীর শিবাজী লুঠতরাজ করে চারিদিকে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। ঘরবাড়ি আগুন জ্বালিয়ে তিনি পুড়িয়ে দিচ্ছেন। নবাগত দূতদের দূতাবাসও আগুনে পুড়ে গেল। বিশেষ কিছুই তাঁরা বাঁচাতে পারলেন না, কয়েকখানি চিঠিপত্র ছাড়া। ক্রীতদাসদের শিবাজী রেহাই দিলেন, কারণ তারা তখন অনাহারে ও রোগে ধুঁকছে। তাদের হাবসী পোশাক-পরিচ্ছদও তিনি লুঠ করেননি। খচ্চরের চামড়া বা ষাঁড়ের শিঙও নেননি। কারণ, তার মধ্যে কোনোটাই তেমন লোভনীয় মূল্যবান বস্তু নয়। রাষ্ট্রদূতেরা যখন রাজধানীতে পৌঁছলেন তখন তাঁদের দুঃখদুর্দশার কথা খুব ফলাও করে তাঁরা গল্প করলেন। তাঁদের ভাগ্য ভাল যে তাঁরা অনেক জিনিসপত্রসহ শিবাজীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রাজধানী পৌঁছেছেন। শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেন ১৬৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে।

রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে একজন ছিলেন আর্মেনিয়ান বণিক মুরাদ, আমার পুরনো বন্ধু। সুরাটের ডাচ কুঠির প্রধান কর্তা মঁসিয়ে আদ্রিকান মুরাদকে একখানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন, আমাকে দেবার জন্য। দিল্লী পৌঁছে সেই পত্রখানি নিয়ে মুরাদ আমার কাছে আসেন। পাঁচ ছয় বছর পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মুরাদের সঙ্গে দেখা হতে আমি খুশি হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। বললাম, আমার যতদূর সাধ্য তাঁদের সুযোগ-সুবিধা করে দেবার চেষ্টা করব। শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা হল। রাজদরবারের ওমরাহদের অনেকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও, বাদশাহের সামনে এই রাষ্ট্রদূতদের উপস্থিত করার ব্যাপারে আমি বেশ মুশকিলে পড়লাম। তাঁদের শোচনীয় দুরবস্থাই প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রায় রিক্ত হস্তে তাঁরা রাজধানীতে পৌঁছেছেন। উপঢৌকনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধু খচ্চরের চামড়া আর ষাঁড়ের শিঙ ছাড়া তাঁদের আর কিছু সম্বল ছিল না। তাই নিয়ে রাজদরবারে সম্রাটের সামনে কি করে তাঁরা হাজির হবেন, ভেবেই পেলাম না। তার উপর তাঁদের নিজের নিজের চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদও প্রায় পথের ভিখিরীর মতন হয়েছে। রাস্তাঘাটে তাঁরা বেদুইনদের মতন চলে ফিরে বেড়াতেন, পালকি চড়ার সামর্থ্য ছিল না। জীর্ণ গরুর গাড়িতে প্রায় তাঁদের দিল্লীর পথে দেখা যেত। পিছনে পায়ে হেঁটে চলত অবশিষ্ট সাত আটজন অর্ধ-নগ্ন ক্রীতদাস। সে এক বিচিত্র দৃশ্য হত রাজধানীর পথে, রাষ্ট্রদূতরা যখন রাস্তায় বেরুতেন। একটি ঘোড়া পর্যন্ত তাঁদের ছিল না। এক পাদরি সাহেবের একটি ঘোড়ায় তাঁরা চড়ে বেড়াতেন। আমার ঘোড়াটিও তাঁরা প্রায় চেয়ে নিয়ে যেতেন এবং সেটিকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলেন। কি করব, কিছুই বলবার উপায় নেই।

মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। ভেবেচিন্তে কিছুই ঠিক করতে পারলাম না, তাঁদের কি হিল্লে করা যায়! লোকজনের ধারণা তাঁরা ভিখিরী, কারও কোনো কৌতূহল নেই তাঁদের সম্বন্ধে, শ্রদ্ধা তো নেই-ই। এই অবস্থায় কি করে তাঁদের রাজদরবারে নিয়ে যাই! একদিন দানেশমন্দ খাঁর সঙ্গে নির্জনে ব্যাপারটা আলাপ করলাম। তাঁদের কথা ছেড়ে দিয়ে, ইথিওপিয়ার সম্রাটের ধনসম্পদ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই বললাম, তাতেও যদি আগ্রহ হয়। অবশেষে আমার পন্থাই ঠিক প্রমাণ হল। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁদের দর্শন দিতে সম্মত হলেন। রাজদরবারে উপস্থিত হলে তাঁদের শিরোপা,

কোমরবন্ধ ও পাগড়ি উপহার দেওয়া হল। প্রত্যেকটির কারুকার্য অত্যন্ত চমৎকার। সম্রাট তাঁদের অতিথির মতন দেখাশুনা করার আদেশ দিলেন এবং নগদ ছয় হাজার টাকাও দিলেন। টাকাটি কিন্তু দুজন রাষ্ট্রদূতে সমানভাবে ভাগ করে নিলেন না। মুসলমান যিনি তিনি নিলেন চার হাজার টাকা, আর আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান ভদ্রলোক নিলেন দুহাজার টাকা।

ইথিওপিয়ার সম্রাটের জন্যও বাদশাহ উপহার দিলেন রাষ্ট্রদূতের কাছে, মূল্যবান শিরোপা, দুটি বড় বড় রূপার শিঙা, দুটি কাড়ানাকাড়া এবং ত্রিশ হাজার সোনা ও রূপার মুদ্রা। মুদ্রাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপহার বলে ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছে গণ্য হবে, তার কারণ নিজের কোনো টাকশাল বা মুদ্রা তখনও ছিল না। কিন্তু মুদ্রাগুলি শেষ পর্যন্ত ইথিওপিয়ায় পৌঁছবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হল বাদশাহের মনে। হয়ত তাঁরা হিন্দুস্থানের পণ্যদ্রব্য কিনে সমস্ত মুদ্রা খরচ করে ফেলবেন। সম্রাটের সন্দেহই সত্য হল। সেই নগদ মুদ্রা নিয়ে রাষ্ট্রদূতেরা নানারকম জিনিসপত্র কিনে ফেললেন। মশলাপাতি, ভাল ভাল কাপড়চোপড়, রাজারাণী ও তাঁদের একমাত্র বৈধ সন্তানের (ভবিষ্যতের রাজা) কোট-পাতলুনের জন্য দামী রেশমী রঙিন কাপড়, কোর্তা বানাবার মতন বিলিতী লাল সবুজ কাপড় এবং হারেমের বাঁদী ও তাদের ছেলেপিলের জন্য আর সব নানারকমের কাপড় তাঁরা কিনলেন। সমস্ত পণ্যদ্রব্যই তাঁরা অন্যান্য রাষ্ট্র-দূতদের মতন বিনা মাশুলেই নিজেদের দেশে রপ্তানি করবার অনুমতি পেলেন।

মুরাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকা সত্বেও, তার জন্য এত পরিশ্রম করা আমি পণ্ডশ্রম মনে করলাম এবং অনুতপ্ত হলাম। তার প্রথম কারণ হল, মুরাদ কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর ছেলেটিকে আমার কাছে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করবেন। কিন্তু পরে তিনি কথা রাখেননি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি পঞ্চাশ টাকার বদলে ছেলেটির জন্য তিনশ টাকা চাইলেন। একবার আমার মনে হল যে তিনশ টাকাতেই ছেলেটিকে কিনে নেব এবং অন্যদের দেখাব যে পিতা তার নিজের সন্তানকে এই দামে বিক্রি করেছে। ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, রঙ কুচকুচে কালো, নাক চওড়া, ঠোঁট পুরু—অর্থাৎ যেমন ইথিওপিয়ানদের চেহারা হয় ঠিক তেমনি। মুরাদ আমার পরিচিত বন্ধু হয়েও কথার খেলাফ করাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলাম।

এছাড়া আমি শুনলাম যে আমার আর্মেনিয়ান বন্ধুটি এবং তাঁর মুসলমান সঙ্গীটি সম্রাট ঔরংজীবকে কথা দিয়েছেন যে তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে তাঁদের সম্রাটকে অনুরোধ করবেন, ইথিওপিয়ার পুরাতন মসজিদটি সংস্কার করার জন্য।

পর্তুগীজরা মসজিদটিকে ভেঙে দিয়েছিল এবং তার পর থেকে আর সংস্কার করা হয়নি। সম্রাট ঔরঙ্গজীব মসজিদটি সংস্কার করার জন্য ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতদের দুহাজার টাকা দিয়েছিলেন। মসজিদটি একজন মুসলমান দরবেশের স্মৃতিরক্ষার্থে তৈরি হয়েছিল। তিনি ইথিওপিয়ায় ইসলামধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। সুতরাং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে মসজিদটির গুরুত্ব খুব বেশি। সম্রাট ঔরঙ্গজীব এইজন্যই তার পুনর্গঠনের জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

তৃতীয় ঘটনা হল: মুরাদ সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে কোরআন শরীফ' ও অন্যান্য মুসলমান ধর্মগ্রন্থ পাঠাবেন বলেছিলেন।

একজন খ্রীস্টান রাষ্ট্রদূত, খ্রীস্টান সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে অন্য দেশে এসে যে এই রকমের জঘন্য কাজকর্ম করতে পারেন, তা বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। এই ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, খ্রীস্টধর্মের কি চরম অবনতি হয়েছিল ইথিওপিয়ায়। আমি অবশ্য তা জানতাম এবং মক্কায় থাকার সময় এ সম্বন্ধে অনেক খবর পেয়েছিলাম। ইথিওপিয়ায় ইসলামধর্মেরই প্রাধান্য ছিল এবং রাজা প্রজা সকলেই তার পক্ষপাতী ছিল। খ্রীস্টানদের সংখ্যা বরাবরই খুব নগণ্য ছিল এবং যারা খ্রীস্টান বলে পরিচয় দিত তারা আসলে অন্তরে ছিল ইসলামধর্মী। পর্তুগীজরা গায়ের জোরে খ্রীস্টধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে সার্থক হতে পারেনি। ইথিওপিয়া থেকে পর্তুগীজ বিতাড়ন ও পাদরিদের পলায়ন থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

দিল্লী থাকার সময় দানেশমন্দ খাঁ প্রায়ই রাষ্ট্রদূতদের তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন, নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য। তাঁদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাছাড়া, নীল নদের উৎস সম্বন্ধে জানার কৌতূহলই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি। মুরাদ এবং তাঁর একজন মোগল সঙ্গী নীল নদের উৎস পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। রাষ্ট্রদূত দুজন এমন অতিরঞ্জিত করে তাঁদের সম্রাট ও সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে বড় বড় কথা বললেন যে খাঁ সাহেবের তা বিশ্বাস হল না। কিন্তু তাঁদের মোগল সঙ্গীটি আসল সত্যটি ফাঁস করে দিলেন। রাষ্ট্রদূতরা বিদায় নেবার পর তিনি খাঁ সাহেবকে বললেন যে রাষ্ট্রদূতদের কথা অধিকাংশই মিথ্যা। তিনি নিজের চোখে যা দেখেছেন তাতে মনে হয়, ইথিওপিয়ার শাসন-ব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী দুই-ই

অত্যন্ত নিম্নস্তরের। মোগল সঙ্গীটি ইথিওপিয়ার ভিতরের খবর যা বললেন তা বিশেষ মূল্যবান। আমি আমার 'জর্নালে' তা লিখে রেখেছি। আপাতত মুরাদ নিজ মুখে যা বলেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।

হাব্সীদেশের কথা

মুরাদ বলেন: ইথিওপিয়ায় এমন কোনো লোক নেই যার একাধিক স্ত্রী নেই। বহু বিবাহপ্রথার প্রাধান্য তাঁদের সমাজে এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মুরাদের নিজের দুজন স্ত্রী আছে। এই দুজন তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও অতিরিক্ত। তাঁর বিবাহিত স্ত্রী আলেপ্পোতে থাকেন। ইথিওপিয়ার নারীরা হিন্দুস্থানের নারীর মতন পর্দানশীন নয়। সকলের সামনেই তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা, বিবাহিতই হোক আর কুমারীই হোক, ক্রীতদাসই হোক আর স্বাধীন নাগরিকই হোক—পুরুষদের সঙ্গে যত্রতত্র অবাধে মেলামেশা করে। কোনো ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা হিংসা বলে কিছু নেই তাদের মধ্যে। একজনের বিবাহিত স্ত্রী বা বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা অন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে, কোনো বাধা নেই, খুনোখুনি নেই। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারটা ইথিওপিয়ার সমাজে জলবৎ-তরলম্। স্ত্রীলোক হলেই জলস্রোতের মতন নীচু দিকে গড়িয়ে যাবে—এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। পুরুষরাও স্বেচ্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক। কোনো অভিজাত পরিবারের বিবাহিত স্ত্রী কোনো বীরপুরুষের প্রেমে পড়ে স্বচ্ছন্দে তাঁর সঙ্গে লীলাখেলা করতে পারেন, তাতে পৌরুষ বা আভিজাত্য কোনোটাতেই বাধে না। এই হল ইথিওপিয়ার সমাজ।

আমি যদি ইথিওপিয়ায় যেতাম তাহলে নাকি বিবাহ করতে বাধ্য হতাম। কয়েক বছর আগে নাকি একজন পাদ্‌রি সাহেবকে এইভাবে জোর করে একটি ইথিওপিয়ান মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়, তাকে তিনি পুত্রবধূ করবেন স্থির করেছিলেন।

এইবার ইথিওপিয়ার বিবাহ ও সন্তানাদি সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী বলছি শুনুন। একবার কোনো এক অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ সম্রাটের কাছে তার চব্বিশজন জোয়ান ছেলে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য বোধ হয়, ছেলেদের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা। সম্রাট ছেলেদের দেখে জিজ্ঞাসা করেন, বৃদ্ধের

এই ক'জন পুত্র ছাড়া আর কোনো সন্তান আছে কি না। বৃদ্ধ বলে যে পুত্রসন্তান তার আর নেই, মাত্র এই ছয় গণ্ডা বা চব্বিশটিই আছে, এছাড়া আরও কয়েকটি কন্যাসন্তান আছে। সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: 'দূর হয়ে যাও, আমার সামনে থেকে—বৃদ্ধ গোবৎস কোথাকার! মাত্র চব্বিশটি সন্তানের পিতা হয়ে তুমি আমার সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করেছ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! দূর হও, বেরিয়ে যাও, আমার সামনে থেকে। আমার রাজত্বে কি স্ত্রীলোকের অভাব হয়েছে বলতে চাও, উল্লুক কোথাকার! তোমার মতন একজন আশী বছরের বৃদ্ধ মাত্র দুই ডজন সন্তানের পিতৃত্বের বড়াই করছ কোন্ সাহসে?' ব্যাপারটা একবার কল্পনা করুন। অর্থাৎ আশী বছরের বৃদ্ধের অন্তত গোটা ষাটেক সন্তান থাকলে হয়ত সম্রাট খুশি হতেন, কিংবা তারও বেশি। সম্রাটের ক্রুদ্ধ হবারই কথা। কারণ তাঁর নিজের প্রায় আশীটি ছেলেমেয়ে। হারেমে ও বেগমমহলে তাদের ভেড়ার পালের মতন ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখা যায়। কে কার গর্ভজাত তা বলবার উপায় নেই, তবে সকলেই সম্রাটের ঔরসজাত। তবু রাজবাড়ির মধ্যে অন্যান্য দাসদাসী ও বাঁদিদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যাতে একাকার হয়ে তারা মিশে না যায় এবং দেখলে অন্তত রাজকুমার বা রাজকুমারী বলে চেনা যায়, তার জন্য সম্রাট নিজে একটি করে রাজদণ্ডের মতন কাষ্ঠদণ্ড প্রত্যেককে তৈরি করে দিয়েছেন হাতে নিয়ে বেড়াবার জন্যে। সেই দণ্ড হাতে করে রাজার ছেলেমেয়েদের অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়াতে হয় সব সময়, তা না হলে গণ্ডগোল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এইরকম যাঁর পিতৃত্বের বহর এবং যিনি সর্বশক্তিমান সম্রাট, তিনি গরীব বৃদ্ধের মাত্র দুই তিন ডজন সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় পেয়ে যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

সম্রাট ঔরঙ্গজীব বার দুই রাজদূতদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খাঁ সাহেবের মতন তিনিও ভেবেছিলেন যে তাঁদের কাছ থেকে ইথিওপিয়া সম্বন্ধে তিনি কিছু জ্ঞান অর্জন করবেন। তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল, ইথিওপিয়ায় ইসলামধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করার। সম্রাট খচ্চরের চামড়াগুলো দেখার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই চামড়াগুলো আমাকে উপহার দেবার কথা ছিল। কিন্তু সে কথা তাঁরা রাখেননি। যাই হোক, আমিই বললাম, সম্রাটকে খচ্চরের চামড়া ও ষাঁড়ের শিঙ, দুই-ই দেখাতে।

সুলতান আকবরের শিক্ষাব্যবস্থা

দিল্লীতে যখন ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতরা অবস্থান করছিলেন তখনই সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের শিক্ষাদীক্ষার জন্য মৌলবী পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। সুলতান আকবরের শিক্ষার জন্য সম্রাট বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ তাকেই তিনি হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট করবেন বলে স্থির করেছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার অভাবেই রাজকুমাররা যখন রাজা হন তখন রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজা হতে হলে রাজার মতন শিক্ষা পাওয়া দরকার। যিনি একটা বিরাট দেশের সর্বময় অধীশ্বর হবেন, একটা বিশাল রাজ্য পরিচালনা করবেন তাকে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে ঠিক তেমনি বিরাট ও মহান্ হতে হবে ব্যক্তি হিসাবে। তবেই তিনি রাজা হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি, তাঁর ন্যায়-অন্যায় বোধশক্তি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ঠিক সম্রাটের মতন সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে রাজদণ্ড ধারণ করার এবং রাজসিংহাসনে বসার কোনো অধিকার তার নেই। সম্রাট ঔরঙ্গজীব প্রায় বলতেন যে এশিয়ার সাম্রাজ্যের এত দুর্গতি ও অবনতির অন্যতম কারণ হল, এখানকার রাজকুমারদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। বাল্যকাল থেকে তাদের পরিচারিকা ও খোজাদের হেফাজতে রাখা হয়। রাশিয়া, জর্জিয়া, আফ্রিকা, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের এই সব ক্রীতদাস-দাসীদের কুসংসর্গ থেকে এশিয়ার রাজপুত্ররা আশৈশব মানুষ হয়। তার ফলে তাদের কোনো সুশিক্ষা হয় না, কোনো শিষ্টতা, ভদ্রতা বা সদাচার তারা শেখে না। জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয়দের প্রতি উদ্ধত আচরণ করতে এবং আশ্রিতদের প্রতি অত্যাচার ও পীড়ন করতে শেখে। এই শিক্ষা পেয়ে এইরকম দুর্বিনীত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যখন তারা বড় হয়, রাজসিংহাসনে সম্রাট হয়ে গদীয়ান হয়ে বসে, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করা ছাড়া আর কি তারা করতে পারে? রাজকর্তব্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাদের থাকে না। কি করে থাকবে? বাঁদিরা বা খোজারা কি সেই শিক্ষা দিতে পারে? রাজদরবারে যখন তারা হাজির হয়, তখন তাদের দেখলে মনে হয় যেন তারা এক ভিন্ন জগতের জীব, বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। হবেই তো! অন্তঃপুরের বাঁদি, দাস-দাসী আর খোজাদের সান্নিধ্য ছেড়ে হঠাৎ রাজদরবারে আমলা-অমাত্য,

আমীর-ওমরাহদের মধ্যে এসে সিংহাসনে উপবেশন করলে, এছাড়া আর কি মনে হবে? অন্ধকার এক নরক থেকে যেন হঠাৎ এক আলোর রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় রাজকুমাররা। চারিদিক দেখেশুনে ঠিক শিশুর মতন ব্যবহার করতে থাকে। ঠিক শিশুর মতন যা শোনে তাই বিশ্বাস করে, যা দেখে তাতেই ভয় পায়। বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনাশক্তি কিছুই সম্বল থাকে না, থাকে শুধু উদ্ধত গোঁ আর রাজকীয় দম্ভ। সুতরাং সংবুদ্ধি ও সুপরামর্শ তাদের কর্ণগোচর হয় না এবং একবার স্থূল মস্তিষ্কে যা বিঁধে যায় তাই নিয়ে চরম দৌরাত্ম্য করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। প্রথম প্রথম, সিংহাসনে বসে যেদিনই যখন মনে হয় যে সে একজন সম্রাট, তখন একটা গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। দেখলে মনে হয় যেন কত গম্ভীর, কত দূরদর্শী, কত চিন্তাশীল, সত্যই সম্রাট হবার উপযুক্ত। কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোশটা বুদ্ধিমানদের চোখে খসে যায়, ভিতরের আসল স্থূলবুদ্ধি রূপটা বেরিয়ে পড়ে। এই হল এশিয়ার সম্রাট। যাঁরা এশিয়ার রাজা বাদশাহদের ইতিহাস জানেন, তাদের স্বচক্ষে যারা দেখেছেন, তাঁরা এই কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য তা নিঃসংশয়ে স্বীকার করবেন। এশিয়ার সম্রাটদের পশুর চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখা গেছে। কোনো বিচার নেই, বিবেচনা নেই, নিছক নিষ্ঠুর ব্যবহারে তারা পাশবিক উত্তেজনা ও আনন্দ বোধ করেছেন। মদ্যপানে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ও বিলাসিতায় তাঁরা ভেসে গেছেন। স্ত্রী-সংসর্গে তাঁরা নিজেদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সমাজচেতনা সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শিকারের আনন্দে প্রাত্যহিক রাজকার্যে অবহেলা করেছেন। শিকারের সময় শিকারী কুকুরের পালের দিকে তাঁদের যতটা নজর থাকে, তার শতাংশের একাংশও থাকে না তাঁর শিকারে সহযাত্রী গরীব প্রজাদের দিকে। তারা হয়ত অনাহারে, অনাশ্রয়ে, প্রচণ্ড শীতে ও দুর্যোগে পথের মধ্যেই মরে যায়। রাজার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তাঁর ঘোড়া, হাতি আর কুকুরের পাল নিয়েই শিকারে মত্ত থাকেন। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট এশিয়ার মাটিতে খুব কমই জন্মেছেন। নিজেরা বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত বলে, সাধারণত রাজ্যশাসনের ভার তাঁরা উজীরদের উপর বা খোজাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। তারা কেবল চক্রান্ত আর বেইমানি করেছে, এ ওর গলা কেটেছে, খুন করেছে। এই অবস্থায় রাজার রাজ্যের শৃঙ্খলা বা শান্তি কি করে বজায় থাকে?

সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর পুত্রের শিক্ষাপ্রসঙ্গে এই ধরনের মতামত প্রায় ব্যক্ত

করতেন এবং তার শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর তৃতীয় পুত্র ভবিষ্যতে রাজা হবে বলে তার শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সজাগ ছিলেন।*

পারস্যের দূত

অবশেষে সংবাদ এল, পারস্যের রাষ্ট্রদূত হিন্দুস্থানের সীমান্তে পৌঁছেছেন। মোগল দরবারের পারসী ওমরাহরা সংবাদ শোনা মাত্রই রটিয়ে দিলেন যে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারের জন্য পারস্যের রাষ্ট্রদূত হিন্দুস্থানে এসেছেন। বুদ্ধিমান লোকেরা অবশ্য তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। কারণ, পারসীদের এমন একটা স্বভাব আছে যে নিজেদের জাতের কোনো ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করতে তারা অভ্যস্ত। প্রচার করা হল যে পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে রাজদরবারে নিয়ে আসার আগে যেন তাঁকে ভারতীয় রীতিতে সেলাম করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা না হলে হঠাৎ তাঁকে সেলাম করানো যাবে না। পারসীরা এমনিতে খুব উদ্ধতস্বভাব, তার উপর তিনি রাজপ্রতিনিধি। সুতরাং হঠাৎ ঘাড় হেঁট করে সেলাম করতে হয়ত তিনি রাজী নাও হতে পারেন। কিন্তু এসব কথা গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। ঔরঙ্গজীবের এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত ছিল না।

পারস্যের রাষ্ট্রদূত যখন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে মহা-সমারোহে অভ্যর্থনা করা হল। বাজারের ভিতর দিয়ে তাঁর যাবার পথ সুসজ্জিত করা হল এবং কয়েক মাইল জুড়ে পথের দুই পাশে অশ্বারোহী সৈন্যরা সারবন্দী

*ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে সাধারণত সম্রাট ঔরঙ্গজীবের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে বার্নিয়ের অঙ্কিত এই চরিত্র চিত্রের কোনো মিল হয় না। শুধু তাই নয়। বাইরের রাজকার্যের মধ্যে অনেক সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের প্রকাশ হয়েছে যেভাবে তার সঙ্গেও তাঁর চরিত্রের এই মহত্ত্বের যেন কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়। রাষ্ট্রীয় পরিবেশের চাপে অনেক সময় অনেক সম্রাটকে এমন অনেক কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, যা দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ঠিক যাচাই করা যায় না, বা বোঝা যায় না। মধ্যযুগের সম্রাটদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সম্রাটদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে ঔরঙ্গজীব যেভাবে সমালোচনা করেছেন, নিজে সম্রাট হয়েও, তার সত্যই তুলনা হয় না। সম্রাটের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর কঠোর মন্তব্যও সাধারণত দুর্লভ। বেশ বোঝা যায়, বাইরের সম্রাট ঔরঙ্গজীব ও ভিতরের মানুষ ঔরঙ্গজীবের মধ্যে বরাবরই একটা পার্থক্য ছিল, যা তাঁর অন্তরঙ্গ দু'চারজন ছাড়া আর কারও চোখে ধরা পড়েনি।—অনুবাদক

হয়ে দাঁড়ান। ওমরাহরা অনেকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিলেন। দুর্গদ্বারে রাষ্ট্রদূত যখন পৌঁছলেন তখন তোপধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হল। ঔরঙ্গজীব তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। পারসী কায়দাতে সেলাম জানানো সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত হলেন না এবং সোজাসুজি রাষ্ট্রদূতের হাত থেকেই তাঁর পরিচয়পত্রখানি তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলেন। একজন খোজা তাঁর চিঠিখানা খুলে দিলে তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে পড়তে লাগলেন। রাজ-প্রতিনিধিকে যথারীতি কাবা, পাগড়ি, সোনারুপোর জরির-কাজ-করা শিরোপা ইত্যাদি উপঢৌকন দিতে আদেশ দেওয়া হল। তারপর যথাসময়ে পারস্যের দূতকে জানানো হল যে এইবার তিনি তাঁর উপহারাদি দেখাতে পারেন।

পারস্যের রাষ্ট্রদূত যে উপহার দিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাঁচশটি সুন্দর ঘোড়া, বিশটি উট—দেখতে ঠিক ছোট হাতির মতন, চমৎকার গোলাপ-জল, পাঁচ ছ'খানি গালচে ইত্যাদি। ঔরঙ্গজীব উপহার দেখে খুব খুশি হলেন। প্রত্যেকটি জিনিস তিনি নিজে যত্ন করে দেখলেন এবং পারস্যের রাজার উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। রাজদূতকে তিনি ওমরাহদের মধ্যে বসতে বললেন এবং তাঁর পথের ক্লান্তির কথা বারবার উল্লেখ করে, প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বিদায় দিলেন। রাজদূত প্রায় চার পাঁচ মাস দিল্লীতে রইলেন ঔরঙ্গজীবের খরচে এবং ওমরাহদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বেড়াতে লাগলেন। যখন তাঁকে স্বদেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল, তখন বাদশাহ আবার তাঁকে ডেকে নানারকমের উপহার দিলেন।

পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে ঔরঙ্গজীব যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও পারসী ওমরাহরা প্রচার করলেন যে পারস্যের সম্রাট দূত মারফত যে পত্র পাঠিয়েছেন তাতে তিনি ভারতসম্রাটকে নিন্দা করেছেন ভ্রাতৃহত্যার জন্য এবং বৃদ্ধপিতা সাজাহানকে বন্দী করার জন্য। পারস্যের সম্রাট নাকি তাঁর 'আলমগীর' বা 'বিশ্ববিজয়ী' নামের জন্যও উপহাস করেছেন। ওমরাহরা চিঠির জবান পর্যন্ত মুখে মুখে রটনা করে দিলেন। তাতে নাকি লেখা ছিল : 'আপনি যখন আলমগীর, তখন আল্লার নামে আপনাকে এই তলোয়ার ও ঘোড়াগুলি পাঠালাম। সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন'। কিন্তু এসব কথা এত অতিরঞ্জিত যে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কথায় রঙ চড়ানোর বদ্-অভ্যাস পারসীদের আছে, আগে বলেছি। খোশমেজাজী গালগল্প করতে তারা ওস্তাদ। এ-সম্বন্ধে, অর্থাৎ পারস্যের সম্রাটের পত্রাদি সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি তা বলছি। তিনি উদ্ধত কোনো ভাষা

চিঠির মধ্যে প্রকাশ করেননি। ওটা পারসী ওমরাহদের অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। আমার নিজের ধারণা, হিন্দুস্থানের মতন বিরাট দেশের বিরুদ্ধে পারস্যের সম্রাট অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ করতে চাইবেন না। তিনি তাঁর নিজের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। শাহ আব্বাসের[১৫] মতন সম্রাটও পারস্যে সহজলভ্য নয়। তাঁর মতন দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি খুব কম সম্রাটের আছে। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত করাই যদি পারস্যের রাজার উদ্দেশ্য হবে, সম্রাট সাজাহান বা ইসলামধর্মের প্রতি যদি তার এত দরদ থাকবে, তাহলে বাস্তবিকই যখন দীর্ঘকালব্যাপী হিন্দুস্থানের মধ্যে ঘরোয়া চক্রান্ত ও গৃহযুদ্ধ চলছিল, তখন তিনি উদাসীন নিরপেক্ষ দর্শকের মতন দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন কেন? হিন্দুস্থান জয় করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হবে, তাহলে তখন তো স্বচ্ছন্দেই তিনি তা করতে পারতেন। সাজাহান, দারা, সুলতান সুজা কারও কাকুতি মিনতিতে তিনি কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি, এমনকি কাবুলের শাসনকর্তার কথাতেও না। তা যদি করতেন তাহলে সামান্য সেনাবাহিনী নিয়ে, অল্প খরচে তিনি অতি সহজে, বিনা বাধায় হিন্দুস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূখণ্ডের অধীশ্বর হতে পারতেন, অন্তত কাবুল থেকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের তো নিশ্চয়ই। তখন তাঁর আদেশেই হিন্দুস্থানের রাজা উঠতেন-বসতেন এবং আত্মকলহ বা দ্বন্দ্ব, সবই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন।

পারস্য সম্রাটের পত্রের মধ্যে হয়তো কোনো আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিল, অথবা রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তায় ঔরঙ্গজীব হয়ত খুশি হননি। কারণ পারস্যের রাষ্ট্রদূত দিল্লী ছেড়ে যাবার দু-তিনদিন পর তিনি অভিযোগ করলেন যে পারস্যের সম্রাটকে তিনি যে ঘোড়াগুলি উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলি রাষ্ট্রদূতের

১৫। শাহ আব্বাস ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সম্রাট হন। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৬২৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনিই ইস্পাহানে পারস্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং পারস্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর সংগঠনশক্তি কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁর নাম 'সাহ আব্বাস' থেকেই নাকি ভারতবর্ষে 'সাবাস্' কথাটি লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। কোনো প্রশংসনীয় কাজ কেউ করলে আমরা তাকে 'সাবাস্' বলে অভিনন্দন জানিয়ে থাকি। ওভিংটন্ (Ovington) তাঁর 'Voyage to Suratt in the year 1689'—নামক গ্রন্থে (London, 1696) লিখেছেন: 'পারস্যের সম্রাট সাহ আব্বাসের নাম তাঁর মহৎ কীর্তি ও খ্যাতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে আজও কোনো উল্লেখযোগ্য কীর্তিকে আমরা ঐ নামে সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকি। ভারতীয়দের প্রশংসাসূচক কথাই হল 'সাবাস'।'

আদেশে নাকি রজ্জুবদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছে। ঔরঙ্গজীব তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যে-কোনো উপায়ে ভারত-সীমান্তে রাষ্ট্রদূতকে বন্দী করতে এবং তাঁর কাছ থেকে সমস্ত ভারতীয় ক্রীতদাস কেড়ে নিয়ে আসতে। (ভারতে ক্রীতদাসের বাজার খুব সস্তা দেখে পারসী দূত একদল ক্রীতদাস কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের জন্য তখন বাজারে প্রচুর ক্রীতদাস পাওয়া যেত, এবং দামও তাই সস্তা হয়েছিল। শুধু পারসী রাষ্ট্রদূত যে ক্রীতদাস নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর অনুচরবর্গও নাকি অনেক শিশুসন্তান কিনে নিয়ে পালাচ্ছিলেন।)

পারস্যের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্রাট ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচরণ করেছিলেন। সম্রাট সাহ আব্বাসের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে সাজাহান যে-রকম উদ্ধত আচরণ করেছিলেন, ঔরঙ্গজীব সে-রকম কিছু করেননি। সম্রাট সাজাহানের উদ্ধত আচরণ সম্পর্কে পারসীরা প্রায় নানারকমের গল্প বলে থাকেন। তার মধ্যে দু একটি গল্প আমি এখানে বলছি :

সম্রাট সাজাহান যখন দেখলেন যে কিছুতেই পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে ভারতীয় কায়দায় সেলাম করতে বাধ্য করানো যায় না, এবং আত্মমর্যাদ বোধ তার এত উগ্র যে তাঁকে মাথা নোয়ানো পর্যন্ত মুশকিল, তখন তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি হুকুম দিলেন যে আমখাসের দিকে দরবারের যে প্রবেশপথ আছে সেটা বন্ধ করে দিতে। শুধু সামান্য একটু ফাঁক থাকবে এক জায়গায় এবং সেই ফাঁকটুকু এমন নিচু হবে যে তার ভিতর দিয়ে ঢুকতে গেলেই রাষ্ট্রদূতকে বাধ্য হয়ে মাথা হেঁট করতে হবে সেলাম করার ভঙ্গীতে। সম্রাট সাজাহান সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এবং তাতে গর্বোদ্ধত পারসী রাষ্ট্রদূতের ভারতীয় পদ্ধতিতে সেলাম না করার অহঙ্কারও চূর্ণ হবে। সাজাহান ভেবেছিলেন যে তিনি তখন রাষ্ট্রদূতকে বরং বলবেন যে, অতটা মাথাটা হেঁট করে সেলাম করাটাও ভারতীয় রীতি নয়। কিন্তু গর্বিত ও বুদ্ধিমান পারসী দূত আগে থেকে সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রবেশপথের কাছে এসে, সম্রাটের দিকে পিছন ফিরে নিচু হয়ে প্রবেশ করলেন। সাজাহান পারসী শঠতার কাছে হার মেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন : 'হা আল্লা! আপনি কি মনে করলেন যে এখানে আপনার মতন গর্দভের আস্তাবল আছে যে ঐভাবে ঢুকলেন?' পারস্যের দূত উত্তর দিলেন : 'অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আমি গর্দভই বটে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি পারস্যের রাজদরবারে আরও অনেক

আছেন, কিন্তু যিনি যেমন সম্রাট তাঁর কাছে তেমনি দূত পাঠানো উচিত বলে আমাকেই তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

আর একবার আহারের নিমন্ত্রণ করে একত্রে খানা খেতে বসে সম্রাট সাজাহান পারস্যের দূতকে অপমান করেছিলেন। পারস্যের দূত খুব বেশি হাড় চিবুচ্ছেন দেখে সাজাহান বললেন: কুকুরগুলোর জন্য কিছু রাখুন?' পারস্যের দূত তার উত্তরে খিচুড়ী বা পোলাওয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন: 'ঐ তো রেখেছি।' সাজাহান পোলাও খেতে খুব ভালবাসতেন এবং তখন খাচ্ছিলেনও। সুতরাং রাজদূতের উত্তরে তিনি খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন।

সম্রাট সাজাহান তখন নতুন রাজধানী দিল্লী তৈরি করছেন। তিনি পারস্যের দূতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'ইস্পাহান ভাল, না দিল্লী ভাল?' উত্তরে পারস্যের দূত 'বিল্লা বিল্লা' (বি-ইল্লাহ্) বলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'ইস্পাহানকে দিল্লীর ধুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।' সাজাহান উত্তর শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন, ভেবেছিলেন রাজদূত বোধ হয় তার রাজধানীর প্রশংসাই করলেন। দিল্লীর ধুলোর সঙ্গেও ইস্পাহানের তুলনা হয় না, সাজাহান এই অর্থ বুঝেছিলেন। কিন্তু অর্থ তা নয়। অর্থ হল, দিল্লীতে এত ধুলো যে তার সঙ্গে ইস্পাহান নগরীর তুলনা করতে যাওয়াই বাতুলতা।

সাজাহান নাকি আর একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে হিন্দুস্থান বড়ো, না পারস্য বড়ো? উত্তরে পারস্যের দূত বলেছিলেন—হিন্দুস্থান পূর্ণচন্দ্রের মতন, আর পারস্য হল দ্বিতীয়ার চাঁদ। কথাটা শুনে প্রথমে সম্রাট সাজাহান খুব প্রীত হয়েছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের মতন হিন্দুস্থান বলতে তিনি তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র মনে করেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর কাছে অর্থ পরিষ্কার হয়। পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ হল, রাষ্ট্র হিসাবে হিন্দুস্থানের শ্রীবৃদ্ধির দিন শেষ হয়েছে, এবারে কৃষ্ণপক্ষে তার ক্রমিক ক্ষয় শুরু হবে। কিন্তু পারস্য হল দ্বিতীয়ার চাঁদ—অর্থাৎ তার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। পারস্যের দূত যা বলতে চেয়েছিলেন তা সহজ কথায় হল: হিন্দুস্থান বৃদ্ধ, পারস্য নওজোয়ান।

পারসীদের চতুরতার এই হল কয়েকটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু চতুর হলেই যে বুদ্ধিমান হতে হবে তার কোনো মানে নেই। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। যিনি রাজ-প্রতিনিধি হবেন, আমার মতে, তাঁর একটা নিজস্ব চারিত্রিক গাম্ভীর্য থাকা উচিত। হালকা রঙ্গতামাসা বা হেঁয়ালির অবতারণা করা তাঁর

শোভা পায় না। পারস্যের দূত সাজাহানের মতন খেয়ালী সম্রাটকে ঐভাবে পদে পদে চালাকি বুদ্ধির জোরে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ করে খুব বুদ্ধির পরিচয় দেননি। সাজাহান শেষ পর্যন্ত এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে পারস্যের দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তিনি অত্যন্ত কটুবাক্যে তাঁকে সম্বোধন করতেন। শুধু তাই নয়। তিনি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে পারস্যের দূতকে সরু কোনো অলিগলির মধ্যে পথচলার সময় পাগলা হাতি লেলিয়ে দিয়ে বধ করতে বলেছিলেন। একদিন হাতি লেলিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। পালকি চড়ে পারস্যের দূত রাজধানীর এক সরু গলির ভিতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় পাগলা হাতি তাঁকে লক্ষ্য করে ছেড়ে দেওয়া হল। অন্য কোনো স্বল্প তৎপর বা সাহসী ব্যক্তি হলে নিশ্চয় মারা পড়তেন। পারস্যের দূত পালকি থেকে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি হাতির শুঁড় লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলেন যে হাতি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঔরঙ্গজীবের শিক্ষাগুরু মোল্লা শাহের কাহিনী

পারস্যের দূত বিদায় নেবার পর ঔরঙ্গজীব তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক মোল্লা শাহকে সম্বর্ধনা জানান।[১৬] এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীটি এখানে বিবৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই বৃদ্ধ লোকটিকে সাজাহান কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং তিনি বৃদ্ধ বয়সে কাবুলের কাছে কোনো স্থানে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি হিন্দুস্থানের গৃহযুদ্ধের খবর পান এবং জানতে পারেন যে তাঁর প্রাক্তন ছাত্র ঔরঙ্গজীব হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছেন। খবর পেয়ে মোল্লা সাহেব তাড়াতাড়ি দিল্লী চলে আসেন। তাঁর বাসনা ছিল, হয়ত তাঁর শিষ্য তাঁকে ওমরাহের মর্যাদা দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেবে। তার জন্য দরবারের সকলকেই তিনি অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। রৌশনআরা বেগম পর্যন্ত তাঁর দাবী সমর্থন করেছিলেন। তিন মাস তিনি দিল্লীতে থাকার পর ঔরঙ্গজীব জানতে পারেন যে তিনি কোনো কাজের জন্য তাঁর কাছে এসেছেন এবং তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু প্রতিদিন তাঁকে দরবারে উপস্থিত থাকতে দেখে তিনি শেষে তাঁকে নির্জনে দেখা

১৬। মোল্লা শাহ বাদকশানের বাসিন্দা। তিনি দারাশিকোর 'মুর্শিদ' বা দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং সম্রাট সাজাহান তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ঔরঙ্গজীবকেও তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

করার জন্য বললেন। স্বতন্ত্রভাবে মোল্লা শাহের সঙ্গে ঔরঙ্গজীব সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলে এবং বললেন যে, হাকিম-উল মুলক দানেশমন্দ খাঁ এবং আর তিন চারজন আমীর ছাড়া আর কেউ সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকবেন না। সাক্ষাৎকালে তিনি যা বলেছিলেন তার সঠিক বিবরণ আমি যা মোটামুটি সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা বলছি। ঔরঙ্গজীব বলেন :

তারপর মোল্লাজী, আপনার মনোবাঞ্ছা কি? আমার সঙ্গে মোলাকাত করার কি উদ্দেশ্য আপনার? আপনি কি চান যে আমি আপনাকে আমীরের পদমর্যাদা দিয়ে আমার গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করব? আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হতাম না যদি বুঝতাম যে বাল্যকালে আপনি আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা আজ আমার জীবনে মূল্যবান সম্পদ হয়েছে। হে গুরুদেব। বলতে পারেন, আপনার কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি? আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে 'ফিরিঙ্গিস্থান' সামান্য একটা দ্বীপ ভিন্ন কিছু নয় এবং সেই দ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হলেন পর্তুগালের রাজা, তারপর হল্যাণ্ডের রাজা এবং শেষে ইংলণ্ডের রাজা। ফিরিঙ্গিস্থানের অন্যান্য রাজাদের সম্বন্ধে (যেমন ফ্রান্স ইত্যাদির) আপনি বলেছিলেন যে তাঁরা আমাদের হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিদের মতন এবং হিন্দুস্থানের শক্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে অন্য কোনো দেশের তুলনাই হয় না। হিন্দুস্থানের সম্রাটরাও তাঁদের তুলনায় এত বড় যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান—এঁদের সমতুল্য কোনো রাজা ফিরিঙ্গিস্থানে নেই। হে ভৌগোলিক। হে ইতিহাসবিশারদ। আপনি কি আমাকে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন? আপনি কি বলেছিলেন আমাকে তাদের অর্থ সামর্থ্য, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে কোনো কথা? আপনি কি আমাকে জানিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি হয় কেন, কেন দেশে দেশে, যুগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিদ্রোহ বা বিপ্লব হয়? আপনি আমাকে কিছুই বলেননি, কিছুই শিক্ষা দেননি। এসব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আপনি তো আমার পূর্বপুরুষ, যাঁরা এই বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের নাম পর্যন্ত বলেননি। আমি কিছুই জানতাম না তাঁদের সম্বন্ধে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ভাষাও কিছু-কিছু প্রত্যেক

সম্রাটের জানা কর্তব্য। আপনি আমাকে আরবী লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছেন, আর কোনো ভাষা শেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন একটি ভাষা (আরবী) আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, যা সামান্য আয়ত্ত করতেও যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের অন্তত দশ-বারো বছর সময় লাগে। এভাবে শুধু একটা জবরদস্ত ভাষা শিখিয়ে আপনি আমার মূল্যবান কৈশোর ও যৌবনকাল নষ্ট করে দিয়েছেন। আরবী লিখতে পড়তে শিখেছি, আরবী ব্যাকরণ শিখেছি, জীবনে আর কিছু শিখিনি আপনার কাছে!

এই ভাষায় সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর গুরুকে সম্বোধন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে সম্রাট এখানেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আরও অনেক কথা বলেছিলেন। সম্রাট বলেছিলেন:

আপনি কি জানেন না, মোল্লাজী, যে বাল্যকালই হল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। শিক্ষা দেবার সুবর্ণ সুযোগ ছিল তখন আপনার। আপনি আমাকে আরবীর মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, আইনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়েছেন। নিজের মাতৃভাষায় যে কোনো বিষয় কি আরও সহজে, আরও অনেক ভালভাবে শেখানো যায় না, মোল্লাজী? আপনি আমার পিতা শাহজাহানকে বলেছিলেন যে আমাকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু আমি তো জানি, কি শিখিয়েছেন আপনি আমাকে? কতকগুলি দুর্জ্ঞেয় সূত্র, তার চেয়েও দুর্বোধ্য ভাষায় (আরবীতে) আপনি আমার মগজে জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কি মূল্য আছে তার বাস্তব জীবনে?

মোল্লাজী চুপ করে কথাগুলি শুনছিলেন। ঔরঙ্গজীব এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে, অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও সংযতভাবে কথাগুলি বলছিলেন:

আপনি আমাকে রাজকর্তব্যও শিক্ষা দেননি। রাজপুত্র যে একদিন রাজসিংহাসনে বসতে পারে, একথা আপনার খেয়াল হয়নি। হিন্দুস্থানের রাজাদের এটা একটা চরম দুর্ভাগ্য। তাঁরা কোনোদিনই সত্যকার গুরুর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পাননি এবং পান না। আপনি আমাকে যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দেননি। যাই হোক, আমার ভাগ্য ভাল যে আপনার মতন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়াও আমি আরও কয়েকজনের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম। তা না হলে আমার পরিণাম যে কি হত তা ভাবতেও ভয় হয় আমার।

অতএব, হে সুধীপ্রধান। আপনি স্বগ্রামে অনুগ্রহ করে ফিরে যান। আপনি কে, এবং আপনি কেমন আছেন, তা কারও জানবার দরকার নেই।*

গণৎকারদের মজার গল্প

পারস্যের রাষ্ট্রদূত ও মোল্লাজ'কে নিয়ে যখন এইসব ব্যাপার চলেছে তখন গণৎকারদের নিয়ে হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বেধে গেল। আমার কাছে ঘটনাটা বেশ উপভোগ্যই মনে হয়েছিল। এশিয়ার অধিকাংশ লোকই স্বর্গরাজ্যে সঙ্কেত ও নির্দেশ সম্বন্ধে এত বেশি আস্থাবান যে পৃথিবীর কোনো ঘটনা যে উর্ধ্বলোকের ইশারা ছাড়া ঘটতে পারে, এ তারা কল্পনাই করতে পারে না। তাই পদেপদে তারা গণৎকারের শরণাপন্ন হয়। গণৎকারের পারামর্শ ছাড়া জীবনে এক পাও তারা চলতে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের সেনাবাহিনী চরম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু যতক্ষণ না 'সাহেৎ' অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ শুভমুহূর্ত নির্দিষ্ট হয়, ততক্ষণ সেনাধ্যক্ষরা যুদ্ধ আরম্ভ করার হুকুম দেন না। শুধু যুদ্ধবিগ্রহ নয়, জীবনের কোনো কাজই জ্যোতিষীর পরামর্শ ও আদেশ ছাড়া করা হয় না। সেনাপতি নিয়োগ করতে হবে, গণৎকারের পরামর্শ চাই, বিবাহ করতে হবে বা দিতে হবে, তাও গণৎকারের অনুমতি চাই, কোনো স্থানে যাত্রা করতে হবে, গণকার যাত্রার শুভক্ষণ বলে দেবেন। সর্বদা ও সর্বত্র মসিয়ে গণৎকার হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও বন্ধু। জীবনের অতি তুচ্ছ প্রাত্যহিক ঘটনাও গণৎকার নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ হয়ত একটি ক্রীতদাস কিনবেন, তাও গণৎকারকে জিজ্ঞাসা করা চাই। কেউ হয়ত বৎসরান্তে নতুন পোশাক পরবেন, তাও পরা উচিত কি না গণৎকার বলে দেবেন।

এই জাতীয় জঘন্য কুসংস্কার, কথায় কথায় গণৎকার, পদে পদে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া—এ আমি আর কোথাও দেখিনি। মনে হয়, এদেশের লোক জন্ম থেকে জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে। জ্যোতিষীর এই অখণ্ড প্রতিপত্তির ফলে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যথেষ্ট। দেশের ও সমাজের, ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম, নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে জ্যোতিষীদের সর্বাগ্রে পরিচয় হয়। যা হয়ত একান্তভাবে জনকল্যাণের

* সম্রাট ঔরঙ্গজীবের চরিত্রের এই সরলতা, দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাদিতা বাস্তবিকই দুর্লভ। সাধারণ ইতিহাসের বই থেকে তাঁর চরিত্রের এই দিকটার কথা কিছুই জানা যায় না—অনুবাদক

স্বার্থে বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর স্বার্থে গোপন রাখা প্রয়োজন, তাও গণৎকাররা পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। জানার ফলে স্বভাবতই অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, ঘটতে বাধ্য।

এইবার ঘটনাটি বলি। চমকপ্রদ ঘটনা। প্রধান রাজজ্যোতিষী যিনি তিনি হঠাৎ একদিন পুষ্করিণীর জলের মধ্যে পড়ে গেলেন এবং এমন পড়া পড়লেন যে আর উঠলেন না। অর্থাৎ জলে ডুবে রাজজ্যোতিষী ভবলীলা সংবরণ করলেন। সংবাদটি বাইরে প্রকাশ হওয়া মাত্র চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল, রাজদরবারেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। গণৎকাররা রীতিমত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁদের জ্যোতিষী পেশার কথা ভেবে। রাজজ্যোতিষী যিনি জলে ডুবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন, তিনি সম্রাট ও তাঁর আমীর-ওমরাহদেরই ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। সুতরাং বাইরের সাধারণ লোক তাঁকে খুব জবরদস্ত জ্যোতিষী মনে করত। তারা ভাবত, যিনি রাজা-বাদশা ও আমীর ওমরাহদের জীবনের প্রত্যেক ছোটবড় ঘটনা সম্বন্ধে এতদিন ধরে ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেন, ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি ঘটনা যিনি দিব্য দেখতে পেতেন তিনি নিজে তাঁর মর্মান্তিক ভবিষ্যৎটি দেখতে পেলেন না কেন? কেন তিনি বুঝতে পারলেন না যে জলে নামলেই তিনি পড়ে যাবেন এবং পড়ে গেলে আর গাত্রোত্থান করবেন না? সকলের ভাগ্যবিধাতা ও ভবিষ্যদ্বক্তা যিনি, তিনি কেন নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন না? এ-প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি দিতে লাগল, কেউ তার কোনো সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। অনেকের মনে ফিরিঙ্গিস্থানের 'বিজ্ঞান' ও হিন্দুস্থানের 'জ্যোতিষ' সম্বন্ধে নানারকমের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

জ্যোতিষীরা সকলে এই ধরনের কথাবার্তায় ও আলাপ-আলোচনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের পেশা সম্বন্ধে এইসব বিরূপ মন্তব্য তাঁদের আদৌ মনঃপূত হত না। জ্যোতিষী সম্বন্ধে নানারকমের ঠাট্টাবিদ্রূপ যখন বাইরে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হল, তখন তাঁরা রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন। জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে নানারকমের কাহিনীও রটনা হতে লাগল। তার মধ্যে একটি কাহিনীর খুব বেশি প্রচার হয়েছিল এই সময়। কাহিনীটি পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাস সম্বন্ধে। কাহিনটি এই :

পারস্যের সম্রাট শাহ আব্বাস একবার তাঁর জেনানামহলের মধ্যে একটি ছোট সুন্দর বাগিচা করার বাসনা প্রকাশ করেন। সম্রাটের বাসনা বাস্তবে রূপ

দেবার জন্য উদ্যানপালক উদ্‌যোগী হলেন এবং কয়েকটি ফলের বৃক্ষ রোপণের দিনও তিনি ঠিক করলেন। সংবাদ শুনে রাজজ্যোতিষী সম্রাটকে জানালেন যে শুভদিন দেখে যদি বৃক্ষরোপণ না করা হয়, তাহলে সেই বৃক্ষে ফল ধরার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। সম্রাট শাহ আব্বাস রাজজ্যোতিষীর কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন। জ্যোতিষী মশাই তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে দিন স্থির করতে বসলেন। পুঁথি দেখে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন যে আর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি বৃক্ষগুলি রোপণ করা না হয় তাহলে গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগের শুভ মুহূর্তটি কেটে যাবে এবং বৃক্ষে ফল ফলবে না। রাজজ্যোতিষীর এই সিদ্ধান্তের সময় উদ্যানপালক উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং অন্য লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হল। মাটিতে গর্ত খোঁড়া হল, সম্রাট নিজের হাতে চারাগাছগুলি রোপণ করলেন। সমস্ত কাজ এইভাবে শেষ হয়ে যাবার পর, উদ্যানপালক ফিরে এসে দেখল তার করণীয় কর্ম কে শেষ করে রেখেছে। গাছগুলি সব উল্টোপাল্টা করে রোপণ করা হয়েছে। আমের জায়গায় জাম, খেজুরের জায়গায় ডালিম, আতার জায়গায় নোনা, নোনার জায়গায় আপেল লাগানো হয়েছে। এরকম বিসদৃশ কাণ্ডটা কে করেছে এবং কেন করেছে তা ভেবে দেখবার সময় হল না তার। রীতিমত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উদ্যানপালক সমস্ত গাছ উপড়ে ফেলে দিল। তারপর চারগাছগুলি সারারাত মাটিতে ফেলে রাখা হল সকালে যথাসময়ে রোপণ করার জন্য। খবরটি রাজজ্যোতিষীর কানে পৌঁছল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্রাটের কানে সেটি পৌঁছে দিলেন। সম্রাট উদ্যানপালককে ডেকে পাঠালেন। উদ্যানপালক হাজির হল। শাহ আব্বাস ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন : 'আমার নিজের হাতে লাগানো গাছ কে তোমাকে উপড়ে ফেলার আদেশ দিলে? দিনক্ষণ দেখে গাছ লাগানো হয়েছে, আর তুমি সেই গাছ কাউকে জিজ্ঞাসা না করে উপড়ে ফেললে কেন? এখন আর গাছের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, গাছ লাগালেও কিছু হবে না।' উদ্যানপালক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল : 'হায় আল্লা! এই কি সাহেৎ? দ্বিপ্রহরে বৃক্ষ রোপণ করলে সন্ধ্যার সময় তা উপ্‌ড়ে ফেলাই ভাল!' সম্রাট শাহ আব্বাস গ্রাম্য উদ্যান-পালকের কথায় হো-হো করে হেসে ফেললেন এবং রাজজ্যোতিষীর দিকে ফিরে মুচকি হেসে চুপ করে চলে গেলেন।

হিন্দুস্থানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি

এখানে আমি আরও দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব যা থেকে হিন্দুস্থানের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে। ঘটনা দুটি সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ঘটেছিল। ঘটনা দুটি বিবৃত করা প্রয়োজন, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে মোগলযুগেও হিন্দুস্থানে যে কি রকম বর্বর প্রথা চালু ছিল, তা এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো পবিত্রতা রক্ষা করা হত না, নিরাপত্তাও ছিল না। সম্পত্তি সব হল সম্রাটের। রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির মালিক সম্রাট।* সম্রাটের অধীনে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো অধিকারই স্বীকৃত হয় না। তাঁদের মৃত্যুর পর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হন সম্রাট নিজে। এইবার ঘটনা দুটি বলছি।

নায়েক নামর্খা নামে মোগল দরবারের একজন প্রবীণ আমীর ছিলেন। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর রাজ-দরবারে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি নিযুক্ত থেকে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যে সম্রাটের করতলগত হবে তা তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, এই বর্বর প্রথার জন্য কিভাবে ওমরাহদের মৃত্যুর পর তাদের বিধবা পত্নীরা দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হন এবং সামান্য ভাতার জন্য সম্রাটের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। তিনি জানতেন, কিভাবে মৃত ওমরাহদের পুত্ররা সামান্য জীবিকার জন্য অন্যান্য ওমরাহদের ব্যক্তিগত সেনাদলে নাম লেখাতে রাজী হন। নায়েক খাঁ যখন দেখলেন যে তাঁর অন্তিমকাল আসন্ন, তখন তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীদের ডেকে তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ বিলিয়ে দিলেন এবং সিন্দুকের মধ্যে মোহর ও টাকার বদলে লোহা ও হাড়ের টুকরা, পুরনো ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি ভর্তি করে রেখে দিলেন। এইভাবে সিন্দুক ভর্তি করে, শীলমোহর করে দিয়ে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন যে সিন্দুকে যেন কেউ হাত না দেন, কারণ তাঁর মৃত্যুর পর এই সিন্দুকের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সম্রাট

* বার্নিয়েরের এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় বার্নিয়েরের এই মন্তব্য প্রত্যেক অনুসন্ধানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির রীতিমত চিন্তার খোরাক যোগাবে। ভারতবর্ষে মোগলযুগে পর্যন্ত ক্রীতদাসপ্রথা কি রকম চালু ছিল, সে সম্বন্ধেও বার্নিয়ের প্রচুর মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করেছেন। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' সম্বন্ধেও বার্নিয়েরের এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। পাঠকদের পুনরায় মার্ক্স ও এঙ্গেলসের পত্র দুখানির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।—অনুবাদক

সাজাহানের প্রাপ্য। নায়েক খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কথানুযায়ী সেই সিন্দুক সম্রাট সাজাহানের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হল। সম্রাট তখন রাজদরবারে আমলা-অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। এমন সময় আমীর নায়েক খাঁর সিন্দুক সেখানে বহন করে আনা হল। আনা মাত্রই সম্রাট সকলের সামনে তাদের সিন্দুক খোলার অনুমতি দিলেন। তারপর সিন্দুকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত দ্রব্যাদি দেখে তাঁর কি অবস্থা হল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে সম্রাট সাজাহান তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দরবার ছেড়ে চলে গেলেন। এই হল প্রথম ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটি স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক। একজন বিখ্যাত বেনিয়ানের মৃত্যুর পর ঘটনাটি ঘটে।* বেনিয়ান ভদ্রলোক দীর্ঘদিন সম্রাটের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাজনী কারবার করে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পিতার সঞ্চিত অর্থের ভাগ চায়, কিন্তু বেনিয়ানের বিধবা পত্নী তা দিতে রাজী হন না। কারণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী এবং কাঁচা পয়সা হাতে পেলে দুদিনে যে সে ফুঁকে দেবে তা তিনি জানতেন। টাকা না পেয়ে পুত্র মায়ের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য পিতার সঞ্চিত অর্থের সংবাদ সম্রাটকে জানিয়ে দেয়। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হল দু'লক্ষ টাকা। সংবাদ পেয়ে সম্রাট বেনিয়ানের বিধবা পত্নীকে ডেকে পাঠালেন। ওমরাহদের সামনে তাঁকে বললেন যে অবিলম্বে যেন তিনি এক লক্ষ টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দেন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে দেন। এই কথা বলে তিনি বিধবা স্ত্রীলোকটিকে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু সম্রাটের এই রূঢ় ব্যবহারে আদৌ বিচলিত হলেন না। জমাদাররা যখন তাঁকে হলঘর থেকে বাইরে বিতাড়িত করার জন্য উদ্যত, তখন তিনি বললেন যে তিনি সম্রাটকে আরও দু-একটি কথা জানাতে চান। সাজাহান শুনে বললেন: 'বলতে দাও, কি বলতে চান উনি, শুনি!' স্ত্রীলোকটি বললেন: 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! আমার কনিষ্ঠ পুত্র টাকা দাবী করেছেন পুত্র হিসাবে। তার অধিকার আছে, সে চাইতে পারে। আপনিও দেখছি টাকা চাইছেন। জানি না, আপনার সঙ্গে আমার মৃত স্বামীর সম্পর্ক কি? অনুগ্রহ করে যদি বলেন, আপনার সঙ্গে আমার স্বামীর আত্মীয়তার সম্পর্ক কি, তাহলে

* 'বেনিয়ান' কথাটি বার্নিয়েরের আমলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের বলা হত। পরে বৃটিশ আমলে ইংরেজদের বাঙালী ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দিদের 'বেনিয়ান' বলা হত।

আমি আনন্দিত হবো।' সরল স্ত্রীলোকের এই সহজ উক্তি শুনে সম্রাট সাজাহান প্রীত হলেন এবং সামান্য একজন সুদখোর ব্যবসায়ী বেনিয়ানের সঙ্গে হিন্দুস্থানের সম্রাটের আত্মীয়তার প্রশ্নে বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন: 'টাকা আপনার চাই না, আপনিই নিশ্চিন্তে ভোগ করুন।'

১৬৬০ সালে হিন্দুস্থানের ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার পর থেকে ১৬৬৬ সালে আমার হিন্দুস্থান থেকে বিদায় নেবার সময় পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে আমার বিবৃত করার ইচ্ছা নেই। করতে পারলে অবশ্য ভালই হত। আপাতত কয়েকজন ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু আমি বলতে চাই। যাঁদের সান্নিধ্যে আমি এসেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে—এরকম কয়েকজন সম্বন্ধে এবারে কিছু আমি বলব। যাঁদের কথা বলব, তাঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট সাজাহানের চরিত্র

প্রথমে সাজাহানের কথা বলি। যদিও ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত কড়া পাহারার মধ্যে তাঁকে রাখতেন, তাহলেও বৃদ্ধ পিতাকে তিনি যথেষ্ট উদারতা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সাজাহানকে তিনি খুশি অনুযায়ী থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর বেগমসাহেবা, জেনানা ও নর্তকীদেরও তাঁর সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃদ্ধ সাজাহান যখন যা চেয়েছেন, তখন তা-ই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন ধর্মকর্ম করার ঝোঁক হল তাঁর, তখন মোল্লা-মৌলবীদেরও তাঁর কাছে কোরানপাঠের জন্য নিয়মিত যাবার অনুমতি দেওয়া হল। তাছাড়া, নানারকমের জীবজন্তু—ভাল ভাল ঘোড়া, বাজপাখী, হরিণ প্রভৃতি—যখন যা তিনি তলব করতেন, সব তাঁকে পাঠানো হত। সাজাহান জানোয়ারের ও পাখির লড়াই দেখতে ভালবাসতেন। বস্তুবিকই, ঔরঙ্গজীব বরাবর তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট উদার আচরণ করেছেন, এবং কোনোদিন তাঁর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেননি বা অশ্রদ্ধা দেখাননি। তিনি প্রায়ই তাঁর পিতাকে নানারকমের উপহার পাঠাতেন, গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শও করতেন এবং অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ভাষায় চিঠিপত্রও লিখতেন। এই আচরণের জন্যই সাজাহানের ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত স্বভাব শেষ পর্যন্ত শান্ত ও নম্র হয়েছিল। এমনকি, ঔরঙ্গজীবের প্রতি বিরূপ মনোভাব তাঁর আর ছিল না। বাস্তবিক

ব্যাপারে তিনি ঔরঙ্গজীবকে চিঠি লিখতেন, দারার কন্যাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং যে মূল্যবান মণিরত্ন একদিন তিনি চূর্ণ করে ফেলবেন বলেছিলেন, তাও তাঁকে উপহার দিয়ে খুশি হয়েছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে তিনি শেষে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলেন এবং আশীর্বাদও জানিয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত যা বললাম তাতে মনে হয় যে ঔরঙ্গজীব বোধ হয় সব সময় তাঁর পিতাকে খুশি করবার চেষ্টা করতেন এবং কখনো কঠোর ব্যবহার করতেন না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পিতাকে খুশি করবার জন্য তিনি অকারণে কখনো মাথা হেঁট করতেন না। বৃদ্ধ সাজাহানকে লেখা ঔরঙ্গজীবের এমন একখানা চিঠির কথা অন্তত আমি জানি যার মধ্যে তিনি তাঁর পিতার কোনো উদ্ধত উক্তির প্রতিবাদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন। এই চিঠির কিছুটা অংশ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। এখানে তা উদ্ধৃত করছি :

আপনার ইচ্ছা যে আমি সনাতন প্রথা আঁকড়ে ধরে থাকি এবং আমার অধীন যে কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ধনসম্পত্তি নিজে গ্রাস করে বসি। যখন কোনো আমীর বা কোনো ধনী ব্যবসায়ী মারা যান, এমন কি তাঁদের মৃত্যুর আগেই, আমরা তাঁর ধনসম্পত্তি সব গ্রাস করি, তাঁদের অধীন কর্মচারী ও ভৃত্যদের পদচ্যুত করে দূর করে দিই। সামান্য একটুকরো সোনাদানাও আমরা ফেলে দিই না। এইভাবে অপরের সঞ্চিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করার হয়ত একটা অস্বাভাবিক আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু এর মতন নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ আর নেই। আমীর নায়েক খাঁ অথবা হিন্দু বেনিয়ানের সেই বিধবা পত্নী আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই অন্যায় প্রথার যে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, তা অবাঞ্ছনীয় বা অপ্রীতিকর হলেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয় কি ?

সুতরাং আপনার অভিযোগ ও আদেশ আমি মান্য করতে পারলাম না এবং আপনি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন, তাও আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। আজ আমি রাজতক্তে বসেছি বলে আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গেছি। প্রায় চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে জানেন যে রাজমুকুট মাথায় ধারণ করার দায়িত্ব, অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট কতখানি।...

আপনার ইচ্ছা, রাজ্যের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সুখসমৃদ্ধির জন্য আমি বিশেষ মনোযোগ না দিই এবং তার পরিবর্তে রাজ্যের সীমানাবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধবিগ্রহের

পরিকল্পনা বেশি করে রচনা করি। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করি যে প্রত্যেক শক্তিশালী সম্রাটের উচিত যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করে রাজ্যের সীমানা বাড়ানো। আমার যদি সে ইচ্ছা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আমি তৈমুরের বংশধর নই। সব স্বীকার করলেও আপনি আমাকে নিষ্ক্রিয় বলতে পারেন না। আমার সেনাবাহিনী যে কোনো যুদ্ধই করেনি এবং রাজ্যও জয় করেনি, এমন অভিযোগও করা যায় না। দাক্ষিণাত্যে ও বাংলাদেশে আমার সৈন্যরা এদিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শুধু রাজ্য জয় করাই শ্রেষ্ঠ রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয়। পৃথিবীর বহু দেশ ও বহু জাতি অসভ্য বর্বরদের পদানত হয়েছে এবং অনেক দিগ্বিজয়ী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পথের ধুলায় গুঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং সাম্রাজ্য জয় করাই সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য নয়। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজ্য পরিচালনা করাই প্রত্যেক সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য।'*

মগ ও পর্তুগীজ বোম্বেটদের কথা

বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এসে সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজটি হল, বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। এ কাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকর্তা বিখ্যাত মীর জুমলা কেন গ্রহণ করেননি, তা তিনিই জানেন। সায়েস্তা খাঁ যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে হলে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গোয়া, সিংহল, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিত। এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতে

* এর পর বার্নিয়ের মীর জুমলার বাংলা ও আসাম অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মীর জুমলার পর সায়েস্তা খাঁ, ঔরঙ্গজীবের দুই পুত্র সুলতান মামুদ ও সুলতান মামুদ, কাবুলের শাসনকর্তা মহব্বৎ খাঁ, যশোবন্ত সিং, শিবাজী প্রভৃতির ঐতিহাসিক ভূমিকা ও চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। এই অংশের অনুবাদ এখানে করা হল না, কারণ নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ ছাড়া এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। সায়েস্তা খাঁ প্রসঙ্গে মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে মূল্যবান বিবরণ বার্নিয়ের দিয়েছেন, তার সারানুবাদ করা হল।—অনুবাদক

পারত না। তারা নামেই শুধু খ্রীস্টান ছিল, কিন্তু তাদের মতন জঘন্য পিশাচ-প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না। খুনজখম, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সব সময় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগদের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করল। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুঠতরাজ অত্যাচার করে বেড়াতে লাগল। এই সময় গঙ্গার অসংখ্য শাখানদী দিয়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তারা লুঠতরাজ করতে আরম্ভ করল। হাট-বাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস করবার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত। উৎসবপার্বণের দিনও তারা এইভাবে গ্রামাঞ্চলে হানা দিত। অনেক সময় গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। নিম্নবঙ্গের কত শত গ্রাম এইভাবে যে তারা লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশূন্য করেছে, তার হিসেব নেই। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছে।[১৭]

ঔরঙ্গজীবের মহত্ত্ব

এইখানেই আমার ইতিহাস শেষ হল। পাঠকরা নিশ্চয় ঔরঙ্গজীবের সিংহাসন দখলের নিষ্ঠুর পদ্ধতি অনুমোদন করবেন না। আমিও করি না না করাই স্বাভাবিক। যে কৌশলে ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতার সিংহাসন দখল করেছিলেন, তা নিশ্চয় নিষ্ঠুর ও অন্যায় কৌশল। কিন্তু যেমন ইয়োরোপের রাজাদের আমরা বিচার করে থাকি, সেইভাবে বোধ হয় ঔরঙ্গজীবকে বিচার করা উচিত হবে না। ইয়োরোপে রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন উত্তরাধিকারসূত্রে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অধিকার সেখানে বিধিবদ্ধ। হিন্দুস্থানে সেরকম কোনো

১৭। ১৭৮০ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র 'Map of the Sunderbund and Baliagot Passages'-এর মধ্যে দেখা যায়, নিম্নবঙ্গের একটি অঞ্চল 'Country depopulated by the Muggs' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্নিয়েরের এই বিবরণের সঙ্গে রেনেলের মানচিত্রের এই উল্লেখ আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য গঙ্গার ধারা পরিবর্তনের জন্যও প্রাচীন ভাগীরথীর তীরবর্তী অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়।

আইন বা বিধান নেই। রাজার মৃত্যুর পর তাই রাজপুত্ররা সিংহাসন নিয়ে কলহ করেন, যুদ্ধবিগ্রহও করেন, কারণ তাঁরা জানেন যে যিনি সিংহাসন এইভাবে দখল করতে পারবেন তিনিই ভাগ্যবান, বাকি সকলকে সেই ভাগ্যবানের অধীনে হতভাগ্যের মতন জীবনযাপন করতে হবে। তা সত্ত্বেও যাঁরা সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে নিন্দাবাদ করবেন, তাঁদের অন্তত এইটুকু স্বীকার করা উচিত যে সমস্ত দোষত্রুটি নিয়েও তাঁর মতন একজন প্রতিভাবান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহান সম্রাট হিন্দুস্থানে খুব কমই জন্মেছিলেন।

হিন্দুস্থান প্রসঙ্গে

[বার্নিয়েরের সময় চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন এবং মঁশিয়ে কলবার্ট ছিলেন ফ্রান্সের অর্থসচিব। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বার্নিয়ের হিন্দুস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্পদ, আচার-ব্যবহার, সেনাবাহিনী, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্যান্য অংশের মধ্যে এই পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মোগলযুগের ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এই জাতীয় নিখুঁত চিত্র ও বিশ্লেষণ সমসাময়িক অন্য কোনো সাহিত্যে বাস্তবিকই দুর্লভ।

—অনুবাদক।]

মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লেখা বার্নিয়েরের পত্র

এশিয়ায় কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে শূন্য হাতে যাওয়া যায় না। মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের পোশাক স্পর্শ করার প্রথম সুযোগ ও সৌভাগ্য যখন আমার হয় তখন তাঁর সম্মানের জন্য আমাকে নগদ আটটি টাকা প্রণামী দিতে হয়েছিল। তাছাড়া একটি ছোরার খাপ, একটি কাঁটা এবং ভাল চামড়ায় বাঁধানো একখানি ছুরি আমাকে দিতে হয়েছিল ফজল খাঁকে। ফজল খাঁ একজন মন্ত্রী এবং সাধারণ মন্ত্রী নন, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী মন্ত্রী। পারিবারিক চিকিৎসক হিসাবে আমার বেতন কি হওয়া উচিত তাও তাঁর উপর নির্ভর করে। মোটকথা, তিনি অনেক গুরুতর দায়িত্ব পালন করতেন। সেইজন্য তাঁকেও প্রথম সাক্ষাতের সময় ভেট দিতে হয়েছিল। যদিও এই ধরনের কোনো রীতি আমি আমার দেশে ফ্রান্সে চালু করতে চাই না, তবু হিন্দুস্থান থেকে ফিরে আসার পর এত তাড়াতাড়ি আমি সেখানকার রীতি-নীতি ভুলে যেতেও পারি না। তাই আপনাকে চিঠিতেই সমস্ত কথা লিখে জানাচ্ছি। সম্রাটের সামনে উপস্থিত হতে আমি বাস্তবিকই সঙ্কোচবোধ করছি এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের দেশের সম্রাটের সঙ্গে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের নানাদিক দিয়ে পার্থক্য আছে। দুজনের সামনে গেলে দু'রকমের বিভিন্ন মনোভাব হয়। আর আপনার সামনেও বা আমি শূন্য হাতে কি করে যাই? ফজল খাঁর চেয়ে আপনাকে যে আমি কত বেশি শ্রদ্ধা করি, তা তো আপনি জানেনই! তাই এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে জানানো বিশেষ দরকার মনে করি।

হিন্দুস্থানে আমি দীর্ঘ বারো বছর কাটিয়েছি। সেই সময় বুঝেছি আমার দেশ ফ্রান্সের সঙ্গে হিন্দুস্থানের পার্থক্য কোথায় ও কতখানি। হিন্দুস্থানে থাকার সময় আমি আপনার মতন মন্ত্রীর দক্ষতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছি। সে কথা এখানে আলোচনা করার আপাতত কোনো প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে হিন্দুস্থান সম্বন্ধে আমি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সেই সম্বন্ধেই এই পত্র মারফত আপনাকে কিছু জানাতে চাই।

এশিয়ার মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখলে মোগল বাদশাহের রাজ্যের বিশালতা সহজেই কল্পনা করা যায়। এই বিশাল রাজ্যই 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত। এই বিশাল রাজ্য আমি মেপে দেখিনি, দেখা সম্ভবও নয়। তবে আমার ভ্রমণ থেকে আমার যে ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, গোলকুণ্ডার সীমানা থেকে গজ্‌নি বা কান্দাহারের কাছাকাছি পর্যন্ত, অর্থাৎ পারস্যের প্রথম শহর পর্যন্ত, তিন মাসের ভ্রমণ-পথ এবং দূরত্বও প্রায় পাঁচশত ফরাসী লীগ বা প্যারিস থেকে লিয়ঁ যতটা দূর তার প্রায় পাঁচগুণ বেশি দূর। আশ্চর্য হল, এতবড় বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই অত্যন্ত উর্বরা। তার মধ্যে বাংলাদেশ হল অন্যতম। এরকম উর্বর দেশ পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা যায়। বাংলাদেশের সম্পদ ও ঐশ্বর্য অতুলনীয়। মিশরের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাংলার উর্বরতা মিশরের তুলনায় অনেক বেশি। মিশরে যে পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় বাংলাদেশে, যেমন ধান, গম ইত্যাদি। এছাড়া আরও নানারকমের ফসল ও পণ্যদ্রব্যাদি যা বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, মিশরে তা হয় না—যেমন তুলো, রেশম, নীল ইত্যাদি। হিন্দুস্থানের বহু প্রদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশি এবং চাষ-আবাদও বেশ ভালভাবে করা হয়। শিল্পী ও কারিগররা সাধারণত আয়েসী হলেও প্রয়োজনের তাগিদে তারা মেহনত করতে বাধ্য হয় এবং নানারকমের কার্পেট, ব্রকেড, সোনারুপোর কারুকাজ-করা দামী কাপড় ও সূক্ষ্ম জিনিসপত্তর তৈরি করে বিক্রি করে এবং বিদেশে চালান দেয়।

হিন্দুস্থান প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় বলে মনে হয়। সোনা-রুপো পৃথিবীর অন্যান্য সব জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এসে পৌঁছয় এবং হিন্দুস্থানের গুপ্ত গহ্বরে অন্তর্ধান হয়ে যায়! আমেরিকা থেকে যে সোনা বাইরে বেরিয়ে এসে ইয়োরোপের নানা রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তারই একটা অংশ নানা পথ ঘুরে শেষে তুরস্কে এসে জমা হয়, তুর্কির পণ্যের বিনিময়ে। আরও একটা অংশ স্মির্ণা ঘুরে পারস্যে যায়, সেখানকার রেশমের

বিনিময়ে। তুরস্ক কফি চালান দিতে পারে না, কারণ ইয়েমেনের কাছ থেকে সে নিজেই কফি আমদানি করে। হিন্দুস্থানের পণ্যদ্রব্য তুরস্ক, ইয়েমেন ও পারস্য প্রত্যেকেরই দরকার। সুতরাং এই সব দেশ থেকে বেশ খানিকটা পরিমাণ সোনারুপো লোহিত সাগরের বন্দরে, পারস্য সাগরের শীর্ষে বসরায় এবং বন্দর আব্বাসিতে গিয়ে জমা হয়, হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা করার জন্য। প্রত্যেক বছর যথাকালে এই তিনটি বিখ্যাত বন্দরে হিন্দুস্থানের জাহাজ এসে ভিড় করে নানারকমের বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে এবং সেই সব সোনা বোঝাই করে নিয়ে আবার হিন্দুস্থানে ফিরে যায়। একথাও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় জাহাজ, তা সে যারই হোক, হিন্দুস্থানের নিজের বা ডাচ, ইংরেজ ও পর্তুগীজদের —প্রত্যেক বছর যখন নানারকম পণ্য বোঝাই করে নিয়ে হিন্দুস্থান থেকে পেগু, তেনাসেরিম, শ্যাম, সিংহল, আচেম (বলখ?), মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যায়, তখন সেই সব দেশ থেকে ফেরবার সময় সোনারুপো বোঝাই করে নিয়ে আসে। মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসির সোনারুপোর মতন এই সব সোনারুপোরও একই পরিণতি হয়। ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপানীদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে যে সোনা পেত তা শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থানে এসে জমা হত। যা কিছু পর্তুগাল বা ফ্রান্স থেকে আসত, তাও আর ফিরে যেতে না। তার বদলে হিন্দুস্থানের পণ্যদ্রব্য চালান যেত। এইভাবে সারা দুনিয়ার সোনারুপোর একটা মোটা অংশ বাণিজ্যের দৌলতে হিন্দুস্থানে এসে জমা হত এবং একবার জমা হলে আর ফিরে যেত না কোথাও, একেবারে মজুতদারের গুহায় আত্মগোপন করত।

আমি যতদূর জানি, হিন্দুস্থানের প্রয়োজন তামা লবঙ্গ জায়ফল দারুচিনি ইত্যাদি এবং এইসব জিনিস ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপান, মালাক্কা, সিংহল ও ইয়োরোপ থেকে সরবরাহ করে। বনাত আমদানি হয় ফ্রান্স থেকে। ভাল ভাল বিদেশী ঘোড়ারও খুব প্রয়োজন হিন্দুস্থানের। বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া শুধু উজবেকিস্থান থেকে আমদানি হয়। কান্দাহার হয়ে পারস্য থেকে এবং মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসি থেকে সমুদ্রপথে আরবী ও হাবসী ঘোড়াও অনেক আমদানি হয়। সমরকন্দ, বলখ, বোখারা ও পারস্য থেকে টাটকা ফলও প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্থানে আসে। দিল্লীতে আপেল, নাসপাতি, আঙুর ইত্যাদি ফল খুব বেশি দামে সারা শীতকাল ধরে বিক্রি হয়। শুকনো ফলেরও—যেমন বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি—চাহিদা খুব বেশি। এসব ফল বাইরে থেকে হিন্দুস্থানে

আমদানি হয়ে থাকে। মালদ্বীপ থেকে সমুদ্রের কড়ি প্রচুর আমদানি হয়, এবং এই কড়ি দিয়ে বাজারে কেনাবেচা চলে, বিশেষ করে বাংলাদেশে কড়ির চলন খুব বেশি। অম্বরীও মালদ্বীপ থেকে আসে (যা তামাক ইত্যাদির সঙ্গে মেশানো হয়)। গণ্ডারের শিঙ, হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস আমদানি হয় প্রধানত হাবশীদের দেশ ইথিওপিয়া থেকে। মৃগনাভি ও পোর্সিলিন আসে চীনদেশ থেকে। মুক্তা আসে বহারীন থেকে (পারস্য সাগরের দ্বীপ - অল-বহারীন) এবং টিউটিকোরিন (মাদ্রাজের তিন্নেভেলি জেলার বন্দর) ও সিংহল থেকে আরও অন্যান্য স্থান থেকে নানারকমের জিনিস আমদানি হয় হিন্দুস্থানে।

'কন্তু এতরকমের পণ্যদ্রব্যের আমদানি হলেও হিন্দুস্থানের প্রয়োজন হয় সোনারুপো চালান দেওয়ার। কারণ হিন্দুস্থানের বণিকরা সোনা দিয়ে দাম না শোধ করে, পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিতেই অভ্যস্ত বেশি। হিন্দুস্থানের এই বাণিজ্যিক বিশেষত্ব বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানের বণিকরা পণ্যের পসরা নিয়ে জাহাজ করে দেশে-বিদেশে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং সেই জাহাজে তাল-তাল সোনা বোঝাই করে দেশে ফিরে আসেন। পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে তাঁরা বাণিজ্যের ঋণ পরিশোধ করেন। সাধারণত সোনা দিতে চান না। তাই হিন্দুস্থানে সব দেশের সোনারুপো এসে জমা হয়।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি। হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের একমাত্র মালিক। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মালিকানা দেশীয় প্রথা বা বিধানসম্মত নয়। আমীর-ওমরাহ অথবা মনসবদার, যাঁরা বাদশাহের অধীনে নিযুক্ত, তাঁদের যাবতীয় সম্পত্তি ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন বাদশাহ নিজে। হিন্দুস্থানের প্রতি বিঘা জমির মালিক বাদশাহ, চাষী বা জমিদার নয়। বসতবাড়ি, উদ্যান, দীঘি ইত্যাদি কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি মধ্যে মধ্যে বাদশাহ নিজের খেয়াল ও মর্জি অনুযায়ী কোনো কোনো প্রিয়জনকে ভোগ করার জন্য দান করেন। এছাড়া 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' বলে হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রীয় বিধানে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মোটকথা, হিন্দুস্থানে সোনারুপো প্রচুর পরিমাণে জমা আছে, যদিও সোনার খনি তেমন নেই। হিন্দুস্থানের সম্রাটই সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক। উপঢৌকন তিনি অনেক পান এবং ধনদৌলত তাঁর অফুরন্ত। কিন্তু তাহলেও, হিন্দুস্থান সম্পর্কে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যা আমি আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করি।

হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজাদের কথা

প্রথমত হিন্দুস্থান একটি বিশাল সাম্রাজ্যের মতন একথা আগেই বলেছি। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অনেকটা অংশ হয় মরুভূমি, না হয় অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল। এই সব অঞ্চলে জমিজমার আবাদ তেমন ভাল হয় না এবং লোকজনের বসবাসও তেমন নেই। ভাল আবাদী জমি আছে, তারও বেশ খানিকটা অংশ লোকাভাবে পতিত থাকে, চাষ হয় না। আবাদ করে যারা ফসল ফলায় সেই সব চাষীর অবস্থা হিন্দুস্থানে খুব শোচনীয়। সুবাদার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তারা মানুষের মতন ব্যবহার পায় না। উপরের কর্তারা সকলেই তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করে এবং এই অত্যাচারের জ্বালায় অনেক সময় চাষীরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। সাধারণত নগরের দিকে তারা পালাবার চেষ্টা করে এবং সেখানে গিয়ে বোঝা বয়, ভিস্তির বা ঘোড়ার সহিসের কাজ করে। মধ্যে মধ্যে কোনো রাজার (বার্নিয়ের বোধ হয় এখানে দেশীয় হিন্দু সামন্ত রাজাদের কথা বলতে চেয়েছেন) রাজ্যে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কারণ তাদের ধারণা, বাদশাহের রাজত্ব ছেড়ে কোনো দেশীয় রাজার রাজ্যে গেলে অনেক বেশি সুখেস্বচ্ছন্দে থাকা যায়। দেশীয় রাজারা নাকি প্রজাদের উপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার করেন না।

দ্বিতীয়ত—মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একাধিক জাতির বসবাস আছে এবং সমস্ত জাতির সর্বময় কর্তা হলেন মোগল বাদশাহ। এই সব জাতির অনেকেরই নিজেদের 'প্রধান' 'নায়ক' বা 'রাজা' আছে। প্রধানরা ও রাজারা মোগল বাদশাহকে 'কর' দেন নামমাত্র। তাও আবার সকলে দেন না। কেউ দেন, কেউ দেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পেশ্‌কস' বা কর দেওয়াটা অতি নগণ্য ব্যাপার। বাদশাহের কাছে বশ্যতা স্বীকারের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আবার এমনও দু-চারজন রাজা আছেন যাঁরা 'কর' দেন না, বরং উল্টে আদায় করেন। তাঁদের কথাও বলব।

যেমন—পারস্যের সীমান্তে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে তারা কাউকেই কিছু দেয় না, পারস্যের রাজাকেও না, হিন্দুস্থানের বাদশাহকেও না। বেলুচি ও আফগানরা তো বাদশাহকে কিছুই দেয় না এবং নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে করে। মোগল বাদশাহ যখন কান্দাহার অবরোধ করার জন্য সিন্ধু থেকে কাবুল অভিযান করেছিলেন তখন এইসব বেলুচি ও আফগানদের উদ্ধত ও গর্বিত

আচরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। পাহাড় থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তারা সেনাবাহিনীর অভিযান একরকম বন্ধ করে দিয়েছিল এবং শেষে পুরস্কার আদায় করে তবে ছেড়েছিল।

পাঠানরাও খুব দুর্ধর্ষ জাতি। একসময়ে তারাও হিন্দুস্থানে রাজত্ব করেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মোগলরা ভারতে অভিযান করার আগে পাঠানরা হিন্দুস্থানের অনেক জায়গায় বেশ ঘাঁটি তৈরি করে বসেছিল। প্রধানত তাদের শাসনকেন্দ্র ছিল দিল্লী এবং আশপাশের প্রতিবেশী রাজারা (হিন্দু রাজা) পাঠানদের 'কর'ও দিতেন। হিন্দুস্থান মোগলদের অধিকারে আসার পরেও, পাঠানরা সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। বিভিন্ন স্থানে তারা রীতিমত শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের নানাভাবে নাজেহাল করে তাদের অভিযান প্রতিরোধ করেছিল। মোগল আমলে তাই পাঠানরা তাদের সেই স্বাধীন রাজ্য-পরিচালনার কথা বিস্মৃত হতে পারেনি সহজে জাত হিসাবেও তাই তারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়, এমন কি পাঠান ভিস্তিরা ও অন্যান্য দাসানুদাসরাও আচার-ব্যবহারে রীতিমত উদ্ধত।* পাঠানরা প্রায় কথায় কথায় বলে যে একদিন দিল্লীর সিংহাসন আবার তারা দখল করতে পারে। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক লোককে, সে হিন্দুই হোক, আর মোগলই হোক, তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তারা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে মোগলদের, কারণ মোগলরাই তাদের দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত করে দেশ থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সব পাহাড় অঞ্চলে পাঠানরা এখনও স্বাধীনভাবে বসবাস করে, তাদের নিজেদের প্রধান ও অন্যান্য রাজাদের অধীনে। কারও কোনো হুকুম তারা মানতে চায় না, কারও বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। অবশ্য স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তারা যে খুব ক্ষমতাশালী তা নয়।

বিজাপুরের রাজাও মোগল সম্রাটকে কোনো কর দেন না এবং তাঁর সঙ্গে বাদশাহের বিরোধ ও সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকত। তিনি তাঁর সৈন্যবলের জন্য যতটা না শক্তিশালী, তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী আরও অন্যান্য কারণে।

* দিল্লীর পাঠান সুলতানেরা ১১৯২ খ্রীঃ অঃ থেকে ১৫৫৫ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর রাজত্বকালের মধ্যে ছয়টি রাজবংশ ও চল্লিশজন রাজা রাজত্ব করেন। কখনও তাঁদের রাজ্যের সীমানা পূর্ববঙ্গের প্রান্ত থেকে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কখনও বা তাঁরা কয়েকটি জেলার অধীশ্বর ছিলেন মাত্র দেখা যায়।—অনুবাদক

আগ্রা ও দিল্লী থেকে তাঁর রাজ্য অনেক দূরে, মোগল সম্রাটের শাসনকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই। বিজাপুর রাজধানী অন্য কারণেও অনেকটা নিরাপদ বলা চলে। জলের ব্যবস্থা খুব খারাপ এবং সৈন্যদের কুচকাওয়াজের উপযোগী বিশেষ খোলা জায়গাও নেই চারপাশে। কতকটা দুর্গের মতন রাজার রাজধানী। এই কারণে অন্যান্য রাজারাও যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, শুধু ঐ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য। সুরাট বন্দর লুঠতরাজ করার পর শিবাজীও তাই বলেছিলেন।

রাজপুতদের শৌর্যবীর্য

গোলকুণ্ডার রাজাও খুব শক্তিশালী, বিজাপুররাজের মিত্র। বিজাপুরের রাজাকে তিনি অর্থ ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন গোপনে। এইরকম আরও শত শত রাজা-রাজড়া ও জমিদার আছেন যাঁরা সম্রাটকে কোনোরকম কর দেন না এবং প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁদের নিজস্ব রাজ্য ও এলাকায় প্রভুত্ব করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ শক্তিশালী, নিজেদের সৈন্যসামন্তও তাঁদের আছে এবং স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাঁদের যথেষ্ট। আগ্রা ও দিল্লী থেকে কেউ কাছে, কেউ দূরে থাকেন। এদের মধ্যে পনের ষোলজন রাজার ধনৈশ্বর্য ও সামরিক শক্তি খুব বেশি, বিশেষ করে চিতোরের রাণার, রাজা জয়সিংহের ও রাজা যশোবন্ত সিংহের। এই তিনজন রাজা যদি একবার হাত মিলিয়ে একত্রে কোনো অভিযান করার সংকল্প করেন তাহলে মোগল সম্রাটের সিংহাসন তাঁরা টলিয়ে দিতে পারেন। এরকম দুর্ধর্ষ তাঁদের শক্তি। প্রত্যেক রাজা ইচ্ছা করলে প্রায় বিশহাজার অশ্বারোহী রাজপুত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করতে পারেন এবং সারা হিন্দুস্থানে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। রাজপুত অশ্বারোহীদের শৌর্যবীর্যের কথা হিন্দুস্থানের কারও অজানা নেই। এই রাজপুত সৈন্যদের কথা পরে আরও বিশদভাবে বলব। রাজপুতরা পুরুষানুক্রমে যোদ্ধার জীবন যাপন করে। রাজার কাছ থেকে জমিজমা জায়গীর পায় এবং বংশানুক্রমে রাজার অধীনে সৈনিকের কাজের বিনিময়ে সেই জায়গীর ভোগ করে। যুদ্ধ ও বীরত্ব তাদের রক্তের মধ্যে আছে। এরকম কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক জাত হিন্দুস্থানে খুব অল্পই দেখা যায়। সৈন্য হিসাবে, যোদ্ধা হিসাবে তাদের সমকক্ষ আর বিশেষ কেউ নেই।

তৃতীয়ত—মোগল সম্রাট মুসলমান হলেও সুন্নী' সম্প্রদায়ভুক্ত। তুর্কীদের মতন তারা বিশ্বাস করেন যে ওসমান হলেন মহম্মদের উত্তরাধিকারী। সম্রাটের পার্ষদ ও সভাসদরা, আমীর ও ওমরাহরা হলেন অধিকাংশই 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা আলির উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, পারসীদের মতন। তাছাড়া মোগল সম্রাট হিন্দুস্থানে অনেকটা বিদেশীর মতন বলা চলে। তাঁরা তৈমুরের বংশধর এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁরা ভারতবর্ষ জয় করেন। সুতরাং মোগল' হিন্দুস্থানে চারিদিকেই শত্রু-পরিবেষ্টিত। হিন্দুস্থানের একশজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন 'মোগল' আছে কিনা সন্দেহ। শতকরা একজন মুসলমান আছে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং হিন্দুস্থানে নিরাপদে রাজত্ব করা ও বসবাস করা মোগলদের কাছে একটা সমস্যার ব্যাপার। ঘরে শত্রু, বাইরেও শত্রু। ঘরে দেশীয় রাজারা প্রবল শত্রু, বাইরে পারস্য থেকে আক্রমণের আশঙ্কাও আছে। ঘরে-বাইরে এইভাবে শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার জন্য মোগল সম্রাটরা সর্বদা নিরাপত্তার ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন। এজন্য তাঁদের বিশাল সেনাবাহিনী সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়। সঙ্কটের সময় তো হয়ই, শান্তির সময়ও হয়। এদেশের লোকদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। তার মধ্যে অধিকাংশই রাজপুত ও পাঠান এবং বাকি হল মোগল সৈন্য। এখানে 'মোগল' কথাটা অবশ্য একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে কোনো শ্বেতাঙ্গ বিদেশী ব্যক্তি মুসলমানধর্মী হলেই 'মোগল' বলে পরিচিত হন। আসল 'মোগল' কিন্তু 'মোগল' বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে খুব অল্পই আছে। রাজদরবারেও বিশেষ নেই। উজবেক, পারসী, আরবী, তুর্কী সকলেরই বংশধররা এখন 'মোগল' নামে অভিহিত হন। এই প্রসঙ্গে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, এই সব তথাকথিত 'মোগল'রা এদেশে কিছুদিন বসবাস করার পর আর তেমন মর্যাদা পান না। তাঁদের বংশধররা অনেকটা এদেশী হয়ে যান, সম্রাটের কাছে তাঁদের মোগলাই মর্যাদার জৌলুষও অনেকটা ম্লান হয়ে যায় এবং নবাগত বিদেশী মুসলমানরা মোগলাই আভিজাত্যের তকমা এঁটে ঘুরে বেড়ান। দু-তিন পুরুষের মধ্যে তথাকথিত 'মোগল'দের বংশধররা এমন এক সাধারণের স্তরে নেমে আসেন যে তখন মোগল সেনাবাহিনীতে সামান্য পদাতিক বা অশ্বারোহী হতে পারলেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন। এই হল মোগলদের পরিচয়।

মোগল সেনাবাহিনীর কথা

এইবার মোগল সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আপনাকে দু'চার কথা বলব। কি পরিমাণ অর্থব্যয় যে সৈন্যদের জন্য করা হয় তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রথমে হিন্দুস্থানের সৈন্যদের কথা বলি।

হিন্দুস্থানের সৈন্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের রাজপুত সৈন্যরা। এই দুজন এবং অন্যান্য আরও রাজাদের মোগল সম্রাট যথেষ্ট টাকা দেন। টাকা দিয়ে তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা সংখ্যাকে নিজের কাজের জন্য নিযুক্ত রাখেন। অর্থাৎ রাজারা মোগল সম্রাটের অর্থের বিনিময়ে রাজপুত সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তাকে সাহায্য করেন। অর্থ অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। বিদেশী ও মুসলমান ওমরাহদের সমান মর্যাদা রাজারা পান। ওমরাহদের অধীনেও নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য থাকে এবং সেই সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী তাঁরা জায়গীর ও তনখা পান। একাধিক কারণে এই দেশীয় রাজাদের এইভাবে হাতে রাখার দরকার হয়।

প্রথম কারণ হল, রাজপুত সৈন্য হিসাবে চমৎকার, তাদের বীরত্বের তুলনা হয় না। আগেই বলেছি, এই রাজারা ইচ্ছা করলে একদিনে প্রত্যেকে বিশ হাজারের বেশি সৈন্য মোতায়েন করতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ হল, এই রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁরা কেউ মোগল সম্রাটের বেতনভুক্ নন, কোনো হুকুমের ধার ধারেন না। 'কর' দিতে বললে তাঁরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন এবং যুদ্ধে যোগ দিতে বললে আদেশ অগ্রাহ্য করেন। এ হেন রাজাদের যদি ফিকির-ফন্দি করে কিছুটা তাঁবে রাখা যায়, তাহলে মোগল সম্রাটের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবার কথা নয়।

তৃতীয় কারণ হল, এই রাজাদের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারলে মোগল সম্রাটের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা। তাঁর রাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্যও তাই। তিনি সব সময় চেষ্টা করেন দেশীয় রাজাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। একজন রাজাকে বেশিমাত্রায় তোষণ করে উপঢৌকন দিয়ে অন্যান্য রাজাদের বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে এই বিদ্বেষ থেকে, তাঁদের সৈন্যক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং তাঁরা দুর্বল হয়ে যান। তাতে মোগল সম্রাটের শক্তি ও নিরাপত্তা বাড়ে। এই কারণেও অনেক সময় মোগল সম্রাট দেশীয় নৃপতিদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

চতুর্থ কারণ হল, এই দেশীয় রাজারা দলে থাকলে পাঠানদের জব্দ করার সুবিধা হয় এবং বিদ্রোহী ওমরাহদের সায়েস্তা করা যায়।

পঞ্চম কারণ হল, গোলকুণ্ডার রাজা যখন কর দিতে চান না অথবা বিজাপুর বা অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে চক্রান্তে সাহায্য করতে চান, তখন এই দেশীয় রাজাদের পাঠানো হয় তাঁকে জব্দ করার জন্য। সিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ওমরাহদের পাঠাতে সম্রাট ভরসা পান না।

ষষ্ঠ কারণ হল, পারসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এই দেশীয় রাজাদের উপর মোগল সম্রাট সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন। তার কারণ তাঁর ওমরাহরা অধিকাংশই পারসী এবং তাঁরা নিজেদের দেশের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে রাজী হন না। তাঁদের ইমাম বা খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাঁরা কাফেরের হীন কাজ বলে মনে করেন। সুতরাং পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে মোগল সম্রাটের পক্ষে এই দেশীয় রাজাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই কারণেও রাজাদের স্বপক্ষে রাখার দরকার হয়।

যে কারণে মোগল সম্রাট রাজপুতদের স্বপক্ষে রাখতে বাধ্য হন, অনেকটা সেই একই কারণে পাঠানদেরও তিনি নিজের দলে রাখতে চান। এছাড়া, বিশাল মোগল সেনাবাহিনীও তাঁকে নিযুক্ত রাখতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতেও তিনি বাধ্য হন। এই সেনাবাহিনীরও কিছুটা বিস্তারিত পরিচয় দিচ্ছি।

প্রধানত পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই সেনাবাহিনী গঠিত। একদল সৈন্য সব সময় সম্রাটের নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছেই রাখা হয়, আর বাকি সৈন্যরা বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদারদের অধীনে ছড়িয়ে থাকে। অশ্বারোহী সৈন্যের মধ্যে সম্রাটের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যারা তৈরি থাকে তাদের কথা প্রথমে বলছি। এই অশ্বারোহীরা ওমরাহ, মনসবদার, রৌশিনদার প্রভৃতির অধীনে বহাল থাকে। অশ্বারোহী সৈন্য ছাড়াও পদাতিক সৈন্য আছে এবং গোলন্দাজবাহিনীর মধ্যে পদাতিক গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী গোলন্দাজ আছে। তাদের কথাও একে-একে বলব।

একথা ভাববেন না যে রাজদরবারের ওমরাহরা বনেদি পরিবারের বংশধর, ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণীর মতন। আদৌ তা নয়। হিন্দুস্থানের সম্রাটই যেহেতু, সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক, সেইজন্য সেখানে ইয়োরোপের মতন 'লর্ড' বা 'ডিউক'রা গজিয়ে ওঠার সুযোগ পাননি। বিরাট কোনো সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব বংশপরম্পরায় ভোগ করে কোনো পরিবার হিন্দুস্থানে প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ

করবার সুযোগ পান না, সম্রাটের সভাসদরা সকলে ওমরাহদের বংশধরও নন। সম্রাট সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে কোনো ওমরাহদের মৃত্যু হলে তাঁর ধন-সম্পত্তির মালিক হন সম্রাট। আমীর পরিবারের আভিজাত্য একপুরুষ, কি দুইপুরুষের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং তার পুত্র বা পৌত্ররা প্রায় ভিক্ষুকশ্রেণীর স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হন। তখন তাঁরা সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সাধারণ অশ্বারোহী সৈন্যদলে নাম লেখান। সম্রাট অবশ্য সাধারণতঃ মৃত আমীরের পত্নী ও নাবালকদের একটা ভাতার বন্দোবস্ত করে দেন, কিন্তু সেটা আমীর আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর যদি কোনো আমীর সৌভাগ্য-ক্রমে দীর্ঘায়ু হন তাহলে তার জীবদ্দশায় তিনি চেষ্টা করে হয়ত তাঁর পুত্রদের একটা ভাল ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারেন। সেটা আর কিছু নয়, কোনোরকমে সম্রাটের সুনজরে এনে আমীরনন্দনদের কোনো যোগ্য পদে বহাল করে যেতে পারেন। কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা করে যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাও আবার তার জন্য আমীরনন্দনের সুদর্শন শ্রী থাকা দরকার, যাতে তাঁকে দেখলে বনেদী মোগলবংশজাত বলে মনে হয়। তা না হলে সম্রাটের নেকনজরে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সাধারণতঃ অবশ্য সম্রাট হঠাৎ কাউকে কোনো উচ্চপদের মর্যাদা দিতে চান না। সাধারণ স্তর থেকে ক্রমে উচ্চস্তরে ধীরে ধীরে উঠতে হয় সকলকে। এইজন্য দেখা যায় মোগল দরবারের ওমরাহরা সকলে বনেদী বংশের সন্তান নন, কারণ বংশানুক্রমে আমিরী মর্যাদা ভোগ করা হিন্দুস্থানের খুব কম ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হয়। সাধারণতঃ ওমরাহরা বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর দল এবং অধিকাংশই অনভিজাতবংশজ। প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁরা ক্রীতদাসপুত্র এবং শিক্ষাদীক্ষার কোনো বালাই নেই তাঁদের। সেইজন্যই সম্রাট নিজেই মর্জি মাফিক তাঁদের পদমর্যাদায় ভূষিত করতে পারেন এবং টেনে নিম্নপদে নামিয়েও দিতে পারেন। মান-অপমান বোধ তাঁদের বিশেষ নেই।

ওমরাহদের কথা

ওমরাহরা কেউ 'হাজারী', কেউ 'দু-হাজারী', কেউ 'পাঁচ-হাজারী', কেউ 'সাত-হাজারী', কেউ 'দশ-হাজারী' ইত্যাদি পদমর্যাদাবিশিষ্ট। হাজার ঘোড়ার অধিনায়ক যিনি তিনি 'হাজারী', দু'হাজার ঘোড়ার যিনি তিনি 'দু'হাজারী' ইত্যাদি। হাজারী, দু-হাজারী, পাঁচ-হাজারী ইত্যাদি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বারো-হাজারীও কেউ কেউ আছেন, যেমন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে ওমরাহরা তনখা পান না, ঘোড়ার সংখ্যা অনুপাতে পান। যিনি যতগুলি ঘোড়ার মালিক, তাঁর তনখাও সেইরকম। সাধারণতঃ একজন সৈন্যের জন্য দুটি করে ঘোড়া বরাদ্দ থাকে। কথায় বলে, যার একটি মাত্র ঘোড়া, তার এক পা নাকি মাটিতেই থাকে। কিন্তু ওমরাহরা যে তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘোড়া পোষেন তা ভাববার কোনো কারণ নেই। যিনি যত হাজারী, সম্রাট তাঁকে সেই অনুপাতে তনখা দেন। সৈন্যদের বেতন বাবদও তিনি বরাদ্দ টাকা পান। এই বেতন থেকে তিনি অধিকাংশ নিজে আত্মসাৎ করেন। তাছাড়া যতগুলি ঘোড়া তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী রাখার কথা তা তিনি কোনোকালেই রাখেন না। যে তার 'রেজিস্টার' বা হিসাবের খাতাটিতে অবশ্য নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ ঠিকই থাকে এবং সেই ঘোড়ার খরচ বাবদ তাঁর যা প্রাপ্য তা তিনি আদায়ও করে নেন। ঘোড়ার বদলে বরাদ্দ টাকা তিনি নিজেই ভোগ করেন। কেউ কেউ নগদ টাকার বদলে জায়গীরও ভোগ করেন। অবশ্য বাইরে থেকে হাজারী' খিলাতের হাঁকডাক যতটা, আসলে তার অনেকটাই ফাঁকা ছাড়া কিছু নয়। দু হাজারী যিনি, তাঁর হয়ত আসলে দুশ ঘোড়া রাখার অধিকার আছে। সেই দুশ ঘোড়ার ভরণপোষণের খরচ তিনি পান। তাই থেকে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন। আমি নিজে যে আমীরের অধীনে কাজ করতাম, তিনি একজন 'পাঁচ হাজারী', কিন্তু তাঁর পাঁচশ ঘোড়া পোষার হুকুম ছিল। এই পাঁচশ ঘোড়ার বরাদ্দ টাকা থেকেও তিনি মাসে পাঁচ হাজার ক্রাউন আত্মসাৎ করতেন। তবু তো তিনি জায়গীরভোগী ছিলেন না, নগদী ছিলেন, অর্থাৎ নগদ টাকায় তাঁর বেতন দেওয়া হত। জায়গীরভোগীদের উপরি আয়ের যথেষ্ট সুযোগ থাকে, প্রচুর আয় তাঁরা করেনও। কিন্তু নগদীদের সে-সুযোগ খুব কম থাকে। তবু তাই থেকেও তাঁরা অল্প ঘোড়া পুষে, খাতাপত্রে ঘোড়ার হিসেব ঠিক দেখিয়ে, যথেষ্ট উদ্বৃত্ত টাকা নিজেরাই আত্মসাৎ করেন। এত আয়ের সুযোগ থাকা সত্বেও ওমরাহদের মধ্যে ধনী ব্যক্তি খুব অল্পই আমার নজরে পড়েছে। আমি যাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দেনার দায়ে জড়িত। অন্যান্য দেশের লর্ড বা ডিউকদের মতন তাঁরা যে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এরকম দুরবস্থার মধ্যে পড়েন তা নয়। অধিকাংশ ওমরাহের শোচনীয় দুর্দশার কারণ হল, বছরে একাধিক উৎসব-পার্বণে তাঁদের ভেট দিতে হয় সম্রাটকে এবং তার জন্য বেশ মোটা টাকা ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া অধিকাংশ

ওমরাহকে অত্যধিক স্ত্রী, চাকরবাকর, উট, ঘোড়া ইত্যাদি প্রতিপালন করতে হয়। প্রধানতঃ এই দুই কারণে তাঁরা সর্স্বান্ত হয়ে যান।

বিভিন্ন প্রদেশে, সেনাবাহিনীতে ও রাজদরবারে যথেষ্ট ওমরাহ আছেন। তাঁদের সংখ্যা ঠিক কত, তা আমি বলতে পারব না, তবে সংখ্যা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কিছু নেই। রাজসভার ওমরাহের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশজনের মধ্যে, তার বেশি না। সকলেই প্রায় মোটা টাকা আয় করেন এবং আয়ের মাত্রা তাঁদের ঘোড়ার সংখ্যার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ঘোড়ার সংখ্যা এক থেকে বারো হাজার পর্যন্ত হতে পারে। এই ওমরাহরাই হলেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বড় বড় রাজকার্যের দায়িত্ব ও রাজকীয় মর্যাদা তাঁরাই পান। রাজসভায়, প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে সর্বত্র তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। ওমরাহদের মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বলা যায়। তাঁরা রাজদরবারে জাঁকজমক বজায় রেখে চলেন, কখনও তাঁদের পথেঘাটে সাধারণের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখা যায় না।

বাইরে যখন তাঁরা যান তখন রাজকীয় পোশাকপরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে যান। জমকালো পোশাক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কখনো যান হাতির পিঠে চড়ে, কখনো বা ঘোড়ার পিঠে। মধ্যে মধ্যে পাল্কিতে চড়েও যেতে দেখা যায়। যখনই যেভাবে যান না কেন, বাইরে যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে একদল অশ্বারোহী সৈন্য থাকে। তাছাড়া একদল চাকর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। আগে যায় একদল, পথের লোকজন সরাতে সরাতে, ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে মশা-মাছি ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। দুই পাশে যায় দুই দল চাকর, কেউ পিকদানী, কেউ পানীয় জল, কেউ হিসেবের খাতা ইত্যাদি নিয়ে। এইভাবে ওমরাহরা বাইরে পথে চলেন। প্রত্যেক আমীরকে প্রত্যহ রাজদরবারে দুবার করে হাজরে দিতে হয়। একবার বেলা দশটা-এগারোটার সময়, সম্রাট যখন বিচার করতে বসেন, আর একবার সন্ধ্যা ছ'টায়। প্রত্যেক আমীরকে সপ্তাহে অন্ততঃ পুরো একদিন (২৪ ঘণ্টা) পালাক্রমে দুর্গ পাহারা দিতে হয়। যাঁর যখন পাহারা দেবার পালা পড়ে তিনি তখন নিজের যাবতীয় আসবাবপত্র শয্যাদ্রব্যাদি সঙ্গে করে নিয়ে যান। সম্রাট শুধু তাঁদের আহারের ব্যবস্থা করেন। নিচে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে, ধীরে ধীরে সেই হাত উপরে তুলে 'তছলিম' করে তিনি সম্রাটের সেই প্রেরিত খাদ্য গ্রহণ করেন।

সম্রাটের বিলাসভ্রমণ

মধ্যে মধ্যে সম্রাটও বিলাসভ্রমণে যান, পালকি করে হাতির পিঠে বা 'তখৎ-রওয়ানে' চড়ে। তখৎ রওয়ান ভ্রাম্যমাণ সিংহাসন, সম্রাটের ভ্রমণের জন্যই তৈরি করা। আটজন বেহারা তখৎ কাঁধে করে ছুটে চলে, আরও আটজন সঙ্গে থাকে মধ্যে মধ্যে কাঁধ বদলাবার জন্য। সম্রাট যখন ভ্রমণে যাবেন, তখন ওমরাহরা তাঁর সঙ্গে যাবেন, এই হল প্রথা। অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অন্য কোনো বিশেষ গুরুতর কারণ ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। সম্রাট পালকিতে, হাতির পিঠে বা তখৎ রওয়ানে চড়ে যাবেন, ওমরাহরা অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর অনুগমন করবেন। ঝড় বাদল ধুলো উপেক্ষা করেই তাদের যেতে হবে। সব সময় সম্রাট চারিদিকে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে বাইরে চলবেন, যখনই হোক—শিকারের সময়ই হোক, যুদ্ধযাত্রার সময় হোক বা নগর থেকে নগরান্তরে যাত্রাকালেই হোক। যখন সম্রাট রাজধানীর কাছাকাছি কোথাও শিকারে যান, বাগানবাড়ি বা প্রমোদভবনে যান অথবা মসজিদে যান, তখন খুব বেশি আমীর ওমরাহ, সাঙ্গোপাঙ্গ দাসদাসী নিয়ে যান না। সেদিনে যে ওমরাহদের পাহারা দেবার পালা পড়ে, কেবল তাঁদেরই তখন সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

মনসবদারের মর্যাদা

মনসবদাররাও* ঘোড়া রাখতে পারেন এবং তাঁরাও তনখা পান। পদমর্যাদা তাঁদেরও আছে, তনখাও তাঁদের অল্প নয়। ওমরাহদের সমান তনখা না হলেও, সাধারণ কর্মচারীদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি তনখা পান। সেইজন্য মনসবদারদের ক্ষুদে ওমরাহ বলা হয়। সম্রাট ছাড়া তাঁরা আর কারও অধীন নন এবং ওমরাহদের মতন তাঁদেরও কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজকর্তব্য পালন করতে হয়। ঘোড়া রাখার অধিকার থাকলে তাঁরা স্বচ্ছন্দে ওমরাহদের সমকক্ষ হতে পারতেন। আগে এ অধিকার তাঁদের ছিল, এখন তাঁদের দুটি, চারটি বা ছটি ঘোড়া রাজকীয় মর্যাদার প্রতীকরূপে রাখার অধিকার আছে। মনসবদারদের বেতন মাসিক দেড়শত টাকা থেকে সাতশত টাকা পর্যন্ত। তাঁদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়,

* আরবী ও ফার্সী ভাষায় 'মনসব' কথার অর্থ 'office' বা 'পদ'। 'মনসবদার' কথার অর্থ 'অফিসার' বা পদস্থ কর্মচারী। আকবর বাদশাহ মনসবদারের সংখ্যা ৬৬ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী'—প্রথম খণ্ড)।

তবে ওমরাহদের চেয়ে অনেক বেশি। বিভিন্ন প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে মনসবদার অনেক আছেন রাজদরবারেও তাঁদের সংখ্যা দু'তিন শ'র কম নয়।

রোজিনদার বা পদাতিক

রোজিনদাররাও পদাতিক বাহিনীর অন্তর্গত। যারা রোজ বেতন পায় তাদেরই 'রোজিনদার' বলে। রোজ বেতন পেলেও, তাদের বেতন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 'মনসবদার'দের চেয়ে বেশি। বেতন ও পদমর্যাদা অবশ্য স্বতন্ত্র, সম্মান বা মর্যাদার দিক দিয়ে মনসবদারদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। রাজপ্রাসাদের ব্যবহৃত কার্পেট বা অন্যান্য আসবাবপত্র যা মনসবদাররা নিজেদের জন্য ব্যবহারের সুযোগ পান, রোজিনদাররা তা পায় না। এই সব আসবাবপত্রের সম্মানমূল্য অনেক সময় যথেষ্ট বেশি ধার্য করা হয়। রোজিনদাররা সংখ্যায় অনেক বেশি। সম্রাটের দপ্তরখানায় তারা নানারকমের ছোটখাটো কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। কেরানীর কাজও অনেকে করে। অনেকে সম্রাটপ্রদত্ত বরাতের উপর দস্তখতের ছাপ দেবার কাজ করে। বরাত হল টাকা দেবার আদেশপত্র।[১] এই সব 'বরাত' দেবার সময় তারা উৎকোচ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাধারণ অশ্বারোহীরা ওমরাহদের অধীন থাকে। দুই শ্রেণীর অশ্বারোহী আছে।

১। 'বরাত' কতকটা আধুনিক কালের 'pay order'-এর মতন। ঠিক একালের ব্যাঙ্কের চেকের মতন না হলেও, 'বরাত'কে অনেকটা মোগলযুগের চেকও বলা যায়। কি কাজের জন্য কত টাকা দেওয়া হচ্ছে, বরাতে তাই লেখা থাকত এবং বাদশাহের স্বাক্ষরসহ মোহরাঙ্কিত থাকত প্রত্যেকটি 'বরাত'। অনেক হাত ঘুরে, অনেক কর্মচারীর স্বাক্ষর-চিহ্নিত হয়ে তবে বরাতের বিনিময় নগদ টাকা পাওয়া যেত। বরাত' সম্বন্ধে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, রাজার কারখানার কারিগরদের এবং পিলখানা অশ্বশালা উষ্ট্রশালা ইত্যাদি বিভাগের কর্মচারীদের বরাতের মারফত বেতন দেওয়া হত। বরাতের হিসেব দেখে দেওয়ান তনখার ব্যবস্থা করে দিতেন এবং পাশে লিখে দিতেন বরাত-নবীসন্দ। মুস্তফী মুলারেফ তাই দেখে একটি 'কবচ' তৈরি করে দিতেন। 'কবচ' কথাটি ফার্সী কথা, অর্থ হল কর বা হাতের তালু। কবচ থেকে কব্জা কথা এসেছে। কবচপত্র পেলে বোঝা গেল, উদ্দেশ্য হস্তগত হয়েছে। 'কবচ' কতকটা 'প্রমিসারী নোট' ও 'রসিদে'র সংমিশ্রণ বলা চলে। এখন জমিদাররা 'কবচ' বা দাখিলা দিয়া থাকেন, কিন্তু বাদশাহী আমলে কবচ একালে গবর্ণমেণ্ট নোটের মতন ব্যবহৃত হত।

যাই হোক, মুস্তফী কবচ করে দেন, তাতে দেয় টাকার কথা লেখা থাকে। সেই টাকার এক-চতুর্থাংশ কেটে নেওয়া হয়। পরে কবচ ও বরাত উভয়পত্রে তৌজীনবীশ, মুস্তফী, নাজীর, দেওয়ান, উকিল প্রভৃতি সকলে দস্তখত করেন। তারপর বাদশাহের পাঞ্জা ও মোহরের ছাপ পড়ে। পাঞ্জামোহরের পাশে লেখা থাকে, কোন্ শ্রেণীর মুদ্রায় টাকা দেওয়া হবে।—অনুবাদক

প্রথম শ্রেণীর অশ্বারোহীরা দুটি করে ঘোড়া রাখে এবং ঘোড়ার পায়ে ওমরাহদের মোহরাঙ্কিত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বারোহীরা একটি মাত্র ঘোড়া রাখে। প্রথম শ্রেণীর অশ্বারোহীদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে বেশি এবং তাদের তনখাও বেশি। ওমরাহদের ব্যক্তিগত মর্জি ও উদারতার উপর সৈন্যদের বেতন অনেকটা নির্ভর করে। অবশ্য বাদশাহের হুকুমে প্রত্যেক অশ্বারোহীর (একটি অশ্বের রক্ষক) অন্ততঃ পঁচিশ টাকা মাসিক বেতন পাওয়া উচিত।[২] এই বেতনের হারেই ওমরাহদের সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হয়।

পদাতিক ও বন্দুকচি

পদাতিক সৈন্যেরা সবচেয়ে অল্প বেতন পায়। শোচনীয় অবস্থা হল গাদা-বন্দুকধারীদের। মাটিতে শুয়ে পড়ে যখন তারা তাদের বন্দুক ব্যবহার করে তখন তাদের অবস্থা দেখলে করুণা হয় মনে। তারাও ভয় পেয়ে যায়। চোখ দুটো তাদের বিস্ফারিত হয়ে থাকে। যাদের লম্বা দাড়ি আছে, তারা দাড়িতে আগুন লাগার ভয়ে ঘাবড়ে যায়। তাছাড়া, জিন্‌পরীদের ভয় তো আছেই। বন্দুকচিদের ধারণা যে জিন্‌দৈত্যদের চক্রান্তে গাদাবন্দুক ফেটে গিয়ে আগুন ধরে যেতে পারে। তাই বন্দুকচিরা বন্দুকের চেয়ে বেশি দাড়ি ও চোখ সামলাতেই ব্যস্ত থাকত যুদ্ধক্ষেত্রে। বেতন তাদের কারও কারও মাসিক কুড়ি টাকা, কারও পনের টাকা, কারও বা দশ টাকা মাত্র।

গোলন্দাজবাহিনী

কিন্তু গোলন্দাজবাহিনীর সৈন্যরা অনেক বেশি বেতন পেয়ে থাকে, বিশেষ করে বিদেশী পর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, জার্মান ও ফরাসী যারা তারা তো নিশ্চয়ই।

২। মোগল বাদশাহের আমলে যুদ্ধের অশ্ব চিহ্নিত করা হত এবং তাদের সাত ভাগে ভাগ করা হত সাধারণতঃ। যেমন—আরবী, ইরাকী, মোজন্নস, তুর্কী, ইযাবু, তাজী ও জঙ্গলী। যারা আরবী অশ্বারোহী তাদের বেতন ছিল প্রায় ৮০০ দাম (৫৫ দামে এক টাকা)। যারা ইরাকী অশ্বারোহী, তাদের বেতন ছিল ৬০৮ দাম, মোজন্নস অশ্বারোহীদের ৫৬০ দাম (ইরাকী ও তুর্কী অশ্বের সংমিশ্রণ-জাতকে মোজন্নস বলা হত), তুর্কী অশ্বারোহীদের ৪৮০ দাম, ইয়াবুদের ৪০০ দাম। তাজী ও জঙ্গলী ভারতবর্ষের অশ্ব। অশ্বারোহীদের বেতন ছিল ৩২০ দাম এবং জঙ্গলী অশ্বারোহীদের ২৪০ দাম। যারা টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সংবাদবাহকের কাজ করত, তারা ১৬০ দাম বেতন পেত। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)।

গোয়া ও অন্যান্য ডাচ ও ইংরেজ কুঠির পলাতক কর্মচারীরা বাদশাহের গোলন্দাজবাহিনীতে অনেকে যোগদান করত। এই সব ফিরিঙ্গী বা খৃস্টান গোলন্দাজরা অনেক বেশি বেতনও পেত। গোড়ার দিকে যখন গোলন্দাজসেনা সম্বন্ধে মোগল বাদশাহের বিশেষ ধারণা ছিল না, তখন তিনি রীতিমত উচ্চবেতন দিয়ে ফিরিঙ্গীদের নিয়োগ করতেন। সেই সময় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজরা সাধারণতঃ মাসিক দুই শত টাকা পর্যন্ত বেতন পেত। পরে যখন এদেশী লোক বেশ শিক্ষা পেয়ে গেল এবং গোলন্দাজবাহিনী গড়ে উঠলো, তখন বাদশাহ আর ফিরিঙ্গীদের এত টাকা বেতন দিতেন না। মাসিক ত্রিশ-বত্রিশ টাকা করে তারা বেতন পেত।*

কামান দু'রকমের আছে—ভারী ও হালকা কামান। ভারী কামান সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে আমি একবার স্বচক্ষে সম্রাটের সসৈন্যে রাজধানী থেকে লাহোরের পথে কাশ্মীরযাত্রা করতে দেখেছি এবং সেই সৈন্যদের সঙ্গে গোলন্দাজরাও ছিল মনে আছে। ভারী কামান প্রায় ৭০টি ছিল এবং দু'শ থেকে তিনশ উটের পিঠে সরঞ্জামসহ সেগুলি বহন করা হয়েছিল। কামানগুলি সব পিতলের তৈরি। যাত্রাপথে বাদশাহ কিভাবে শিকার করতেন নিছক আমোদের জন্য তা বাস্তবিকই বলবার মতন। প্রতিদিন কিছু-না-কিছু একটা শিকার তাঁর করা চাই ই চাই—সে যাই হোক। হয় কোনোদিন তিনি তাঁর নিজের শিকারের পক্ষীগুলি ছেড়ে দিতেন এবং তারা কিছু শিকার করে নিয়ে আসত। কোনোদিন তিনি নীল গাই শিকার করতেন নিজে, কোনোদিন বা সখ করে হরিণ শিকার করতেন নিজের পোষা নেকড়ের দল লেলিয়ে দিয়ে। আবার কখনও বাদশাহী মেজাজ হলে সিংহ শিকারও করতেন।

বাদশাহের কাশ্মীরযাত্রার সময় হালকা কামানধারীদেরও বেশ সুসজ্জিত দেখেছি। প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি হালকা কামান ছিল, সব পিতলের তৈরি। হালকা কামান প্রত্যেকটি সুন্দর একটি শকটের উপর বসানো এবং তার সঙ্গে গুলিগোলার বাক্স সাজানো। একটির পর একটি সারবন্দীভাবে সাজানো ছিল এবং তার উপর নানারকমের লাল পতাকা ঝুলছিল। দুটি করে বলিষ্ঠ ঘোড়া প্রত্যেক কামানের শকটের সঙ্গে যোতা ছিল টানার জন্য এবং পাশে আরও একটি করে ঘোড়া ছিল তার সঙ্গে। ভারী কামানধারী যারা তারা

* বিদেশী ইয়োরোপীয়দের সাহায্যে ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী গড়ে ওঠার এই ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।

রাজপথ বা সোজা সড়ক দিয়েই চলছিল, সব সময় যে বাদশাহের অনুগমন করছিল তা নয়। কারণ বাদশাহ সব সময় বাঁধা সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন না, মধ্যে মধ্যে আশপাশের সরু পথে ঢুকে পড়ছিলেন শিকারের সন্ধানে। সুতরাং ভারী কামানধারীদের পক্ষে সব সময় তাঁকে অনুগমন করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু হালকা কামানধারীদের তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করবার কথা এবং তারা করছিলও তাই।

প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্রাটের নিজস্ব সেনাবাহিনীর অন্যদিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই কেবল সংখ্যার দিক থেকে ছাড়া। প্রত্যেক জেলায় জেলায় ওমরাহ, মনসবদার, রোজিনদার সাধারণ সেনাদল পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী আছে। শুধু দাক্ষিণাত্যেই আছে প্রায় বিশ পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য রাজাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে খুব বেশি সৈন্য নয়। কাবুলে বাদশাহ যে সৈন্য রাখেন তার সংখ্যাও প্রায় বারো হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত এবং পারসী, বেলুচী ও সীমান্তের অন্যান্য জাতির অভিযান ও উপদ্রব প্রতিরোধ করবার জন্য এইরকম সৈন্য থাকে। বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যা আরও অনেক বেশি, কারণ বাংলাদেশে বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকে। এইরকম প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক অঞ্চলে বাদশাহী সৈন্য থাকে এবং স্থানের গুরুত্ব হিসেবে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। এই কারণে সারা হিন্দুস্থানে মোট সৈন্যসংখ্যা এত বেশি যে, বাইরে থেকে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। পদাতিক সৈন্যের কথা আপাততঃ বাদ দিয়ে বলা যায় যে, শুধু সম্রাটের অধীনে অশ্বারোহী সৈন্য আছে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার। এর সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা যোগ করলে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দু লক্ষ।

পদাতিক সৈন্যের বিশেষ গুরুত্ব নেই বলেছি। সম্রাটের অধীনে প্রায় পনের হাজার পদাতিক সৈন্য আছে, বন্দুকচি ও গোলন্দাজদের নিয়ে। এই সংখ্যা থেকে প্রদেশের পদাতিক-সংখ্যা সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক সময় সৈনিক, চাকরবাকর, খিদমতগার, খানসামা, দাসদাসী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক যারা সম্রাটের অনুগমন করে, তাদের সকলকেই পদাতিক নামে অভিহিত করা হয়। এর অর্থ কি, আমি ঠিক বুঝি না।[৩] যদি

৩। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ডাকহরকরা, তুতীগীর, পাল্কি-বেহারা, ভিস্তি প্রভৃতি সকলকেই পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হত।

এইভাবে পদাতিকের সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহলে সম্রাট যখন তাঁর রাজধানী ছেড়ে কোথাও যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে দু-লক্ষ থেকে তিন লক্ষ পদাতিক সৈন্য থাকে। সংখ্যার কথা শুনলে হয়ত আশ্চর্য হয়ে যাবেন। হবারই কথা। কিন্তু বাদশাহ যখন কোনো জায়গায় যান তখন তাঁর সঙ্গে কতরকমের জিনিস ও কতরকমের লোকলস্কর থাকে সে-সম্বন্ধে যদি কোনো ধারণা থাকত আপনার তাহলে আপনি একেবারেই আশ্চর্য হতেন না। সম্রাট যান, তাঁর সঙ্গে যায় তাবু, আসবাবপত্র, নানারকমের জিনিসপত্র, চাকরবাকর, দাসদাসী, সৈন্যদের জন্য প্রচুর জেনানা ইত্যাদি। এইসব লোকজন ও পটবহর বহন করার জন্য যায় অসংখ্য হাতি, ঘোড়া, উট, গরু, পাল্কি, চোপালা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র চলচ্চিত্র বলে মনে হয়। সম্রাট যেদেশে সর্বশক্তিমান মহাপুরুষ ও সর্বময় কর্তা, সম্রাট যেখানে দেশের সমস্ত ধনসম্পদের একমাত্র আইনসঙ্গত মালিক, সেখানে এরকম ঘটনা ঘটা কিন্তু মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। সেখানে রাজধানী প্রধানতঃ রাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং রাজা না থাকলে রাজধানী হতশ্রী হয়ে যায়। দিল্লী ও আগ্রা এইরকম রাজসবস্ব রাজধানী। রাজা থাকেন বলে তার শ্রী থাকে, রাজা না থাকলে শ্রীহীন হয়ে যায়। রাজধানী ছেড়ে রাজা যখন কোনো জায়গায় যান, তখন মনে হয় যেন গোটা রাজধানীটাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমীর-ওমরাহ, আমলা-অমাত্য, সেনাবাহিনী, সাঙ্গোপাঙ্গ, দাসদাসী, কারিগর-কারখানার সঙ্গে উষ্ট্রশালা, হাতিশালা, অশ্বশালা, সব সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। মনে হয় যেন রাজার সঙ্গে রাজধানীও চলেছে। রাজধানী একেবারে শূন্য হয়ে যায়। দিল্লী বা আগ্রা ঠিক প্যারিসের মতন শহর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির বলতে যা বোঝায়, দিল্লী আগ্রাকে অনেকটা তাই বলা চলে। শিবির গুটিয়ে সেনাপতি যেমন স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেন, তেমনি হিন্দুস্থানের সম্রাটও তাঁর রাজধানী গুটিয়ে নিয়ে অন্য স্থানে যান। এরকম রাজধানীকে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির ছাড়া কি বলা চলে?

সৈন্য ও আমলাদের বেতনের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। আমীর-ওমরাহ থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত সকলকে দু'মাস অন্তর বেতন দিতে হয়, না দিলে চলে না। কারণ সম্রাটের এই তনখার উপর জীবনধারণের জন্য তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। ফ্রান্সে যেমন কোনো জরুরী অবস্থায় বা জাতীয় সঙ্কটের সময় সম্রাট যদি তাঁর ঋণ দু-এক মাসের জন্য পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে

যেমন যে-কোনো কর্মচারী বা সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত নিজেদের সামান্য মজুত অর্থেও কোনোরকমে জীবনধারণ করতে পারে, হিন্দুস্থানে তা কেউ পারে না, সাধারণ সৈনিক বা কর্মচারীরা তো নয়ই, আমীর-ওমরাহরাও না। সম্রাটের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আয়ের কোনো উপায় নেই হিন্দুস্থানে। সম্পূর্ণ সম্রাটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সুতরাং নিয়মিত মাসিক তন্‌খার গুরুত্ব হিন্দুস্থানে অত্যধিক। সেনাবাহিনীর সৈন্যদের যদি তনখা দিতে দেরি হয় তাহলে হিন্দুস্থানে তার ফলাফল ভয়াবহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। প্রথমে তারা নিজেদের সামান্য পুঁজিপাটা যা কিছু সব বেচে ফেলে বাঁচার চেষ্টা করে। তারপর যখন সব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেনাদল ছেড়ে পলায়ন করে, বিদ্রোহ করে অথবা অনাহারে দলে-দলে মৃত্যু বরণ করে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য, দেখা যায় না এবং না দেখলে বিশ্বাসও করা যায় না। সিংহাসন নিয়ে হিন্দুস্থানের ঘরোয়া যুদ্ধের শেষ দিকে লক্ষ্য করেছি, অর্থাভাবে সৈন্যরা তাদের নিজেদের ঘোড়া পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে চেয়েছে। বিক্রি তারা করতে আরম্ভ করত, যদি আরও কিছুদিন ঘরোয়া লড়াই চলত। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার একেবারেই কিছু নেই। কারণ, আপনি হয়ত জানেন না যে মোগল সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য ও সেপাই বিবাহিত। তাদের পুত্রকন্যা আছে, পরিবার আছে, ঘরবাড়ি, দাসদাসী সবকিছু আছে। সকলেই তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে জীবিকার জন্য, অর্থাৎ তাদের মাসিক তন্‌খার দিকে। হিসেব করলে দেখা যায়, এইভাবে কয়েক লক্ষ লোক, স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে সকলে সরকারী কর্মচারীদের মাসিক বেতনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে জীবন যাপন করে। জানি না, কোনো রাজার রাজকোষ থেকে এত লোকের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব কি না?

মোগল বাদশাহের অন্যান্য খরচের কথা আমি এখনও উল্লেখ করিনি। দিল্লী ও আগ্রাতে বাদশাহ সব সময়ের জন্য প্রায় দু তিন হাজার সুন্দর বাছা-বাছা ঘোড়া আস্তাবলে রেখে দেন। তাছাড়া প্রায় আট ন শ' হাতি এবং কয়েক হাজার টাট্টু, কাহার, বেহারা ইত্যাদিও থাকে সম্রাটের বড় বড় তাঁবু ও তার সরঞ্জামাদি বহন করার জন্য।[৪] বেগমসাহেবারা ও জেনানারাও বাদশাহের সঙ্গে যান। তার

৪। তাঁবু অনেক রকমের ছিল বাদশাহী আমলে। 'আইন-ই-আকবরী'তে তার খানিকটা বিবরণ পাওয়া যায়। আকার ও রকমভেদে তাঁবুর নাম ছিল নানারকম, যেমন—বরগা, 'চৌবীনরৌতি, ডুরাসলা-মঞ্জেল, খাটগা, সরাপর্দা, সামীয়ানা ইত্যাদি। 'বরগা' বিরাট তাঁবু, নিচে অন্ততঃ দশ হাজার লোক দাঁড়াতে পারত। 'বরগা' তাঁবু এক হাজার লোক সাতদিনে খাটাতে

সঙ্গে যায় গঙ্গার জল ও হরেকরকমের জিনিসপত্র।[৫] এত জিনিস, এত সাজ-সরঞ্জাম, এত বিলাসসামগ্রী কোনো সম্রাটের দরকার হয় না কখনও। এর সঙ্গে যদি আবার হারেম বা বেগমখানার খরচের কথা বলি তাহলে আপনার কাছে রূপকথার কাহিনী বলে মনে হবে। দামী দামী সোনারুপোর কাজ করা কাপড়-চোপড় রেশম, মণিমুক্তা, মৃগনাভি, সুগন্ধি আতর ইত্যাদি হারেমখানার জন্য অজস্র আমদানি করা হত।[৬]

পারত। 'চৌবীনরৌতি' দশটা খুঁটির উপর টাঙানো হত। তাঁবুর নিচে খস্‌খসের চাল দেওয়া থাকত এবং সঙ্গে খস্‌খস ও বেণা বোনা থাকত। খস্‌খসের বেড়ার উপর ভাল কিংখাব ও মলমল আঁটা থাকত। উপরে চাঁদোয়ার মতন লাল সুলতানী বনাত দেওয়া হত। চৌবীনরৌতি তাঁবু টাঙাবার জন্য রেশমের ও তসরের দড়ি ব্যবহার করা হত। দোতলা তাঁবুর নাম ছিল 'ডুরাসনা-মঞ্জেল', আট-নটা খুঁটির উপর দাঁড় করানো। উপর তলায় বাদশাহ নমাজ পড়তেন, নিচের তলায় বেগমরা থাকতেন। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংকলিত)—অনুবাদক।

৫। মোগল বাদশাহরা পানি-বিশারদও ছিলেন। পানীয় জল, স্নানের জল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের বিলাসিতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। 'আইন-ই-আকবরী'তে এ সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ আছে। সরকারী দফতরখানায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল যার কাজ ছিল পানীয় জল ঠাণ্ডা করা ও বরফ আমদানি করা ইত্যাদি সম্বন্ধে তদারক ও ব্যবস্থা করা। সেই বিভাগের নাম ছিল—'আবদারখানা'। সাধারণতঃ সোরা দিয়ে বাদশাহের পানীয় জল ঠাণ্ডা করা হত। বালি ও মাটির তৈরি কুঁজোতে জল ভরে, তার মুখে ভিজে কাপড় বেঁধে একটা বড় গামলায় রাখা হত। সেই গামলায় জল থাকত এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে সোরা মেশানো থাকত। কুঁজোর গলায় তিনপাক রেশমের দড়ি দিয়ে, ঠিক যেমন করে মন্থনদণ্ড ঘোরানো হয়, তেমনি করে কুঁজো ঘোরানো হত। খানিকক্ষণ ঘোরালেই কুঁজোর জল খুব ঠাণ্ডা হত। একে 'গড়গড়ি'র জল বলত। 'হর্ষচরিতে' এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাদশাহের পাকশালায় গঙ্গা ও যমুনার জল ব্যবহার করা হত। পাঞ্জাবের কাছে থাকলে হরিদ্বার থেকে জল আনা হত, আগ্রায় থাকলে জল আসত প্রয়াগ থেকে। হিমালয়ের কাছ থেকে বরফও আমদানি করা হত। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)—অনুবাদক।

৬। হারেম বা বেগমখানারও সুন্দর বিবরণ আছে 'আইন-ই-আকবরী'তে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হারেম, তার মধ্যে এক-এক দল বেগমের জন্য এক-একটা মহল তৈরি থাকে। দু-তিনটি মহলের মধ্যে একটি করে বাগান, পুষ্করিণী ও ইঁদারা। আকবর বাদশাহের কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বেগম ও সেবিকা ছিল। এক-এক দল বেগমের উপর একজন স্ত্রী-দারোগা নিযুক্ত থাকত। দারোগাদের যে সর্দার, তাকে হারেমকর্ত্রী বলা হত। বেগমদের প্রত্যেকের মাসহারা ঠিক থাকত। বয়স ও রূপগুণানুসারে এক হাজার আটশ টাকা মাসহারা ছিল তাদের। সেবিকাদের পঞ্চাশ থেকে দুশ টাকা পর্যন্ত বেতন ছিল।—অনুবাদক।

মোগলদের ধনদৌলত

সুতরাং যদিও বাদশাহের রাজস্ব প্রচুর এবং ঐশ্বর্যও প্রচুর, তাঁর এই অপরিমিত ব্যয়ের জন্য উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না বিশেষ। যেমন আয় তেমনি তাঁর ব্যয়। অনেক রাজা-রাজড়ার আয় থেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহের আয় অনেক বেশি কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি ধনী সম্রাট বলতে রাজী নই। মোগল বাদশাহকে ধনী বলাও যা, কোনো কোষাধ্যক্ষকে ধনী বলাও তাই। কোষাধ্যক্ষ প্রচুর টাকা নাড়াচাড়া করেন, এক হাতে জমা নেন, অন্য হাতে দিয়ে দেন। সেই টাকার মালিক তিনি নন। তেমনি ঠিক হিন্দুস্থানের বাদশাহও। ধনী ও ঐশ্বর্যবান সম্রাট আমি তাঁকেই বলতে পারি যিনি নিজের রাজ্যের প্রজাদের পীড়ন বা শোষণ না করে এমন রাজস্ব আদায় করতে পারেন যা দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর বিরাট রাজদরবারের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন, বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করতে পারেন, রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহাল করতে পারেন—এবং এত সব করা সত্ত্বেও, যিনি বিপদ-আপদ ও সঙ্কটের জন্য প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত টাকা মজুত রাখতে পারেন। এসব অধিকাংশ গুণই বাদশাহের আছে বটে, কিন্তু যতটা পরিমাণে থাকলে ভাল হয়, তা নেই। আমি যা বলতে চাচ্ছি, আশা করি তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনিও নিশ্চয় হিন্দুস্থানের বাদশাহকে এই কারণে খুব ধনী সম্রাট বলতে চাইবেন না। এইবার আপনাকে আমি আরও দুইটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি, যা থেকে আপনি আমার বক্তব্য সমর্থন করবার মতন যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাবেন মনে হয়। এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন, মোগল বাদশাহের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বাইরের লোকের যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়।

প্রথম ঘটনা: বিগত গৃহযুদ্ধের শেষদিকে সম্রাট ঔরঙ্গজীব সৈন্যদের বেতন সম্পর্কে রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেই কূল পাচ্ছিলেন না, কি করে তাদের বেতন ও ভাতা দেবেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, গৃহযুদ্ধ পাঁচ বছর মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং সৈন্যদের বেতন স্বাভাবিক অবস্থায় যেরকম থাকত, তার চেয়ে কম ছিল। তাছাড়া কেবল বাংলাদেশ ছাড়া যেখানে সুলতান সুজা তখনও লড়াই করছিলেন—হিন্দুস্থানের আর কোথাও বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছিল না। সর্বত্র শান্তি বজায় ছিল বললেও ভুল হয় না। এও মনে রাখা দরকার যে সম্রাট ঔরঙ্গজীব যেভাবেই হোক, সেই সময় তাঁর পিতা সাজাহানের অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : সম্রাট সাজাহান যথেষ্ট বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে খুব বড় রকমের কোনো যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তিনি লিপ্ত হননি। কিন্তু তা সত্বেও তিনি ছয় কোটির বেশি টাকা জমাতে পারেননি। অবশ্যই টাকার সঙ্গে আমি সোনারুপোর অসংখ্য মূল্যবান জিনিস, দামী দামী পাথর মণি মুক্তা হীরা জহরত ইত্যাদির মূল্য যোগ করছি না। এদিক দিয়ে বরং সম্রাট সাজাহানের মতন দৌলত অন্য কোনো সম্রাটের ছিল না বলা চলে। কিন্তু এই সব মূল্যবান মণিমুক্তা হীরা জহরত ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ও সংগৃহীত, অধিকাংশই হিন্দুরাজা ও পাঠানদের। ওমরাহদের কাছ থেকে উপহার পাওয়াও কম নয়। এ সবই সম্রাটের পবিত্র সম্পত্তি এবং স্পর্শ করা নিষেধ। দেশের দুর্দিনেও সম্রাট তাঁর এই সম্পদের কোনো সাহায্য পান না।

হিন্দুস্থানের দারিদ্র্যের কারণ

অবশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে যদিও মোগল সাম্রাজ্যের সোনারুপোর ও সম্পদের আদি-অন্ত নেই, তাহলেও সোনা যে অন্য দেশের তুলনায় মোগলদের খুব বেশি আছে তা মনে হয় না। বরং হিন্দুস্থানের লোকদের দেখলে মনে হয়, তারা অন্যান্য অনেক দেশের লোকের তুলনায় বেশি দরিদ্র। মনে হবার কারণ আছে।

প্রথম কারণ হল : সোনা অনেক পরিমাণে গলিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়, অর্থাৎ সোনা গলিয়ে মেয়েদের নানারকমের অলঙ্কার তৈরি করা হয় এবং হাত, পা, মাথা, গলা, নাক কান সর্বত্র অলঙ্কৃত করার জন্য সোনা অপচয় করা হয়। সোনা থেকে নানারকমের জরি-জারিদাও তৈরি করা হয়। সেই সব সোনার জরি দেওয়া পাগড়ি, পোশাক ইত্যাদি দেহের শোভাবর্ধন করে। এইভাবে কতটা পরিমাণ সোনা যে হিন্দুস্থানে অপব্যবহার করা হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমীর ওমরাহ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলে গিল্টি-করা অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সাধারণ পদাতিকরা পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করার জন্য উদগ্রীব। অনাহারে ও অর্ধাহারে থেকেও ভারতবর্ষে সোনার গহনা পরার লোভ ও অভ্যাস খুব প্রবল।[৭]

৭। বার্নিয়েরের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের শক্তি দেখে বাস্তবিকই আশ্চর্য হতে হয়। মোগল বাদশাহদের একটি 'রত্নভাণ্ডার' ছিল। রত্নভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের নাম 'জেপকচী'। একজন জহরী

দ্বিতীয় কারণ হল : সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের মালিক, বিশেষ করে ভূসম্পত্তির। সামরিক কর্মচারীদের বেতন হিসাবে তিনি ভূসম্পত্তির ভোগাধিকার দান করেন। তাকে 'জায়গীর' বলে, যেমন তুর্কীতে বলে 'তিমর'। এই জায়গীর থেকে তাঁরা তাঁদের ন্যায্য বেতন আয় করেন। প্রাদেশিক সুবাদারদেরও জায়গীর দেওয়া হয়, শুধু বেতনের জন্য নয়, সৈন্যসামন্তদের জন্যও। একমাত্র শর্ত হল এই যে বাৎসরিক বাড়তি রাজস্ব যা আয় হবে সেটা সম্রাটকে দিতে হবে। যে সব ভূসম্পত্তি জায়গীর দেওয়া হয় না সেগুলি সম্রাটের নিজস্ব খাযত্তে থাকে এবং তিনি রাজস্ব-আদায়কারী (জমিদার ও চৌধুরী) নিযোগ করে তার রাজস্ব আদায় করেন।

এইভাবে ভূসম্পত্তির অধিকারী যাঁরা হন—সুবাদার, জায়গীরদার ও জমিদার—তাঁরা প্রজাদের একমাত্র হর্তাকর্তাবিধাতা হয়ে যান, চাষীদের উপর তাঁদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে, এমন কি নগর ও গ্রামের বণিকশ্রেণী ও কারিগরদের উপরেও। এই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তারা যে কি নির্মমভাবে প্রয়োগ করেন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতন, তা কল্পনা করা যায় না। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোনো উপায় নেই। কারণ যিনি রক্ষক, তিনিই ভক্ষক। এমন কোনো নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, যাঁর কাছে তার অভিযোগ পেশ করতে পারে। আমাদের দেশের (ফ্রান্স) মতন হিন্দুস্থানে পার্লামেণ্ট নেই, আইনসভা নেই, আদালতের বিচারক নেই—অর্থাৎ এমন কিছু নেই যার সাহায্যে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের বর্বরতার প্রতিকার করা যেতে পারে। কিছু নেই, কেউ নেই। আছেন শুধু কাজী সাহেব, কিন্তু কাজীর বিচারও তেমনি, কারণ কাজীর কাছে জনসাধারণের সুবিচারের কোনো আশা নেই। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের এই চরম লজ্জাকর অপব্যবহার কেবল রাজধানীতে (দিল্লী ও আগ্রা) বা রাজধানীর কাছাকাছি নগরে ও বন্দরে একটু অল্প দেখা যায়, কারণ নিদারুণ কোনো অন্যায় বা অত্যাচার এই সব স্থানে ঘটলে, সম্রাটের কর্ণগোচর হতে দেরি হয় না। এই অবস্থাকে আমরা 'দাসত্ব' ছাড়া আর কি বলতে পারি?

এই দাসত্বই হল হিন্দুস্থানের প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, সব কিছু এই

দারোগাও থাকতেন। চুনী, পান্না, হীরা, নীলা প্রভৃতি নানারকমের মণিমাণিক্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকত।—অনুবাদক।

কারণে এত অনুন্নত বলে মনে হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেও বণিকশ্রেণী বিশেষ কোনো উৎসাহ পান না, কারণ বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ ঘটলে আশার চেয়ে আতঙ্কের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিবেশী স্বেচ্ছাচারী তাঁর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দম্ভে সার্থক ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করার চেষ্টা করেন সব দিক দিয়ে এবং কিছুতেই অন্য কারও একজনের ঐশ্বর্যের প্রতিপত্তি সহ্য করেন না। সুতরাং হিন্দুস্থানের বণিকশ্রেণী ও বাণিজ্যেরও কোনো ক্রমোন্নতি নেই, কোনো প্রসার ও প্রগতি নেই। তাছাড়া, হিন্দুস্থানের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যদি কেউ ধনোপার্জন করেন, তাহলে তিনি কখনও ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের জন্য এক কপর্দকও খরচ করেন না। তাঁর ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সব একরকম থাকে, কখনও বদলায় না এবং তা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তাঁর ধনদৌলত কত আছে। কৃপণতাই হিন্দুস্থানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদিকে ক্রমে তাঁর সোনারুপো মজুত হতে থাকে এবং মাটির গভীর তলদেশে স্তূপাকারে সমাধিস্থ হয়ে আত্মগোপন করে থাকে। ধনী কৃষক, ধনী কারিগর, ধনী বণিক—সকলের ঠিক একইরকম মনোবৃত্তি—মুসলমান বা হিন্দু যে সম্প্রদায়েরই লোক হন না কেন তিনি। সাধারণতঃ হিন্দুস্থানের বণিকশ্রেণী বলতে হিন্দুদেরই বুঝায়, কারণ হিন্দুরাই ব্যবসা-বাণিজ্যাদি নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। তাদের ধারণা বা বিশ্বাস যে উপার্জিত অর্থ এইভাবে সঞ্চয় করে রাখলে পরলোকে পরমাত্মার সদ্‌গতি হয়, অর্থাৎ অর্থ ও পরমার্থ তাঁদের কাছে এক পদার্থ। মুষ্টিমেয় একদল লোক যাঁরা সম্রাট বা আমীর-ওমরাহের আওতায় থাকেন, তাঁরাই কেবল ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যয় করেন এবং বাইরে দীনদরিদ্র সেজে থাকেন না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সোনারুপো এইভাবে মজুত করে রাখার অভ্যাস যুক্তিহীন মিতব্যয়িতা এবং খরচ না করে টাকা জমিয়ে রাখার প্রবৃত্তির জন্যই হিন্দুস্থানের দারিদ্র্য এত বেশি। উপার্জিত অর্থ দিয়ে লেনদেন না করে যদি তা ঘরে সঞ্চয় করে রাখা হয়, তাহলে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোনো দেশের দারিদ্র্য দূর হতে পারে না।[৮]

৮। আধুনিক কীনেসীয়ান অর্থনীতির (Keynesian Economics) ছাত্রদের কাছে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ প্রায় তিনশ বছর আগে, বার্নিয়ের ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে গিয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থার এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি আজও কেউ মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল তাতে সকলের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে। প্রশ্নটি এই :

সম্রাট যদি সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক না হতেন এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার যদি স্বীকৃত হত, তাহলে কি হিন্দুস্থানের আরও অনেক বেশি উন্নতি হত?[১]

আর্থিক অবনতির কারণ কি?

এই প্রশ্ন নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। ইয়োরোপে যে সব রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার আছে এবং যে সব রাষ্ট্রে নেই তাদের অবস্থা তুলনা করে দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করলে রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়। পূর্বালোচনা থেকে আমরা বুঝেছি, হিন্দুস্থানের সোনাকপো কিভাবে জায়গীরদার, সুবাদার ও জমিদাররা গোপন সিন্দুকে মজুত করে ফেলেন এবং বহির্জগতের লেনদেনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলে আত্মসাৎ করেন। তাঁদের এই নিষ্ঠুরতার কোনো যুক্তি নেই। জায়গীরদার, জমিদারের এই নিষ্ঠুরতা সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের পর্যন্ত নেই, একমাত্র রাজধানীর কাছাকাছি অঞ্চলে ছাড়া। সাধারণতঃ রাজধানী থেকে দূরে এক একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে এরা যথেচ্ছাচার করতে থাকেন এবং তার অধিকাংশই সম্রাটের কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং যথেচ্ছাচারিতার সীমাও থাকে না। এই যথেচ্ছাচার মধ্যে মধ্যে এমন কদর্যভাবে সীমা ছাড়িয়ে যায় যে চাষী ও কারিগররা দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও সংস্থান করতে পারে না এবং না-পারার জন্য অনাহারে, নিদারুণ কষ্টের মধ্যে নীরবে মৃত্যু বরণ করে। এই যথেচ্ছাচারিতার জন্য দরিদ্র চাষীদের বংশবৃদ্ধিও হয় না

লেখেন, তাহলে বার্নিয়েরের এই বিশ্লেষণ থেকে তিনি যথেষ্ট মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পেতে পারেন। আধুনিক অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন 'Saving', 'Spending', 'Consumption' ও 'National Income'-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি, এবং 'Consumption curve' কাকে বলে। তিনশ বছর আগে বার্নিয়ের এইসব বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তাৎপর্য না জেনেও বিশ্লেষণের মধ্যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন।—অনুবাদক।

১। সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে'র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী সেকথা স্বীকার করবেন। বার্নিয়ের এইখানে চমৎকারভাবে সেই ভূমিকার আভাস দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি দেখলে অবাক হতে হয়।

এবং হলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের তারা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যায়। অনেক সময় তারা গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে চলে যায় উদার ব্যবহারের প্রত্যাশায়, অথবা সেনাবাহিনীতেও যোগদান করে। চাষবাস সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উৎসাহ বা আগ্রহ থাকে না চাষীদের, নেহাত বাধ্য হয়ে করতে হয় তাই করে। সাধারণ চাষীদের পক্ষে জলসেচনের জন্য খাল নালা ইত্যাদি খনন করা সম্ভব নয়, তাদের সামর্থ্যে কুলায় না। সুতরাং জলসেচন-ব্যবস্থার অভাবের জন্য চাষবাসের প্রচণ্ড ক্ষতি হয় এবং যথেষ্ট আবাদী জমি পতিত থাকে। দেশের বসতবাড়ির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়, সবই জরাজীর্ণ এবং নূতন করে তৈরি করার সঙ্গতিও খুব অল্প লোকের আছে। মনে হয় হিন্দুস্থানের চাষী ও সাধারণ লোকের মনে এই প্রশ্নই জাগে 'কেন আমি একজন স্বেচ্ছাচারী জায়গীরদার বা জমিদারের জন্য হাড়ভাঙা খাটুনি খাটব? খাটুনির সার্থকতা কি? যে কোনোদিন আমার সমস্ত সম্পত্তি ও অর্জিত ধন যদি খেয়াল-খুশির বশে স্বেচ্ছাচারী প্রভুর কবলিত হতে পারে, তাহলে মেহনতের মূল্য কি? জীবনের সামান্যতম নিরাপত্তা নেই যেখানে, সেখানে মেহনতের সার্থকতা নেই। সুতরাং যেভাবে হোক, জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। ফসল ফলিয়ে, সম্পদ বাড়িয়ে লাভ কি?'

ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন রাজস্ব-আদায়কারী জমিদারদের মনেও জাগে। তারা ভাবেন: 'দেশের অবস্থা, জমিজমা চাষ-বাসের অবস্থা কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি? তার জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করাও অর্থহীন। কেনই বা আমরা জমির উন্নতির জন্য, ফসল ও সম্পদবৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করব? যে-কোনো দিন সম্রাটের মর্জি অনুযায়ী আমাদের সমস্ত অধিকার অপহৃত হতে পারে, আমরা সাধারণ প্রজা বলে গণ্য হতে পারি। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের সুকাজের সুফল যে আমাদের বংশধররা উত্তরাধিকার-সূত্রে ভোগ করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং ক্ষণিকের রাজা যখন আমরা, তখন প্রজাদের শোষণ করে যতদূর সম্ভব অর্থ রোজগার ভাল। তাতে যদি প্রজারা অনাহারে মরে বা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ আমরাই বা কদিন আছি প্রভুত্ব করতে? আজ আছি, কাল নেই। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজার কল্যাণ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর বিষয় চিন্তা করে আমাদের লাভ কি? যে কদিন পারা যায় আমরা লুটে নেব এবং যখন সব ছেড়ে চলে যাব তখন এমন ভয়াবহ রিক্ত অবস্থায় রেখে যাব জমিদারি যে ভবিষ্যতে সম্রাটের

নিযুক্ত অন্য কোনো জমিদার সেখানে থেকে আর কিছু শোষণ করতে পারবেন না।'

এই কারণেই শুধু হিন্দুস্থানের নয়, এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমিক অবনতি হয়েছে। যে-দেশের গবর্ণমেণ্টের এই অবস্থা, সেখানে অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে কি ভাবে? এই অবনতির চিহ্ন হিন্দুস্থানের সর্বত্র দেখা যায়। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ নগরের ঘরবাড়ির অবস্থা খুব শোচনীয়, মাটির তৈরি ঘর-বাড়ি এবং এই রকম পরিত্যক্ত নগরের অভাব নেই সেখানে। জীর্ণ ঘরবাড়ির ভগ্নস্তূপে পরিণত নগরও অনেক আছে। যেগুলির অস্তিত্ব আজও আছে, তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।

হিন্দুস্থান অনেক দূরে। হিন্দুস্থানের কথা ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে আরও পাশাপাশি অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় একরকম। সেই স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় শক্তির ধ্বংসলীলার সুস্পষ্ট চিহ্ন সর্বত্র বিরাজমান—মেসোপোতামিয়ায়, আনাতোলিয়ায়, ফিলিস্তিনে, সর্বত্র। একসময় এই সব দেশ ছিল সোনার দেশ, মাটিতে সোনা ফলত বললেও ভুল হয় না। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল ফসলক্ষেত এই সব দেশের প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন করত। এখন সেখানে মরুভূমির অবস্থা বিরাজ করছে, ক্ষেতের দিকে চাইলে কল্পনা করা যায় না যে এককালে সোনা ফলত এই সব দেশে। যেখানে আবাদ করলে সোনা ফলত, সেখানে এখন জলাজঙ্গল, কীটপতঙ্গের উপদ্রব হয়েছে এবং মানুষের বসবাসের অযোগ্য স্থান হয়ে উঠেছে। সোনার দেশ মিশরের ইতিহাসও ঐ একই করুণ মর্মান্তিক ইতিহাস, অর্থাৎ দাসত্বের ও ক্রমিক অবনতির ইতিহাস। মিশরের দশভাগের একভাগ অঞ্চল বিগত আশী বছরের মধ্যে অনাবাদী পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে, জলসেচনের প্রণালীগুলি সংস্কার করা হয়নি এবং করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষই মাথা ঘামাননি। নীল নদের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়েও কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজনবোধ করেননি। তার ফলে ভাঁটি অঞ্চল প্রতি বৎসর প্রবল বন্যায় ভেসে যায় এবং বালিতে ঢেকে যায়। এই বালির আবরণ পরিষ্কার করা রীতিমত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কে করবে?

শিল্পী ও শিল্পকলার অবস্থা

এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কোনো দেশের শিল্পকলার সুস্থ বিকাশ হতে পারে কি? পারে না। কোনো শিল্পী শিল্পকলার উৎকর্ষের জন্য এই পরিবেশের

সঙ্গে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন না। চারিদিকে যে দেশে দারিদ্র্যের বীভৎসতা প্রকট হয়ে থাকে, এবং ধনীরা যেখানে সরলতার ভান করে কৃপণতাকে জীবনের [illegible] গ্রহণ করেন, সুলভ মূল্যের দ্রব্যাদির জন্য যেখানে সকলে লালায়িত, সেখানে শিল্পকলার আসল উৎকৃষ্টতা বা সৌন্দর্য বিচার্যবস্তু নয়, তার কোনো মূল্য নেই। যে দেশের ধনীরা [illegible] জীবন যাপন করাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, না খেয়ে না পরে কেবল মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখতে [illegible] খরচ করতে [illegible] না এবং করতে জানেনও না, তাঁদের জীবন সম্বন্ধে কোনো উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে না। আর যাই হন, তাঁরা কখনও শিল্পকলার সমঝদার [illegible] পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না। এই অবস্থায় শিল্পকলা বা শিল্পীর বিকাশ ও সমৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যেখানে শিল্পীদের তথাকথিত [illegible] পর্যন্ত করতে সঙ্কোচ হয় না, সেখানে শিল্পীরা কি মানুষ বলেও গ্রাহ্য নন? শিল্পীদের সেখানে কোনো মর্যাদা নেই, কোনো স্বাধীনতা নেই, স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই। তাঁদের সৃষ্টির জন্য কোনো স্বীকৃতি বা সম্মানও তাঁদের দেওয়া হয় না। তাঁরাও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতন দাসত্ব করেন। যেখানে শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নেই এবং সৃষ্টির কোনো স্বীকৃতিও নেই, সেখানে শিল্পকলার উন্নতির জন্য শিল্পীরা কোনো প্রেরণা পেতে পারেন না। শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অর্থ উপার্জনের কোনো স্বাধীনতা শিল্পীর নেই। ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করার ব্যক্তিগত অধিকারও নেই। বংশপরম্পরায় শিল্পীদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই এইজন্য দায় হয়ে ওঠে। সামান্য অর্থও সঞ্চয় করার অধিকার তাঁদের নেই। একেবারে ঠিক ক্রীতদাসের মতন অবস্থা। একটু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না, কারণ পোশাক দেখে যদি আমীর-ওমরাহ বা জায়গীরদার-জমিদারদের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি বিত্তশালী, তাহলে তাঁর পরিত্রাণ নেই। আমার বিশ্বাস, হিন্দুস্থান থেকে শিল্পকলার অস্তিত্ব বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহরা নিজেরা বেতনভুক শিল্পী নিয়োগ না করতেন, তাঁদের বংশধরদের শিল্পশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করতেন, এবং সবার উপরে, পুরস্কার ও তিরস্কার বা চাবুকের ভয় না দেখাতেন। ধনিক, বণিক ও ব্যবসায়িশ্রেণীও শিল্পীদের নিজেদের কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করেন এবং তার জন্য শিল্প ও শিল্পীর অস্তিত্ব কিছুটা বজায় থাকে। অনেক সময় তাঁরা বেশি বেতনও দেন। কোনো মহানুভবতা বা উদারতার জন্য বেশি

দেন না, সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থের জন্য কাজেই তাগিদে দিতে বাধ্য হন। চাবুকের ভয় দেখিয়ে ধনিক বণিকরাও কারিগর ও শিল্পীদের কাজ করাতে দ্বিধাবোধ করেন না। কারিগর ও শিল্পীদের কোনো উপায়েই ধনসঞ্চয় করার উপায় নেই। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে, সামান্য মোটা কাপড়ে লজ্জানিবারণ করে তাঁরা বেঁচে থাকেন এবং তাতেই তাঁরা খুশি। তাঁদের তৈরি কারুশিল্পাদির ব্যবসা করে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন বণিকরা এবং বণিকদের একমাত্র লক্ষ্য হল, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা তাঁদের সন্তুষ্ট করা, শিল্পীদের নয়।

শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা

এই যে সমাজের পরিচয় দিলাম, এর ভবিষ্যৎ কি? এরকম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। অশিক্ষাই এই সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। হিন্দুস্থানে এই অবস্থার মধ্যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ বা আকাডেমী জাতীয় কিছু কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর? আমার তো মনে হয়, সম্ভব নয়। কারণ প্রতিষ্ঠাতা কোথায় পাওয়া যাবে, কে প্রতিষ্ঠা করবে? প্রতিষ্ঠা করলেও বা বিদ্বান ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? সেরকম লোকই বা কোথায়, যারা খরচ করবেন শিক্ষার জন্য? যদিও বা সেরকম লোক দু-চারজন থাকেন তারা ভয়ে তা করবেন না, কারণ তাদের অর্থসামর্থ্য যে আছে একথা তাঁরা প্রকাশ্যে প্রচার করতে চান না। আর যদি এত অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষা পায় কেউ, তাহলে সেই শিক্ষার উপযুক্ত মর্যাদাই বা দেবে কে? অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম, চাকরি-বাকরি এমন কিছু নেই যার জন্য বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার প্রয়োজন। সুতরাং তরুণরা শিক্ষার প্রেরণাই বা পাবে কোথা থেকে?

এই অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়।[১০] কারণ বাণিজ্যের

১০। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে বৃটিশযুগের আগে পর্যন্ত ভারতীয় বণিকশ্রেণীর বিকাশের ইতিহাস নিয়ে তার ও অর্থনীতির বা ইতিহাসের কোনো ছাত্র গবেষণা করেননি। অথচ ভারতীয় বণিক-শ্রেণীর ক্রম-বিকাশের ধারা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। ভারতীয় বণিকরা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করতেন এবং বাণিজ্যের দৌলতে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হল না, কেন এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের যুগের আবির্ভাব হল না, কেন বণিকরা যুগে-যুগে সমাজের উপেক্ষার পাত্রই হয়ে রইলেন, এ সব প্রশ্ন ইতিহাসের দিক দিয়ে জটিল প্রশ্ন। বার্নিয়ের এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন এখানে এবং বিস্ময়কর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

অধিকার যদি বাধাবন্ধহীন না হয়, তাহলে তার বিস্তারও হয় না। ইয়োরোপের মতন তাই হিন্দুস্থানে বাণিজ্যিক উন্নতি হয়নি। এমন লোক কে আছে, যে পরের স্বার্থের জন্য নিজে পরিশ্রম করবে, দুশ্চিন্তা করবে এবং বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবে? প্রাদেশিক সুবাদার যদি বাণিজ্যের মুনাফার মোটা অংশ গ্রাস করে ফেলেন, তাহলে বণিকদের বাণিজ্য করার দরকার কি? যে বণিক যত মুনাফাই করুন না কেন, তাঁকে বাইরে সেই দীনদরিদ্রের বেশেই থাকতে হবে, এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগও তিনি নিশ্চিন্তে করতে পারবেন না। কারণ তাহলেই তিনি তাঁর প্রতিবেশী জমিদার বা সুবাদারের ঈর্ষার পাত্র হবেন এবং তাঁর ধনসম্পত্তি থেকে হয়ত বঞ্চিতও হবেন। সাধারণতঃ বণিকরা অবশ্য উচ্চপদস্থ ফৌজদার বা আমীরের আশ্রয়ে থেকে ব্যবসা করেন, তা না হলে তাঁদের পক্ষে ব্যবসা করাই বিপজ্জনক। তাহলেও কিন্তু বণিকের কোনো স্বাধীনতা বা সম্মান নেই হিন্দুস্থানে। বণিকরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা প্রভুদের ক্রীতদাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের আশ্রয় ও পোষকতার জন্য তাঁরা বণিকদের কাছে যে কোনো মূল্য দাবী করতে পারেন। সাধারণতঃ মূল্য হল বাণিজ্যের মুনাফার অংশ এবং কোনো চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট অংশ নয়, আশ্রয়দাতার খেয়ালখুশি মতন অংশ।

মোগল বাদশাহ তাঁর নিজের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের জন্য কখনও রাজবংশ ও খনেদী সম্ভ্রান্তবংশের লোক নির্বাচন করেন না। এমন কি সাধারণ ভদ্র নাগরিক, বণিক বা ব্যবসায়ী কেউ কোনোদিন তাঁর নেকনজরে পড়েন না। শিক্ষিত লোক, সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন পরিবারের লোক, যাঁরা সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকর্তব্য পালন করতে পারেন, বিপদে-আপদে নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে সম্রাটের পাশে দাঁড়াতে পারেন, দেশের প্রতি অনুরাগ যাঁদের বেশি, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরা কেউ সম্রাটের রাজকার্যের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমন্ত্রিত হন না। তার বদলে সম্রাট তাঁর চারিদিকে নিরক্ষর ও বর্বর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালবাসেন। সমাজের জঘন্য আবর্জনাস্তূপ থেকে কুড়িয়ে নেওয়া একদল পরানুগ্রহজীবী মোসাহেব তাঁকে ঘিরে থাকে। তারা দেশপ্রেম বা রাজভক্তি কাকে বলে জানে না। তার ধারও ধারে না। সম্রাটের নেকনজরে থেকে তারা মিথ্যা দম্ভের বড়াই করে শুধু, সৎসাহস, সম্মান বা শালীনতার তোয়াক্কা করে না। দরবারের শোভা তারাই বর্ধন করে।

এইভাবে হিন্দুস্থান ক্রমে অবনতির চরম সীমায় পৌঁছেচে। বিশাল এক সেনাবাহিনী ও বিরাট এক রাজদরবারের কৃত্রিম জাঁকজমকের ব্যয়ভার বহন করতেই হিন্দুস্থান সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। সেনাবাহিনী প্রয়োজন, কারণ তারই জোরে হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে পদানত করে রাখতে হয়। সৈন্যসামন্ত না হলে হিন্দুস্থানে রাজার পক্ষে রাজত্ব করা একদিনও চলে না। হিন্দুস্থানের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশারও যেন সীমা নেই মনে হয়। কেবল ডাণ্ডা আর চাবুকের জোরে তাদের ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছে। অমানুষিক খাটুনিও তারা খাটে এবং চাবুক মেরেই তাদের খাটানো হয়। নানাভাবে নির্মম নির্যাতন করে জনসাধারণকে বিদ্রোহের প্রান্তে আনা হয়েছে হিন্দুস্থানে। গণবিদ্রোহ কেবল সামরিক শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

হতভাগ্য দেশ হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্যের আরও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, বড় যুদ্ধবিগ্রহের সময় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করেন। প্রাদেশিক সুবাদাররা ক্রয়মূল্যের এই টাকা কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নেন। উচ্চহারে সুদ দিয়ে টাকাটা তাঁরা কর্জ করেন। প্রদেশগুলি এইভাবে কেনা হোক বা না হোক, প্রত্যেক প্রদেশের সুবাদার, জায়গীরদার ও রাজস্বআদায়কারী জমিদারদের মূল্যবান জিনিসপত্র উপহার দিতে হয় প্রতিবৎসর উজীর, খোজা বা বেগমখানার কোনো মহিলাকে—রাজদরবারে যাঁর প্রতিপত্তি আছে এবং বাদশাহের উপর যাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব আছে যথেষ্ট। ভেট না দিয়ে কোনো কাজ হাসিল করার উপায় নেই। প্রাদেশিক সুবাদার সম্রাটের নিয়মিত কর-পেস্কসাদিও আদায় করে দেন। এইভাবে একজন অতি নিম্নস্তরের লোক, সাধারণতঃ গোলামশ্রেণীর লোক, ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হয়ে দেশের মধ্যে হোমরাচোমরা ব্যক্তি বলে গণ্য হন।

এইভাবে হিন্দুস্থান প্রতিদিন ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও হিন্দুস্থানে। আলোর কোনো আভাস নেই, চারিদিকে কারাগারের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার থমথম করছে মনে হয় হিন্দুস্থানে। প্রাদেশিক সুবাদাররা হঠাৎ নবাব হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন এবং এইজাতীয় ক্ষুদে নবাবের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতাও অপরিসীম। তাঁদের ঔদ্ধত্যের রশ্মি সংযত করার মত কেউ নেই। এই সীমাহীন অত্যাচার দিনের পর দিন মাথা হেঁট করে হিন্দুস্থানের জনসাধারণ নীরবে সহ্য করে। প্রতিকারের কোনো পন্থা নেই, ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই। অভিযোগ ও

আবেদন করার মতন কোনো নিরপেক্ষ বিচারক নেই কোথাও। রক্ষকরাই সেখানে ভক্ষক।

হিন্দুস্থান ও অন্যান্য দেশ

একথা অবশ্য ঠিক যে মোগল বাদশাহ প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে 'ওয়াকীনবীশ'[১১] পাঠান। তাঁদের একমাত্র কাজ হল সেখানে যা ঘটবে তা ঠিকভাবে বাদশাহকে জানানো। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় যে এই ওয়াকীনবীশদের মধ্যে মতান্তর ও মনোমালিন্য হয় এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে বিরোধও দেখা দেয় কদর্যভাবে। সুতরাং প্রজাদের কোনোদিক থেকেই নিশ্চিন্ত হবার সুযোগ নেই, এবং প্রজার দুঃখ-দুর্দশা অভিযোগ ইত্যাদি সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াও সম্ভব নয়।

হিন্দুস্থানে 'গবর্নমেণ্ট' বিক্রি হয় অবশ্য, কিন্তু তুরস্কের মতন অতটা প্রকাশ্যে হয় না এবং ঘন ঘন হয় না। 'প্রকাশ্যে' বিক্রির কথা বললাম এইজন্য যে প্রাদেশিক গবর্নর বা সুবাদাররা যেমন সময় মত উপঢৌকন ও ভেট পাঠান

১১। 'ওয়াকী' কথার অর্থ ঘটনা, আর 'নবীশ' মানে লেখক। যিনি ঘটনার খোঁজ রাখেন হিসাব রাখেন। উইলসনের অভিধানে 'ওয়াকিনবীশ' সম্বন্ধে এই বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

'A remembrancer, a recorder of events, an officer on the royal establishment under the Moghuls, who kept a record of the various orders issued by and transactions connected with, the sovereign: in the revenue department an officer of this denomination was also attached to the Nazim or provincial governor who reported to the principal remembrancer at the court the particular revenue transactions of the province: any communicator of official intelligence.'—Wilson's Glossary

ওয়াকীনবীশ বাদশাহের সমস্ত হুকুম লিখে নেন, বাদশাহের রোজনামচা লিখে থাকেন, বাদশাহের কাছে রোজ যেসব আবেদন অভিযোগ উপস্থিত হয় তার হিসাব রাখেন। এছাড়া বাদশাহের পানাহারের ব্যবস্থা, তাঁর হারেমে যাবার ব্যবস্থা, দরবারে যাবার ব্যবস্থা, শিকারের উদযোগ ইত্যাদি করেন, এবং নজর, ফরমান, হুকুম ইত্যাদির হিসাব রাখেন। রাষ্ট্রের ভিতরের ও বাইরের বিবরণপত্র পাঠ করা, কোন্ দেশে কার সঙ্গে কি ভাবে সন্ধি হল তার স্মারকলিপি লিখে রাখা, রাজ্যের মধ্যে কোথায় কি ঘটল তার বিবরণ রাখা, এইসব হল ওয়াকীনবীশের কাজ। ওয়াকীনবীশ প্রতিদিন একটি রোজমানা লিখে এনে বাদশাহকে পড়ে শোনান এবং বাদশাহ মঞ্জুর করলে তাতে মোহর দিয়ে দস্তখত করেন। এই দস্তখতী কাগজকে 'ইয়াদদস্ত' বা 'স্মারকলিপি' বা 'মেমরেণ্ডাম' বলে। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)।

নিয়মিতভাবে সম্রাটের কাছে, ততে একটা প্রদেশের শাসনাধিকার সত্যই কেনা যেতে পারে। ভেটের মূল্য প্রায় প্রদেশের ক্রয়মূল্যের সমান হয়ে ওঠে। হিন্দুস্থানে একই লোক দীর্ঘকাল গবর্ণর থাকেন, তুরস্কের মতন ঘন ঘন বদলি হন না এবং দীর্ঘকালের স্থায়ী সুবাদাররা প্রজাদের সুখসুবিধার দিকে তবু একটু নজর দেন, যা নতুন গবর্ণররা লোভের বশবর্তী হয়ে একেবারেই দেন না। স্থায়ী সুবাদাররা কতকটা নিজেদের স্বার্থেও কিছুটা সংযত ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁরা জানেন যে যথেচ্ছাচার করলে প্রজারা উৎপীড়িত হয়ে অন্য রাজার রাজ্যে গিয়ে বসবাস করবে এবং তাতে তাদেরই ক্ষতি হবে। হিন্দুস্থানে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে।

পারস্যে এরকম প্রকাশ্যে বা ঘন ঘন গবর্ণমেণ্ট বেচাকেনা হয় না। বংশানুক্রমেও সেখানে অনেকে গবর্ণর হন। তার ফলে পারস্যের সাধারণ লোকের অবস্থা অনেক বেশি উন্নত দেখা যায়। পারসীরা তুর্কীদের চেয়ে অনেক বেশি অমায়িক এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি তাদের অনুরাগও আছে।

কিন্তু তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থান এই তিনটি দেশের সম্রাটদের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বা ভূসম্পত্তির প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নেই দেখা যায়। এইদিক দিয়ে তিনটি দেশের সাদৃশ্য আছে মনে হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করার অর্থ সব রকমের সামাজিক অগ্রগতির পথ বন্ধ করা। এই মারাত্মক ভুলের জন্য এই দেশগুলিকে একদিন অনুতাপ করতে হবে এবং তখন তারা বুঝতে পারবে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে তাদের কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যে-দেশের শাসকরা স্বীকার করেন না, সে-দেশের অগ্রগতির কোনো আশা নেই—অত্যাচার, অবনতি ও চরম দুঃখদুর্দশার নরককুণ্ডে তার ধ্বংস অনিবার্য।

প্রায় মনে হয় আমার, এই সব দেশবাসীর তুলনায় আমরা কত সুখী। আমাদের দেশের সম্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক নন। তা যদি হত তাহলে আমরা এত সুন্দর দেশ, এত সব বড় বড় শহর নগর, এত সব সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারতাম না। এত লোকসংখ্যাও বাড়ত না, এত ফসল ফলত না আমাদের দেশে। সম্পত্তির অধিকার যদি আমাদের না থাকত, তাহলে ইউরোপের সম্রাটদেরও সঞ্চিত ধনরত্ন থাকত প্রচুর এবং তাঁদের প্রতি প্রজাসাধারণের এরকম আনুগত্যবোধও থাকত না। রাজারা প্রত্যেকে একাকী মরুভূমিতে রাজত্ব করতেন—বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও বর্বর-অধ্যুষিত মরুভূমিতে।

এশিয়ার সম্রাটরা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাঁদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত বেশি উদ্ধত ও অন্ধ যে তাঁরা রাজকীয় শক্তিকে ঐশ্বরিক শক্তির চেয়েও স্বেচ্ছাচারী মনে করেন এবং সবকিছু ভোগ-দখল করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মে সর্বস্ব হারাতে বাধ্য হন। তাঁদের টাকাপয়সা সংগ্রহের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আদায় করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্যর্থ হন। আজ যদি আমাদের দেশেও ঐরকম সম্রাট থাকতেন এবং দেশের ধনসম্পত্তির উপর তাঁর একচেটে অধিকার থাকত তাহলে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা এরকম বৃদ্ধি পেত না এবং ব্যবসায়ী ও কারিগরদেরও এত উন্নতি হত না। প্যারিস, লিয়ঁ, তুলু, রুয়েঁর মতন এমন সুন্দর সুন্দর শহরও গড়ে উঠত না আমাদের দেশে। এত নগর ও গ্রামের অস্তিত্বও থাকত না। এত সুন্দর সব ঘরবাড়ি তৈরি করা বা পাহাড়পর্বতে ও উপত্যকায় এত যত্ন ও মেহনত করে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলানো, এসব কিছুই সম্ভব হত না। তাছাড়া, আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব রাষ্ট্র উপার্জন করে, তাই বা কোথা থেকে করা সম্ভব হত? এই রাজস্ব থেকে রাজা ও প্রজা উভয়েই উপকৃত হন। সম্পত্তির অধিকার না থাকলে এত অগ্রগতির পথ বন্ধ হয়ে যেত। দেশের এই সমৃদ্ধ রূপ বদলে যেত তাহলে। এই বিচিত্র প্রাণৈশ্বর্য দেশ থেকে লোপ পেয়ে যেত। আমাদের বড় বড় নগরগুলি মানুষের বসবাস-যোগ্য থাকত না, নরকের মতন কদর্য ও বিষাক্ত হয়ে উঠত। কোন্ কালে সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত, তার পরিবেশ নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ জীবনের বীজাণুতে কলুষিত হয়ে যেত, কোনো লোকালয়ের চিহ্ন কোথাও থাকত না। আজ যে পাহাড়ী জমিতে আবাদ করে আমরা সোনা ফলাচ্ছি তা আর সম্ভব হত না তখন। সোনার বদলে, ফসলের বদলে কীটপতঙ্গ, বনজঙ্গল, কাঁটা-গাছ ও বন্যজন্তুর জন্ম হত সেখানে। পর্যটকদের জন্য এরকম সুন্দর বন্দোবস্ত আমরা করতে পারতাম না। প্যারিস ও লিয়ঁর মধ্যবর্তী পথে যেসব পান্থ-নিবাস আজ বিদেশী ও এদেশী পর্যটকদের কলরবে মুখর হয়ে উঠছে, সেসব কতকগুলি কুৎসিত ক্যারাভান-সরাইয়ে পরিণত হত হয়ত এবং পর্যটকরা স্থান থেকে স্থানান্তরে যাযাবরের মতন মালপত্তর নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হত। এশিয়ার ক্যারাভান-সরাইগুলিকে এক-একটি গোলাঘর বললেও ভুল হয় না। শত শত পথযাত্রী ও দেশযাত্রীরা তার মধ্যে তাদের ঘোড়া, উট ও ঘোটক-গর্দভসহ একত্রে বাস করে। সে এক বিচিত্র জীবন। মানুষ ও

পশুর দল যে এইভাবে মিলেমিশে দিনযাপন করতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। গ্রীষ্মকালে নিদারুণ উত্তাপের জন্য ক্যারাভান-সরাইয়ে বাস করা যায় না, অস্থির হয়ে উঠতে হয় গরমে। শীতকালেও কেবল জন্তুজানোয়ারের অবাঞ্ছিত সাহচর্যের উত্তাপেই যাত্রীদের কোনোরকমে আত্মরক্ষা করতে হয়।

কিন্তু হিন্দুস্থান ছাড়াও এমন দু-একটি দেশ আছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করা সত্ত্বেও দেশের শ্রীবৃদ্ধির কোনো বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তার জন্য বেশি দূর হিন্দুস্থান পর্যন্ত যাবার দরকার নেই, কাছেই ইতালীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইতালীতেও সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার বিধি-সম্মত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতালী ক্রমে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। এক বড় সাম্রাজ্য ইতালী এবং এত সমৃদ্ধ সব দেশ সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে বিনা চাষবাসেও তাদের উর্বরতাশক্তি নষ্ট হবে না। এরকম যার সাম্রাজ্য তার অবশ্য উন্নতির পথে কোনো অন্তরায় না থাকারই উচিত। তার শক্তি ও ঐশ্বর্য তো থাকবেই। কিন্তু এইদিক দিয়ে বিচার করলে তুরস্কের সামর্থ্য ও সম্পদ যে কত অল্প তা বলা যায় না। অথচ তুরস্কের প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। তুরস্কের সম্পত্তির অধিকার যদি আজ থাকত, সেখানকার মাটিতে যদি প্রচুর ফসল ফলত এবং বহু লোকজনের বাস হত, তাহলে সেখানে আগেকার মতন সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব হত না। কনস্টান্টিনোপোলের মতন শহরে পাঁচ হাজারের মতন সৈন্যসংখ্যা নিয়ে একটা বাহিনী গড়তে এখন প্রায় তিন মাস সময় লাগে। তার কারণ কি? দেশের লোকের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, লোকশূন্য হয়ে গেছে দেশ এই নীতির জন্য। তুরস্কের সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র আমি নিজে ভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখেছি তার চরম দুরবস্থা। কল্পনা করা যায় না তার ভয়াবহতা। যেখানে গেছি সেখানে দেখেছি ধ্বংসের চিহ্ন, ক্ষয়ের চিহ্ন, মৃত্যু, হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার চিহ্ন। কোনো প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। লোকালয় প্রায় জনশূন্য। তুরস্কের একটা বড় সম্পদ হল, চতুর্দিক থেকে বন্দী করে আনা খৃস্টান ক্রীতদাসের দল। কিন্তু কেবল ক্রীতদাসের মেহনতে কি হবে? যদি আরও কিছুকাল তুরস্কের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী রাজত্ব করেন, তাহলে তুরস্কের নিশ্চিত ধ্বংস সম্বন্ধে আমি জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কোনো সম্ভাবনা নেই তুরস্কের মতন দেশের উন্নতির ও অগ্রগতির। পুনরুজ্জীবনের কোনো আশা নেই

আইনের সাহায্য নিতে পারবে না কেন? কেন তারা উজীর[৩] বা প্রধান মন্ত্রী ও সম্রাটের কাছে তাদের অভিযোগ, আবেদন নিবেদন করতে পারবে না? বাধা কোথায়? বিচারের কোনো বিধানই যে নেই সেখানে তা তো নয়। স্বীকার করি, আছে। আইনকানুন, বিধিবিধান কিছুই যে এশিয়াতে নেই তা নয়, আছে এবং একথাও স্বীকার করি যে সুষ্ঠুভাবে সেই সব বিধান মেনে চললে বা প্রয়োগ করলে এশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে কম উপভোগ্য হবে না, বসবাসের দিক থেকে। কিন্তু শুধু ভাল ভাল বিধান থাকলেই তো হয় না, এবং মনে মনে সাদিচ্ছা থাকাতেও কোনো লাভ নেই। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে সেগুলি প্রয়োগ করা দরকার এবং তার সাহায্য নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও প্রয়োজন। তা যদি না করা হয় বা না দেওয়া হয়, তাহলে হাজার বিধান থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই।

প্রাদেশিক গবর্ণর বা সুবাদাররা অন্যায় করেন, অত্যাচার করেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করেন পদে পদে, কিন্তু সেই একই উজীর বা একই সম্রাট কি

৩। 'উজীর' ছিলেন মোগলযুগের প্রধান মন্ত্রী'। এই পদমর্যাদার সঙ্গে অবশ্য বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সম্পর্ক নেই। সাধারণতঃ তিনি রাজস্ববিভাগের প্রধান বলে গণ্য হতেন এবং তখন তাঁকে 'দেওয়ান' বলা হত। দেওয়ান মাত্রই অবশ্য 'উজীর' ছিলেন না। বিশেষ করে হিন্দু দেওয়ানদের 'উজীর' বলা হত না। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত 'ওকিল' (Wakil) এবং অর্থমন্ত্রীকে বলা হত 'উজীর' (Wazir)।

কেউ কেউ 'উজীর' কথার উৎপত্তি হিব্রু শব্দ 'বিচির' (সংস্কৃত 'বিচার') থেকে হয়েছে মনে করেন মানে যিনি বিচারক। প্রথমযুগের খলিফাদের শাসনকালে সেক্রেটারী অফ স্টেটকে বলা হত কাতিব বা লেখক। আব্বাসিদরা পারসীদের কাছে শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখেন এবং তাঁরাই প্রথম 'উজীর' কথাটি ব্যবহার করেন। ক্রমে উজীর পত্রলেখক থেকে দপ্তরের প্রধান হন এবং আবেদন-নিবেদনের বিচারক হয়ে ওঠেন। অটোমান তুর্কীদের রাজত্বকালে প্রায় শতজন উজীর ছিলেন। "As a rule, Wazir in later times was simply a title of the high officials (Encyclopaedia of Islam, V 1135)

উজীর' সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন 'Originally, the Wazir was the highest officer of the revenue department, and in the natural course of events control over the other departments gradually passed into his hands. It was only when the king was incompetent, a pleasure-seeker or a minor, that the Wazir controlled the army also It was only under the degenerate descendants of Aurangzib that the Wazirs became virtual rulers of the state, like the Mayors of the Palace in mediaeval France.' (Jadunath Sarkar; Mughal Administration : পৃঃ ২০-২১)

তাঁদের প্রত্যেকবার ঐ পদে নিয়োগ করেন না? সুবাদাররা কি তাঁদেরই মনোনীত ব্যক্তি নন? এই সম্রাট ও উজীরই হলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রধান বিচারক। অত্যাচারী শাসনকর্তা ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃতির লোক নিয়োগ করার সাধ্যও নেই তাঁদের। তার কারণ, হয় সম্রাট, না হয় তাঁর উজীর রাজ্যটিকে একরকম বিক্রি করে দেন বলা চলে। যিনি বেশি উপঢৌকন দেন, ভেট পাঠান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা তাঁকেই তাঁরা নিয়োগ করেন। আর যদিও স্বীকার করা যায় যে তাঁরা অভিযোগ শুনতে রাজী আছেন, তাহলেও কোনো দরিদ্র চাষী বা অসহায় কারিগরের পক্ষে অত দূরে রাজধানীতে গিয়ে বিচারের জন্য হাজির হওয়া সম্ভব নয়। শত শত মাইল দূরে রাজধানীতে যাওয়ার খরচ যোগাবে কে তাদের? পায়ে হেঁটে যে তারা যাবে, তারও উপায় নেই, কারণ শেষ পর্যন্ত সশরীরে পৌছবে কিনা তা বলা যায় না। পথে হয়ত খুনে চোরডাকাতের হাতেই তাদের প্রাণটা যাবে। পথেঘাটে প্রায় এরকম ঘটে থাকে হিন্দুস্থানে। যদিও বা কোনোরকমে গিয়ে রাজধানীতে পৌছায়, সেখানে গিয়ে দেখবে তার পৌছানোর আগেই, যাঁর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ তিনি নিজে সম্রাটের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বিবৃত করেছেন এবং তাঁর বিবৃতির মধ্যে আসল সত্যকে যতদূর বিকৃত করা সম্ভবপর, তাও তিনি করতে কুণ্ঠিত হননি। তার পরে তার পক্ষে কোনো আবেদন বা অভিযোগ করাও যা, না করাও তাই। মোটকথা, সুবাদারই সর্বময় কর্তা। তিনি হর্তাকর্তা-বিধাতা। বিচারক, আদালত, আইন সভা, খাজনা আবওয়াব নির্ধারণ ইত্যাদি সর্বব্যাপারের তিনি সর্বময় অধীশ্বর। এই শ্রেণীর শোষক ও অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে একজন পারসী ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, সুবাদাররা শুকনো বালি থেকে তেল নিঙড়ে বার করেন। কথাটা মিথ্যা নয়। স্ত্রীপুত্র ক্রীতদাস রক্ষিতা মোসাহেবাদি নিয়ে সুবাদারদের যে বিশাল পোষ্য-সংখ্যা, তাতে তাঁদের নির্দিষ্ট উপার্জিত অর্থে কুলোয় না।

যদি কেউ বলেন যে আমাদের দেশের সম্রাটেরও তো জমিদারী আছে এবং সেই জমিদারীতে চাষবাস হয় ভালভাবে, যথেষ্ট লোকজন বাস করে, তাহলে তার উত্তরে আমি বলব, যে-রাজ্যের রাজা অন্যান্য আরও অনেকের মত জাতীয় ভূসম্পত্তির সামান্য একাংশের মালিক, তাঁর সঙ্গে, যিনি সমস্ত সম্পত্তির মালিক, এমন কোনো সম্রাটের তুলনা হতে পারে না। ফ্রান্সে এমন সুন্দর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে সম্রাট নিজেই তা সর্বপ্রথম মান্য করে

চলেন। তিনি যে ভূসম্পত্তির মালিক, সেখানেও তিনি সম্রাট বলে আইনকানুন অমান্য করে মালিকানা খাটাতে পারেন না। তাঁর জমিদারীর প্রত্যেকটি লোকের আইন-আদালতের সাহায্য নেবার ন্যায্য অধিকার আছে এবং প্রত্যেক চাষী ও কারিগরের অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এশিয়ায় তা নেই। এশিয়ায় দুর্বল ও অসহায়ের কোনো আশ্রয় নেই। অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করার কোনো পন্থা বা সুযোগ নেই তাদের। একজন অত্যাচারী শাসকের চাবুক ও মর্জিই সেখানে একমাত্র ন্যায়দণ্ড, তার উপরে আর কিছু নেই।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, এইরকম এশিয়ার মত, একজন রাজার ও শাসনকর্তার একনায়কত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সুবিধাও আছে অনেক। সেখানে আইনজীবী উকিলের সংখ্যা অল্প, মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও বেশি নয়। সামান্য যা হয়, তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায়। বিলম্বিত বিচারের চেয়ে দ্রুত বিচার অনেক ভাল। দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা যে-কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে যে মারাত্মক ক্ষতিকর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং রাজার কর্তব্য এই ধরনের মামলা-মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা। একথা আমি স্বীকার করি। একথাও ঠিক যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া যায়, তাহলে আইন-আদালত বা মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটও অনেক কমে যায়। 'আমার' 'তোমার' এই অধিকার যদি হরণ করে নেওয়া যায় একবারে, তাহলে মামলার সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, বিশেষ করে দীর্ঘকালস্থায়ী জটিল মামলার কোনো চিহ্নই থাকে না। সম্রাট যেসব ম্যাজিস্ট্রেট বা হাকিম নিয়োগ করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই তাহলে আর কোনো কাজ থাকে না এবং অসংখ্য আইন ব্যবসায়ীরও আর কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একথাও ঠিক যে, এইভাবে যদি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাধির চিকিৎসা করতে হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে যদি সমাজকে মামলামুক্ত করতে হয়, তাহলে ব্যাধির তুলনায় প্রতিষেধক অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে। সে-ক্ষতির কোনো খতিয়ান করা সম্ভব হবে না। হাকিমের বদলে আমাদের সম্রাট-নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং সেই নির্ভরতা যে কি ভয়াবহ তা আগে বলেছি। এশিয়ায় সুবিচার বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তাহলে তা একমাত্র দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কারণ সেক্ষেত্রে কোনো পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ পয়সা

'দয়ে কিনে হাকিমকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। দুইপক্ষই সমান দরিদ্র ও অসহায় বলে হাকিম অনেকটা নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো সুবিচারের আশা নেই। মিথ্যা জাল সাক্ষী পয়সা দিয়ে ধনীর পক্ষে কেনা সম্ভবপর এবং এরকম সাক্ষী সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায় সস্তায়, দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এসব কথা বলছি। নানাদিক থেকে খোঁজ করে, নানাজনকে জিজ্ঞাসা করে আমি এই সব তথ্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। শুধু হিন্দুস্থানের লোক নয়, সেখানকার ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী, রাজদূত, কনসাল দোভাষী প্রভৃতি সকলের মতামত যাচাই করে গ্রহণ করেছি প্রত্যেকটি তথ্য। আমার এই বিবরণের সঙ্গে, আমি জানি, অন্যান্য অনেক পর্যটকের বিবরণ মিলবে না। তাঁরা হয়ত কোনো শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কাজীর সামনে দুজন অপোগণ্ড লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। দেখেছেন হয়ত, হাকিম তাদের 'মুসালিহ বাবা' (শান্তিতে থাকো, বাবা) বলে বিদায় দিচ্ছেন। দুইপক্ষের কোনো একপক্ষেরও যদি ঘুষ দেবার ক্ষমতা না থাকে এবং দুইপক্ষই যদি সমান দরিদ্র হয়, তাহলে অনেক সময় কাজীরা এইরকম বিচারই করে থাকেন। 'শান্তিতে থাকো, বাবা' বলে তাদের জলদি বিদায় করে দেন। অন্যান্য পর্যটকরা এইরকম কাজীর বিচার দেখে বাইরে থেকে হতবাক হয়ে গেছেন, ভেবেছেন এইরকম সুন্দর বিচার আর হয় না। বিচার তো বিচার, কাজীর বিচার! কিন্তু ভিতরে তাঁরা একেবারেই তলিয়ে দেখেননি। যদি দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন কাজীর বিচার সত্যই কি! দুইপক্ষের মধ্যে একপক্ষের যদি দুটো টাকা কাজীর ট্যাঁকে গুঁজে দেবার সাধ্য থাকত, তাহলেই কাজীর বিচার অন্যরকম হয়ে যেত। 'শান্তিতে থাকো, বাবা' বলে তখন তিনি আর দুইপক্ষকেই বিদায় করে দিতেন না। বেশ ধীরে-সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে বিচার করতেন এবং যেপক্ষ 'কিঞ্চিৎ' দিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করেছে, সেই পক্ষেরই সমর্থনে তিনি বিচক্ষণের মতন রায় দিতেন।

অবশেষে এই কথা বলে আমি এই পত্র শেষ করতে চাই: ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হরণ করার অর্থ হল—অন্যায়, অত্যাচার, দাসত্ব, অবিচার, ভিক্ষাবৃত্তি ও বর্বরতার পথ পরিষ্কার করা। মানুষ তাহলে জমিতে আবাদ করে ফসল ফলাবে না এবং পরিত্যক্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে দেশ। সম্রাটের সর্বনাশের পথ, রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হবে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই

হল মানুষের একমাত্র আশাভরসা প্রেরণা, যাতে মানুষ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানুষ তার মেহনতের ফলভোগ করবে নিজে, এবং সেই ভোগের অধিকার দিয়ে যাবে তার বংশধরদের, এই হল মানুষের কামনা। এই কামনা চরিতার্থ হয় বলেই মানুষের হাতে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়, সুন্দর হয়ে ওঠে পৃথিবী। যে-কোনো দেশের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যেখানে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি সেখানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং যে দেশে এই পবিত্র অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত, সে-দেশ ক্রমে শ্রীহীন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাদুস্পর্শেই পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, নতুন রূপ ধারণ করে পুরনো পৃথিবী।

দিল্লী ও আগ্রা

[বার্নিয়েরের এই পত্রখানি কেবল মোগল সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়, রাজ-দরবারের জীবনযাত্রা, তখনকার লোকসমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদির বিশ্বস্ত ও বিস্তৃত কাহিনী হিসেবেও অত্যন্ত মূল্যবান। এককথায়, এই পত্রখানিকেও মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লিখিত পত্রের মতন, ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা চলে। এই পত্রখানি ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ১৬৬৩ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের মঁশিয়ে দ্য লা ভেয়ারের কাছে লিখেছিলেন। নৃবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন দ্য লা ভেয়ার। তদানীন্তন ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। বার্নিয়ের ছিলেন দ্য লা ভেয়ারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভেয়ার যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বার্নিয়ের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বার্নিয়েরকে দেখেই মুমূর্ষু দ্য লা ভেয়ার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কি সংবাদ মঁশিয়ে, হিন্দুস্থানের মোগল সাম্রাজ্যের সংবাদ কি বলুন।]

মঁশিয়ে ভেয়ারের কাছে লিখিত বার্নিয়েরের পত্র

মঁশিয়ে, আমি জানি আমি স্বদেশে ফিরে আসবার পর আপনি প্রথমেই আমাকে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা শহরের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। সৌন্দর্যে, আয়তনে ও লোকজনের বসবাসের দিক দিয়ে ফরাসী শহর প্যারিসের সঙ্গে দিল্লী ও আগ্রার তুলনা হয় কিনা, সেকথা জানবার জন্য এবং আমার কাছ থেকে শোনবার জন্য আপনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। আপনার সেই ব্যাকুলতা ও কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যই আমি এই চিঠি লিখছি। শুধু শহরের বিবরণ নয়, চিঠির মধ্যে এমন আরও অনেক কথা প্রসঙ্গত বলব, যা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য শহর

দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য-প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা আমি বলতে চাই। আমি দেখেছি, অনেক সময় ইয়োরোপীয় পর্যটকরা বেশ একটা উদাসীন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিন্দুস্থানের এইসব শহরের কথা বলে থাকেন। তাঁদের মন্তব্য শুনে আমি অবাক্ হয়ে যাই। পাশ্চাত্ত্য শহরের সঙ্গে এই সব শহরের সৌন্দর্যের তুলনা করেন যখন তাঁরা তখন একটি কথা একেবারেই ভুলে যান যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্যের বিভিন্ন স্টাইলের বিকাশ হয়। প্যারিস, লণ্ডন বা আমস্টার্ডামের স্থাপত্য আর হিন্দুস্থানের দিল্লীর স্থাপত্য এক

ও অভিন্ন হতে পারে না। কারণ ইয়োরোপে যা বাসোপযোগী, হিন্দুস্থানে তা ব্যবহার্য নয়। কথাটা যে কতখানি সত্য তা রাজধানী স্থানান্তরিত করলেই বোঝা যেতে পাবে। ইযোরোপের শহর যদি হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে নতুন পরিকল্পনায় আবার গড়ে তোলার দরকার হবে। ইয়োরোপের শহরের সৌন্দর্য অতুলনীয় স্বীকার করি। কিন্তু তার একটা নিজস্ব রূপ আছে, যেটা শীতপ্রধান দেশের শহরের রূপ। সেইরকম দিল্লারও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যেটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের শহরের সৌন্দর্য। হিন্দুস্থানে গরম এত বেশি যে কেউ সেখানে পাযে মোজা পাবে না, এমন কি স্বয়ং সম্রাটও না। চটিই হল পায়ের একমাত্র আচ্ছাদন। মাথার আভরণ পাগড়ি, তাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড়ের। অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদও সেই অনুপাতে খুব সূক্ষ্ম ও হালকা। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ কোনো ঘরের দেয়ালে হাত দেওয়া যায় না, অথবা কোনো বালিশে মাথা দিযে শোয়াও যায় না। বছরে ছ'মাসেরও বেশি সকলে প্রায় বাইরের খোলা জাযগায় শুযে ঘুমোয়। সাধারণ লোক রাস্তাতেই শুয়ে থাকে। বণিক বা অন্যান্য ধনিক ব্যক্তিরা তাঁদের বাগানে বা খোলা বারান্দায় শুয়ে নিদ্রা যান। তা না হলে ভাল করে ঘরের মেঝে জলে ধুযে, তারপর ঘুমোন। এই অবস্থায়, একবার কল্পনা করুন যে আমাদের এই সব শহরের কোনো রাস্তা যদি তার ঘিঞ্জি ঘরবাড়িসহ হিন্দুস্থানের কোনো শহরে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে কি হতে পারে? ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি, তার উপর প্রত্যেকটি বাড়ির উপরতলার শেষ নেই যেন। এই সব বাড়িতে এইভাবে কি সেখানে মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভবপর? রাতে কি সেখানে এই সব বাড়ির বন্ধঘরে ঘুমিয়ে থাকা যায়, যখন বাইরে হাওয়া পর্যন্ত থাকে না এবং গরমে দম বন্ধ হযে আসে? মনে করুন, একজন ঘোড়ায় চড়ে বহুদূর ঘুরে ক্লান্ত হযে ফিরলেন। গ্রীষ্মের উত্তাপে তিনি প্রায় অর্ধমৃত, ধূলায় আচ্ছাদিত, নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছেন না। এমন অবস্থায় যদি তাঁকে একটি সঙ্কীর্ণ ঘুপচি সিঁড়ি ভেঙে চারতলা-পাঁচতলার কোনো কক্ষে উঠতে হয় এবং সেখানেই বিশ্রাম নিতে হয়, তাহলে কি অবস্থা হয় তাঁর? হিন্দুস্থানে এসবের কোনো বালাই নেই। এক গ্লাস ভাল ঠাণ্ডা পানীয় পান করে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে, মুখ-হাত-পা ধুযে আরামকেদারায় আপনাকে সেখানে শুয়ে পড়তে হবে এবং পাখাওয়ালাকে বলতে হবে, টানাপাখা টানতে। সে যাই হোক, এখন আমি আপনাকে দিল্লী শহরের আসল বর্ণনা সবিস্তারে

দিচ্ছি, তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, দিল্লীকে সুন্দর শহর বলা চলে কি-না, অথবা দিল্লীর কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কি-না।

দিল্লীর কাহিনী

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বর্তমান বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের পিতা সাজাহান দিল্লী শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন, নিজের নাম অমর করার জন্য। নতুন রাজধানীর নামকরণ তার নামেই হবে, এই ছিল তাঁর বাসনা; করেছিলেনও তাই। দিল্লী শহর যখন নতুন তৈরি হল, তখন তার নাম রাখা হল 'শাহজাহানাবাদ', সংক্ষেপে 'জাহানাবাদ'। অর্থাৎ সম্রাট সাজাহানের বাসস্থান। সাজাহান স্থির করলেন যে, নতুন দিল্লীতেই তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন, কারণ আগ্রায় গ্রীষ্মের উত্তাপ এত বেশি যে, সেখানে তাঁর পক্ষে বাস করাই সম্ভব নয়। প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন দিল্লী নগরী গড়ে উঠলো। হিন্দুস্থানে এখন আর কেউ দিল্লীকে 'দিল্লী' বলেন না, 'জাহানাবাদ' বলেন। 'জাহানাবাদ' নতুন নাম, এখনও বাইরে তেমন পরিচিত হয়নি, তাই 'দিল্লী' নামেই আমি এখানে তার বর্ণনা করছি।

দিল্লী নতুন শহর, যমুনা নদীর তীরে বেশ প্রশস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। লোয়ের নদীর সঙ্গে যমুনার তুলনা করা যায়। যমুনার তীরে শহরটি গড়ে উঠেছে ঠিক যেন একফালি চাঁদের মতন, দুটি কোণ দুই দিকে এসে তীরের সঙ্গে মিশেছে। এক দিকে নৌকার একটি সেতু দিয়ে অন্য তীরে যাওয়া যায়। যেদিকে যমুনা নদী প্রবাহিত, সেইদিক ছাড়া অন্য সবদিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর তেমন মজবুত নয়, এবং দুর্গের চারিদিকে যেমন খাত থাকে, সেরকম কোনো খাতও নেই। প্রাচীরের পর কেবল চার-পাঁচ ফুট আন্দাজ চওড়া মাটির একটা প্ল্যাটফর্ম মতন আছে, আর প্রায় একশ পা অন্তর তোরণ আছে একটি করে। এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়। আমি নিজে শহরের এই প্রাকার ঘুরে দেখেছি, তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি। যদিও আমি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছিলাম তাহলেও ঘণ্টায় এক লীগের বেশি জোরে যাইনি। শহরতলির কথা বলছি না, কেবল দিল্লী শহরের কথা বলছি। শহরের তুলনায় শহরতলির আয়তন আরও অনেক বড়। শহরের একদিকে প্রায় লাহোর পর্যন্ত সারবন্দী গৃহশ্রেণী চলে গেছে—প্রাচীন শহরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এবং তিন-চারটি ছোট ছোট শহরতলি অঞ্চল। এইভাবে শহরটি আয়তনে এত বড় হয়ে উঠেছে

যে দিল্লীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরলরেখা টানলে প্রায় দেড় লীগ দৈর্ঘ্য হবে। বৃত্তের ব্যাস সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ শহরতলিতে বাগান ও খোলা জায়গা আছে যথেষ্ট। তাই সব মিলিয়ে, আয়তনের দিক দিয়ে দিল্লী শহরকে বেশ রীতিমত বড় শহর মনে হয়।

দুর্গের অভ্যন্তর

অন্তর্দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, জেনানামহল আছে এবং আরও অন্যান্য সব রাজকীয় বিভাগাদি আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা যথাসময়ে করব। দুর্গটি অর্ধবৃত্তাকার। সামনে নদী। প্রাসাদ ও নদীর মধ্যে বালুকাময় প্রশস্ত ব্যবধান। এই প্রশস্ত স্থানে, নদীতীরে হাতির লড়াই হয়, বাদশাহ দেখেন। আমীর-ওমরাহ, রাজামহারাজাদের সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ হয়। রাজ-প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে বাদশাহ এই সব ক্রীড়া ও কুচকাওয়াজ দেখেন। অন্তর্দুর্গের প্রাচীর ও তার গোলাকার গোপুরগুলি কতকটা বাইরের নগরের প্রাচীর ও গোপুরের মতন, কিন্তু অন্তর্দুর্গের প্রাচীর ইট ও লাল পাথরের তৈরি বলে তারও বেশি সুন্দর দেখায়। নগর-প্রাচীরের চেয়ে অন্তর্দুর্গের প্রাচীর অনেক বেশি মজবুত ও দৃঢ় এবং তার মধ্যে ছোট ছোট কামান বাসানো থাকে, নগরের দিকে মুখ করে। নদীর অন্যান্য দিক পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখায় জল থাকে, মাছ থাকে, আর তার সামনে থাকে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড। এসব অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে যতটা জমকালো মনে হয়, আসলে ততটা নয়। আমার ধারণা, পরিমিত পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ নিয়ে এই ধরনের আত্মরক্ষার দুর্গ সহজেই ধূলিসাৎ করা যায়।

পরিখাসংলগ্ন বিরাট উদ্যান, নানারকমের ফুল ও গাছপালায় সাজানো। বিশাল লাল রঙের প্রাচীরের পাশে এই সুবিস্তৃত সবুজের সমাবেশ অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। বাগানের পাশেই বাদশাহী বাগ এবং তার ঠিক উল্টো দিকে শহরের দুটি বড় বড় রাজপথের সংযোগস্থল। যেসব হিন্দু রাজা মোগল বাদশাহের বাধ্যতা স্বীকার করেছেন এবং তার জায়গীর বা তনখা পান, তাঁরা প্রতি সপ্তাহে যখন দিল্লীতে কুচকাওয়াজ করতে আসেন তখন এই বাগের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকেন। তাঁরা চারদেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চান না—মুক্ত স্থানে স্বাধীনভাবে থাকতে চান। প্রধানতঃ এই রাজারা রাজপুত রাজা। দুর্গের মধ্যে সাধারণতঃ ওমরাহ ও মনসবদাররা কুচকাওয়াজ করার জন্য অবস্থান করেন।

এই স্থানেই বাদশাহের ঘোড়াগুলিকে নিয়ে নিয়মিত দৌড় করানো হয়। এখান থেকে বাদশাহী অশ্বশালা খুব বেশি দূর নয়। এখানেই যেসব অশ্ব নতুন আমদানি হয় বাদশাহের আস্তাবলে, তাদের পরীক্ষা করা হয়। যদি তুর্কী অশ্ব হয়, অর্থাৎ তুর্কীস্থান থেকে আমদানি হয় এবং যদি দেখা যায় যে তার যথেষ্ট শক্তিসামর্থ্য ও তেজ আছে, তাহলে তার উরুতে বাদশাহী মোহর অঙ্কিত করে দেওয়া হয়। তাছাড়া যে আমীরের অধীনে সেই অশ্ব থাকবে, তাঁরও একটা ছাপ দেওয়া হয়। ছাপ দেগে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, একই ঘোড়া কুচকাওয়াজের সময় যাতে অন্যের ঘোড়ার সঙ্গে মিশে যেতে না পারে।

বাজারের সংবাদ

কাছেই একটি বাজার আছে যেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। বিচিত্র সব পণ্যদ্রব্য নানাদেশ থেকে আমদানি হয় সেখানে। জিনিসের মতন নানারকমের সব লোকজনেরও সমাবেশ হয় সেইখানে। যতরকমের ভণ্ড, বুজরুক, হাতুড়ে বৈদ্য, জাদুকর ইত্যাদি বাজে যা আছে সব এসে জমা হয়

১ আকবর বাদশাহ অত্যন্ত অশ্বপ্রিয় ছিলেন। আরবদেশের ঘোড়া, ইরাক, রুম তুর্কীস্থান, বাদকসান, সিরবান, তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ থেকে ভাল ভাল অশ্ব হিন্দুস্থানে আমদানি হত। আকবর বাদশাহের অশ্বশালায় সবসময় প্রায় বারো হাজার অশ্ব মজুত থাকত। ভাল অশ্ব যখনই আমদানি হত, তখনই তিনি পুরাতন অশ্ব আমীর-ওমরাহদের দান করে দিয়ে নতুন অশ্ব কিনতেন। হিন্দুস্থানে যেমন ভাল জাতের অশ্ব ছিল, তেমনি অশ্ববিদ্যাবিশারদ বড় বড় পণ্ডিতও ছিলেন। ভারতের কচ্ছ প্রদেশে অতি উত্তম শ্রেণীর অশ্ব পাওয়া যেত, আরবী অশ্বের তুলনায় কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়। বাংলার উত্তরে কোচপ্রদেশে তুর্কী অশ্বের ঔরসজাত এবং পাহাড়ী ভুটিয়া অশ্বিনীর গর্ভজাত একপ্রকার অশ্ব জন্মাত, তার নাম ছিল 'টাঙ্গন' অশ্ব। বাদশাহ এত অশ্বপ্রিয় ছিলেন যে, ভারতবর্ষে যেসব ব্যবসায়ী অশ্ব বিক্রি করতে আসতেন তিনি তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করার জন্য, 'আমীর কারাভানসরাই' ও 'তেপচকী' নামে দুজন সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। অশ্বশালায় সাধারণতঃ দুটি বিভাগ থাকত—একটি খাসবিভাগ, আর একটি সাধারণ বিভাগ। খাসবিভাগে আরবী, পারসী ও কচ্ছপ্রদেশের অশ্ব থাকত এবং সাধারণ বিভাগে থাকত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অশ্ব। মোগল আমলে অশ্বযান ব্যবহৃত হত না, লোকে অশ্বের পিঠে আরোহণ করে বেড়াত। অশ্বারোহণে অপটু পুরুষ সমাজে নিন্দনীয় হতেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় যখন ইংরেজদূত সার টমাস্ রো ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি বাদশাহকে উপঢৌকন দেবার জন্য দু-তিনরকমের ঘোড়ার গাড়ি সঙ্গে এনেছিলেন। জাহাঙ্গীর সেই বিলিতী গাড়ির নকলে কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ি তৈরি করান। এখনও আগ্রা অঞ্চলে সেই পুরাতন ঢঙের ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন এই সময় থেকেই হয়। তার আগে একাগাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তাতে ভাল অশ্ব বিশেষ জোতা হত না।—'আইন-ই-আকবরী' থেকে সংকলিত—অনুবাদক।

বাজাবে। গণৎকার ও জ্যোতিষীদেবও বেশ ভিড় হয় এবং তাদেব মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানেব এই সব বিচক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানীরা মাটিতে শতরঞ্জ বা আসন পেতে চুপ কবে বসে থাকে, হাতে থাকে নানারকমের কাঁটাকম্পাস, সামনে খোলা থাকে অদৃষ্টশাস্ত্রেব একটি বিশাল গ্রন্থ এবং তার পাশে থাকে গ্রহ-উপগ্রহাদির স্থানাঙ্কিত একটি চিত্রপট। যাত্রীবা তাই দেখে আকৃষ্ট হয এবং মনে কবে যে গণৎকাববা যেন ভগবানেব সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাদেব মুখ দিযে যা উচ্চাবিত হবে তা কখনও মিথ্যা হতে পাবে না, সাধাবণ লোকেব এই বিশ্বাস। অত্যন্ত গবীব যাবা তাবা হযত সামান্য একটি পয়সা দিযেই তাদের ভবিষ্যৎ জানবার সুযোগ পায। সুযোগটা সামান্য নয। গণৎকার প্রত্যেক মক্কেলেব হাত ও মুখ ভালভাবে নিবীক্ষণ কবে, তাবপব গণনাব ভান কবে নানাবকমেব দুবোধ্য ভাষায কি সব আবোল তাবোল বিডবিড কবে ব'লে বইয়েব পাতা উল্টোয। দেখাতে চায যেন সে কত বড পণ্ডিত এবং গণৎকাবিটা কত শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপাব। এইসব ভডং দেখিয়ে সে মক্কেলকে একেবাবে বশ কবে ফেলে এবং তারপব সেই শুভ মুহূর্তটিব কথা তাব কানে কানে বলে দেয়। অমুক মাসে অমুক দিনে ঐ সময়ে যদি তাব মক্কেল ঐ ব্যবসা আবম্ভ কবে তাহলে তাব সাফল্য ও উন্নতি সুনিশ্চিত, কেউ তাব লাভেব পথ রোধ কবতে পাববে না। শুধু পুরুষ মক্কেলবাই যে হাত দেখাতে আসে তা নয়। আমি দেখেছি, স্ত্রীলোকেবাও হাত দেখাতে ও ভাগ্য গণাতে আসে। আপাদমস্তক সাদা ওড়নায ঢেকে স্ত্রীলোকেরা বাজাবে এসে গণৎকাবেব সামনে হাত বাব কবে বসে এবং নিজেদেব ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এমন কোনো গোপন কথা নেই যা তাবা ঈশ্ববেব মূর্তিমান প্রতিনিধি এই গণৎকাবদেব কাছে বলে না। অপরাধীবা যেমন কবে তাদেব অন্যায স্বীকাব করে অনুতপ্ত হয, ঠিক তেমনি কবে তারা নিজেদেব ব্যক্তিগত জীবনেব সব গোপন কথা গণৎকাবদেব কাছে স্বীকার কবে এবং মুক্তির পন্থা জানতে চায়। এই সব অশিক্ষিত, কুসংস্কার-গ্রস্ত লোকেদেব দৃঢবিশ্বাস যে গ্রহ-উপগ্রহেব একটা বিবাট প্রভাব আছে মানুষের জীবনে এবং সেটা এই মাটির পৃথিবীতে গণৎকাররাই নিয়ন্ত্রণ কবে।

পর্তুগীজ গণৎকার

এই গণৎকারদের মধ্যে একজনের কথা আমি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। একজন বিধর্মী পলাতক পর্তুগীজ গণৎকারের কথা। এই ব্যক্তিও ঠিক অন্যান্য

গণৎকারদের মতন একটি আসন পেতে চুপ করে বসে থাকত বাজারের মধ্যে এবং তারও যথেষ্ট মক্কেল ছিল, যদিও লেখাপড়া কিছুই সে জানত না। বহুদিনের পুরনো একটি নাবিকের কম্পাস ছিল তার একমাত্র সম্বল, এবং তাই দিয়েই সে অন্যদের মত মানুষের নাড়ীনক্ষত্র ও ভাগ্য গণনা করত।[২] জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো বই তার থাকার কথা নয়, জানেও না সে কিছু। পর্তুগীজ ভাষায় পুরনো দু'একখানি প্রার্থনা পুস্তক খুলে সে বসে থাকত এবং তার ভিতরের ছবিগুলি মক্কেলদের দেখিয়ে বলত—'এগুলো হল গ্রহ-নক্ষত্রের পর্তুগীজ চিত্র।' লজ্জাসরমের কোনো বালাই ছিল না তার। একবার এক বেভারেণ্ড জেসুইট ফাদার তাকে বাজারের মধ্যে হাতেনাতে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করেন: 'এরকম বিধর্মীর মতন আচরণ করার কারণ কি?' উত্তরে পর্তুগীজ গণৎকারটি বলে, 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—যে দেশের যা আচার তাই পালন করা কর্তব্য।' ফাদার অবাক্ হয়ে চলে যান।

আমি শুধু এখানে প্রকাশ্য বাজারের গণৎকারদের কথা বললাম। যারা রাজা-বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের দরবারে আনাগোনা করে, তারা বাজারের গণৎকারের মতন স্বল্পবিত্ত নয়। তারা রীতিমত ধনী ব্যক্তি এবং প্রতিপত্তি তাদের যথেষ্ট। যেমন অর্থ তাদের, তেমনি তাদের খাতির ও খ্যাতি। শুধু হিন্দুস্থানে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্র আমি এই কুসংস্কারে মোহমুগ্ধ দেখেছি সাধারণ লোককে, সর্বস্তরের লোককে। রাজা-মহারাজারা, নবাব-বাদশাহরা এই সব জ্যোতিষী, গ্রহাচার্য ও গণৎকারদের রীতিমত উচ্চহারে বেতন দেন এবং সর্বব্যাপারে, তা সে যত সামান্যই হোক, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। গ্রহাচার্য ও গণৎকারদের আদেশ ছাড়া তাঁরা একপাও পথ চলেন না জীবনে। আচার্যরা পাঁজিপুথি দেখে, গ্রহ-উপগ্রহ গুণে, শুভযাত্রার বা কার্যারম্ভের দিনক্ষণটি বলে দেন। হিন্দুরা পাঁজিপুথি খুলে বলেন, মুসলমানরা বলেন কোরান খুলে।

বাইরের শহর

বাদশাহী বাগের সামনে শহরের যে দুটি রাজপথ এসে মিশেছে বলে আগে উল্লেখ করেছি, তাদের প্রস্থ পঁচিশ-ত্রিশ পায়ের বেশি নয়। আঁকাবাঁকা পথ নয়,

২। নাবিকের কম্পাস চীনদেশের গণৎকাররা অনেক আগে থেকেই ভাগ্যগণনায় জন্য ব্যবহার করতেন—অনুবাদক।

সরলরেখার মতন সোজা পথ, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখা যায়। যে পথটি লাহোর ফটক পর্যন্ত গেছে তার দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। ঘরবাড়ির দিক থেকে দুটি রাজপথের দৃশ্য প্রায় এক। আমাদের দেশের 'প্লেস রয়ালে'র মতন, রাস্তার দুই দিকেই তোরণশ্রেণী। পার্থক্য শুধু এই যে হিন্দুস্থানের তোরণগুলি কেবল ইটের তৈরি এবং উপরে কেবল একটি চাতাল ছাড়া আর কোনো গৃহ নেই। আমাদের 'প্লেস রয়ালে'র সঙ্গে তার আরও একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল এই যে, একটি তোরণ থেকে অপর তোরণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ নেই। মধ্যবর্তী স্থানে খোলা দোকানঘর। দিনের বেলা এইসব দোকানঘরে নানাশ্রেণীর কারিগররা কাজ করে, মহাজনরা বসে বসে বাণিজ্যিক লেনদেন করে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখে। তোরণের ভিতর দিকে একটি ছোট দরজার মধ্য দিয়ে গুদামঘরে যাওয়া যায়। রাত্রে মালপত্র সব ঐ গুদামঘরেই বন্ধ থাকে।

তোরণের পিছন দিকে গুদামঘরের উপর বণিকদের বসতবাড়ি। রাস্তা থেকে বেশ সুন্দর দেখায় এবং মনে হয় বেশ বড় বড় কামরাওয়ালা বাড়ি। ঘরে যথেষ্ট আলোবাতাস আসে এবং রাস্তার ধুলো থেকে ঘরগুলি অনেক দূরে। দোকানঘরের উপরের ছাদে চাতালে তারা রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে। সারা রাস্তা জুড়ে ঘরগুলি তৈরি নয়। মধ্যে মধ্যে তোরণের উপরেও বেশ ভাল ভাল ঘরবাড়ি আছে দেখা যায়। সাধারণতঃ সেগুলি খুব নিচু, রাস্তা থেকে বড় একটা দেখা যায় না, বা বোঝা যায় না। অবস্থাপন্ন ধনিক ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁরা অন্য মহল্লায় বাস করেন এবং দিনের বেলা কাজের সময় এখানে আসেন।

আরও পাঁচটি রাস্তা আছে শহরের মধ্যে, কিন্তু যে দুটি রাস্তার কথা বলেছি আগে, তাদের মতন লম্বা বা চওড়া নয়। অন্যান্য দিক থেকে রাস্তাগুলি দেখতে প্রায় একরকমই বলা চলে। এছাড়া আরও অনেক ছোটখাটো রাস্তা ও অলিগলি আছে, তোরণও আছে রাস্তায় অনেক। কিন্তু রাস্তাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজাবাদশাহের তৈরি বলে তাদের পরিকল্পনার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় নেই। এইসব রাস্তার উপর আমীর-ওমরাহ, মনসবদার, কাজী, বিচারক, বণিক প্রভৃতির বাড়িঘর বিক্ষিপ্তভাবে তৈরি। দেখতে মোটামুটি ভালই। ইট-পাথরের তৈরি বাড়ির সংখ্যা খুব অল্প, অধিকাংশই মাটি ও খড়ের তৈরি বাড়ি। মাটি ও খড়ের তৈরি হলেও, বেশ খোলামেলা এবং দেখতে বেশ সুন্দর। বাড়ির সামনে খোলা জায়গা ও বাগান এবং ভিতরেও ভাল আসবাবপত্র আছে।

লম্বা লম্বা শক্ত ও সুন্দর বেতের উপর বেশ পুরু খড়ের ছাউনি। দেওয়াল মাটির, তার উপর চুনের প্রলেপ দেওয়া। দেখতে সত্যিই সুন্দর।

এইসব সুন্দর বাড়ির মধ্যে মধ্যে প্রচুর ছোট ছোট খড়ের চালাঘর। এইসব চালাঘর সাধারণ সৈনিক, সিপাই ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর সাধারণ ভৃত্যদের বসবাসের জন্য তৈরি। দিল্লী শহরের মধ্যে এইরকম অসংখ্য খড়ের চালাঘর থাকার জন্য এত ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন যখন লাগে এবং বছরে দু-একবার লাগেই, তখন চারিদিকে শহরময় অতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। সারা দিল্লী শহর জুড়ে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে। এই গত বছরেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল দিল্লীতে, প্রায় ষাট হাজার খড়ের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মকালে যখন মধ্যে মধ্যে ঝড় বইতে থাকে তখনই আগুন লাগে বেশি, এবং ঝড়ের জন্যই আগুন অতিদ্রুত ভয়াবহ ব্যাপক রূপ ধারণ করে। গত বছর এইভাবে তিন বার আগুন লাগে দিল্লী শহরে (অর্থাৎ ১৬৬২ সালে)। খড়ের জন্য এত দ্রুত আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে বহু ঘোড়া ও উটও আগুনে পুড়ে মারা যায়। প্রাসাদের ও হারেমের অনেক স্ত্রীলোকও আগুনের শিখায় দগ্ধ হয়ে অসহায় অবস্থায় মারা যায়। এইসব স্ত্রীলোক এত অসহায় ও লাজুক যে ঘরে আগুন লাগলেও বাইরে বেরিয়ে মুখ দেখাতে তারা লজ্জা পায়। সেইজন্য জেনানামহলের স্ত্রীলোকরা অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়।

মধ্যযুগের শহর

দিল্লীর এইসব মাটির চালাঘরের আধিক্যের জন্য আমার সব সময় মনে হয়, দিল্লী আধুনিক অর্থে শহর ও নগর নয়, কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। অথবা মনে হয়, দিল্লী একটি বিরাট সামরিক শিবির, তা ছাড়া কিছু নয়। সামরিক শিবিরে যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, দিল্লীতেও তাই আছে, তার বেশি কিছু নেই। আমীর-ওমরাহদের ঘরবাড়ি যদিও নদীর তীরে ও শহরতলিতেই বেশি, তাহলেও তার মধ্যে কোনো পরিকল্পনার কোনো চিহ্ন নেই। চারিদিকে সব ছড়ানো, অবিন্যস্ত ঘরবাড়ি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি হল উন্মুক্ত বাড়ি, চারিদিক খোলা বাড়ি। আলোবাতাস প্রচুর পরিমাণে যে বাড়িতে পাওয়ার সুবিধা আছে, সেই বাড়িই এখানে সুন্দর। সুতরাং ভাল বাড়ির সামনে খোলা জায়গা, বাগান, গাছপালা, পুকুর, বড় হলঘর, ঠাণ্ডা নিচের ঘর ইত্যাদি থাকবেই। মাটির নিচে

যে ঠাণ্ডাঘর করা হয় সেখানে টানাপাখা টাঙানো থাকে এবং দিনের বেলায় প্রচণ্ড উত্তাপের সময় সেখানে গৃহস্বামী আশ্রয় নেন। অনেকে দরজা-জানালায় খস্‌খসের পর্দা ঝুলিয়ে রাখেন। অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের বাড়ি খস্‌খস তো থাকেই, তার কাছাকাছি জলের চৌবাচ্চাও থাকে, ভৃত্যেরা সেখান থেকে জল নিয়ে খস্‌খসের পর্দায় ছিটিয়ে দেয়। খস্‌খস সব সময় ভিজে থাকলে বাইরের গরম হাওয়া ভিতরে ঢুকতে পারে না এবং ঘর ঠাণ্ডা থাকে। এখানকার লোক মনে করে যে বেশ সুন্দর আরামপ্রদ বসতবাড়ি যদি তৈরি করতে হয় তাহলে একটি সুন্দর ফুল বাগান তো বাড়ির সঙ্গে চাইই, উপরন্তু বাড়ির চার কোণে চারটি মানুষ-সমান উঁচু বসবার জায়গা থাকা চাই, যেখানে বসে সমস্ত শরীরে মুক্ত আলো-বাতাস লাগানো যেতে পারে। বাস্তবিকই প্রত্যেক ভাল বাড়িতে এইরকম উঁচু চাতাল আছে এবং সেখানে গ্রীষ্মকালে বাড়ির লোকজন রাতে শুয়ে থাকে। বাইরের চাতাল থেকে ভিতরে শোবার-ঘরে যাবার পথ আছে এবং সহজেই যাওয়া যায়। হঠাৎ বৃষ্টি হলে বা বর্ষার দিনে, খাটিয়া স্বচ্ছন্দে শয়নকক্ষে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। কেবল বর্ষার সময় নয়, হিমের সময়ও এইভাবে বাইরে থেকে উঠে গিয়ে ভিতরে শোবার দরকার হয়।

এইবার ভিতরের ঘরের বর্ণনা দিচ্ছি। ভাল ভাল বাড়ির ভিতরের ঘরের মেজের উপর প্রায় চার ইঞ্চি পুরু গদি পাতা, তার উপরে সাদা ধবধবে চাদর বিছানো থাকে, গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে সিল্কের কার্পেট। ঘরের বিশেষ কোণে আরও ছোট ছোট দু-একটি গদি পাতা থাকে, এবং তার উপর সুন্দর ফুললতাপাতার কারুকাজকরা চাদর বিছানো থাকে। এগুলি গৃহস্বামীর নিজের বসবার জন্য, অথবা তাঁর বিশেষ সম্মানিত অতিথিঅভ্যাগতের জন্য। এইসব ফরাসের উপর ভাল ভাল তাকিয়া ফেলা থাকে, দিব্য হেলান দিয়ে বসে গল্পগুজব করার জন্য। নানারকমের কারুকাজকরা ভেলভেটের তাকিয়া, মখমল ও সাটিনের তাকিয়াই বেশি। মেঝে থেকে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি থাকে অনেক, নানা আকারের ও নক্সার কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গিতে নানারকমের জিনিসপত্র থাকে—ফুলদানি গ্লাস ইত্যাদি। উপরের সিলিং গিল্টি-করা ও রং করা, কিন্তু মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের কোনো চিত্র অঙ্কিত নয়। মানুষ বা জানোয়ারের চিত্র সিলিং-এ আঁকা নাকি ধর্মনিষিদ্ধ। সেইজন্য শুধু গিল্টি-করা ও রং-করা সিলিংই বেশি দেখা যায়।

এই হল সংক্ষেপে দিল্লী-শহরের ঘরবাড়ির বিবরণ এবং সুন্দর বাড়ির বিশুদ্ধ

পরিচয়। এইরকম সুন্দর বাড়িঘর দিল্লী শহরে যথেষ্ট আছে। সুতরাং একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে, ইয়োরোপের শহরের প্রসঙ্গে উত্থাপন না করেও, যে হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী কুৎসিত নয়, যথেষ্ট সুন্দর এবং প্রচুর মনোরম ঘরবাড়ি দিল্লীতে আছে। ইয়োরোপের শহরের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই এবং তার সঙ্গে তুলনা করাও উচিত নয়।

দোকানপত্তরের কথা

সুন্দর ঝকঝকে দোকানপত্তরের জন্যও ইয়োরোপীয় নগরের সৌন্দর্য বাড়ে। দিল্লীতে সেরকম কোনো দোকানপাতি নেই। যদিও দিল্লী শহর মোগল সম্রাটের শ্রেষ্ঠ রাজধানী এবং নানারকমের মূল্যবান জিনিসপত্তরেরও আমদানি হয় সেখানে, তাহলেও দিল্লী শহরের মধ্যে আমাদের এখানকার শহরের মতন পথঘাট নেই, এমন কি সারা এশিয়া মহাদেশেই নেই বলা চলে। মূল্যবান পণ্যদ্রব্য সাধারণতঃ সেখানে গুদামজাত করে রাখা হয় এবং দোকানপাতি কখনও সাজানো হয় না। দোকান-সাজানো ব্যাপারেই যেন দিল্লীর ব্যবসায়ীরা অভ্যস্ত নয়। কদাচিৎ এক-আধটি দোকান এরকম দেখা যায়, যেখানে ভাল ভাল দামী রেশমী বস্ত্র, সোনারুপোর জরির কাজ করা নানারকমের ঝালর, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরকম একটি দোকানের বদলে পঁচিশটি দোকান দেখা যায় যেখানে কিছুই সাজানো থাকে না দেখবার মতন। মাটির পাত্রভরা তেল, ঘি, মাখন, বস্তা বস্তা চাল গম ছোলা ডাল ইত্যাদি নানারকমের খাদ্য মজুত করা থাকে স্তূপকারে। এসব অধিকাংশই হল হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণীর খাদ্য, যাঁরা মাংস খান না বেশি। দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মুসলমানরাও অবশ্য তাই খায় এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে অধিকাংশেরই এই খাদ্য খেতে হয়।[৩]

এছাড়া একটি ফলের বাজার আছে, যা বাস্তবিকই দেখবার মতন। ফলের বাজারে দোকানের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং গ্রীষ্মকালে এইসব দোকান নানারকমের ফলে ভর্তি হয়ে যায়। নানাদেশ থেকে ফলের আমদানি হয় দিল্লীর বাজারে। পারস্য থেকে, বল্‌খ বোখারা, সমরকন্দ থেকে ফলের আমদানি হয় ঝুড়ি-ঝুড়ি। কতরকমের ফল তার ঠিক নেই—পেস্তা, বাদাম, আখরোট, খুবানী ইত্যাদি।

৩। বার্নিয়ের এখানে বোধ হয় মুদির দোকান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দোকানের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হল যে, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ বা অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির সাজানো বাহারে দোকান দিল্লীতে বেশি ছিল না—মুদির দোকান ও খাদ্যের দোকানই বেশি ছিল।

এসব গ্রীষ্মকালে আমদানি হয়। শীতকালে আসে চমৎকার আঙুর-ফল, সাদা কালো রঙের। ঐসব একই দেশ থেকে আসে, সযত্নে তুলোয় ঢাকা। তিন-চার রকমের আপেল, ডালিম-বেদানাও আসে প্রচুর। আর আসে তরমুজ, সারা শীতকাল থাকে, নষ্ট হয় না। অত্যন্ত দামী ফল এই তরমুজ, এক-একটির দাম প্রায় দেড় ক্রাউন করে। এর চেয়ে নাকি অভিজাত ফল আর কিছু নেই। আমার ওমরাহদের তরমুজ না হলে চলে না। এই ফলের জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করেন। ফলমূল এমনিতেও অবশ্য তাঁরা যথেষ্ট খান। আমার কর্তা যিনি ছিলেন তিনিই প্রায় দৈনিক বিশ ক্রাউন করে নিজের ফলের জন্য খরচ করতেন।

গ্রীষ্মকালে তরমুজের দাম সস্তা হয়, কিন্তু তখন খুব ভালো জাতের তরমুজ সংগ্রহ করাও খুব কষ্টকর। পারস্য থেকে বীজ আনিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে মাটি তৈরি করে তাতে সেই বীজ বুনে দিতে হয়। সাধারণতঃ অভিজাত-শ্রেণী লোক ছাড়া অন্যেরা তরমুজের চাষ করতে পারে না। ভাল তরমুজ পাওয়া সেইজন্য খুব শক্ত, কারণ যে-কোনো মাটিতে তরমুজ হয় না এবং মাটি খুব ভাল না হলে এক বছরেই তরমুজের বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

আম্রফল বা আম গ্রীষ্মকালে মাস দুই খুব সস্তা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।[৪] কিন্তু দিল্লী অঞ্চলে বিশেষ ভাল আম তেমন পাওয়া যায় না। ভাল ভাল উৎকৃষ্ট আম আসে বাংলাদেশ থেকে, আর গোলকুণ্ডা ও গোয়া থেকে। অদ্ভুত সুস্বাদু ফল এই আম। আমের চেয়ে বোধহয় কোনো মিষ্টান্নও সুস্বাদু নয়। তরমুজ সারা বছর ধরে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু দিল্লী অঞ্চলের তরমুজের রঙ বা মিষ্টতা নেই। ভাল তরমুজ সাধারণতঃ ধনীলোকদের গৃহেই দেখা যায়, কারণ তাঁরা বাইরে থেকে বীজ আনিয়ে রীতিমত খরচ করে ও যত্ন করে তার চাষ করেন।

ময়রার দোকান দিল্লী শহরে অনেক আছে, কিন্তু মিষ্টান্নের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, রুচি বা আস্বাদ কোনো দিক থেকেই নেই। মিষ্টান্ন খারাপ তো বটেই, তা ছাড়া মাছি ও ধুলোতে ভর্তি—আহারের যোগ্য নয়। রুটিওয়ালাও শহরে অনেক আছে, কিন্তু তাদের চুল্লী আর আমাদের এদেশের রুটিওয়ালাদের চুল্লী এক নয়। চুল্লী ঠিক মতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি নয়। সেইজন্য রুটি

৪। 'আম' ও 'আম্র' উত্তর ভারতের প্রচলিত শব্দ। আমের তামিল নাম হল 'মানকে'। এই 'মানকে' থেকে পর্তুগীজরা করেন 'মঙ্গ' এবং তাকে ইংরেজী করা হয় 'ম্যাঙ্গো'।—অনুবাদক

ভালভাবে তৈরি করা সম্ভব হয় না এবং সেঁকাও হয় না। প্রাসাদদুর্গের মধ্যে যে রুটি তৈরি হয়, সেগুলো অনেকটা ভাল। আমীর-ওমরাহরা সাধারণতঃ নিজেরা ঘরেই রুটি তৈরি করে নেন, বাইরের রুটিওলাদের রুটি খান না। রুটি তৈরি করবার সময় টাটকা মাখন, দুধ বা ডিম দিতে তারা কোনো কার্পণ্য করে না, কিন্তু এত করা সত্ত্বেও রুটির আস্বাদ কিরকম যেন পোড়া-পোড়া মনে হয়, খেতে তেমন ভাল হয় না। ঠিক রুটির যে স্বাদ তা যেন হয় না, কতকটা কেকের মতন হয়। আমাদের এখানকার রুটির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই করা চলে না।

বাজারে অনেক দোকান আছে, যেখানে নানারকমের রান্না মাংস বিক্রি হয়। কিন্তু সেইসব বাজারের রান্না মাংস বিশ্বাস করে খাওয়া যায় না, কারণ, কিসের মাংস যে রান্না করা থাকে, তা অনেক সময় বলা মুশকিল। ঘোড়ার মাংস, উটের মাংস, এমন কি ব্যাধিগ্রস্ত মৃত যাঁড়ের মাংসও রান্না করে বাজারের দোকানে বিক্রি করা হয়। সুতরাং বাজারের খাদ্যের উপর নির্ভর করাই যায় না। বাড়িতে রান্না করা ছাড়া তৃপ্তি করে কোনো খাদ্য খাওয়ার উপায় নেই। শহরের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে মাংস বিক্রি হয়, কিন্তু পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস পাঁঠা বলে বেশি চলানো হয়ে থাকে। সেইজন্য মাংস, কেনার সময় খুব হুঁশিয়ার হয়ে মাংস কিনতে হয়, কারণ, গরু ও ভেড়ার মাংসের উত্তাপ বেশি এবং সহজপাচ্য নয়।[৫] সাধারণতঃ কচি পাঁঠার মাংসই ভাল, কিন্তু তার জন্য জ্যান্ত পাঁঠা কেনা দরকার। জ্যান্ত একটা গোটা পাঁঠা কেনা মুশকিল, কারণ পাঁঠার মাংস বেশিক্ষণ রেখে খাওয়া যায় না, তেমন সুগন্ধও নেই। ছাগমাংস যা বাজারে বেশি বিক্রি হয় তা ছাগীর মাংস, অত্যন্ত শক্ত ও ছিবড়ে।[৬]

কিন্তু আমার দিক থেকে এইভাবে অভিযোগ করা বোধহয় অন্যায় হবে; কারণ হিন্দুস্থানের লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে আমি মিশেছি এবং তাদের

৫। বার্নিয়েরের এই মন্তব্য এখন অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। ছাগলের মাংস যে ভেড়ার মাংসের চেয়ে উপাদেয়, একথা এখন আর কেউ মনে করেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু একসময় করতেন বলে মনে হয়।—অনুবাদক

৬। বার্নিয়েরের কথা আজও যে কত সত্য, তা মাংসাশী মাত্রই জানেন। খাদ্যের প্রতি, এমন কি মাংসের প্রতিও বার্নিয়েরের সজাগ দৃষ্টি পড়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক আগে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের কচি পাঁঠার তারিফ করে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বাজারে যে পাঁঠার চেয়ে ছাগীর মাংস বেশি বিক্রি হয়, তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।—অনুবাদক

আচার-ব্যবহারে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমি যে রুটি ও মাংস খেতে পেয়েছি, তার মধ্যে অভিযোগ করার মতন কোনো ত্রুটি দেখতে পাইনি। সাধারণতঃ ভাল খাদ্যই আমি খেতে পেতাম। আমার ভৃত্যকে পাঠিয়ে দুর্গের ভিতর থেকে আমি খাবার কিনে আনতাম। তারাও ভাল খাদ্য দিত, কারণ খাদ্য তৈরির খরচ তাদের বিশেষ লাগত না, অথচ আমি যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনতাম। রাজদুর্গের ভিতর থেকে এইভাবে খাবার কিনে খাই শুনে আমার মনিব হাসতেন। বুদ্ধি খাটিয়ে এই উপায় উদ্ভাবন না করলে, সামান্য দেড়শ ক্রাউন আমি যে মাসিক বেতন পেতাম, তাতে আমার উপোস থাকতে হত। অথচ ফ্রান্সে আমি যদি আট আনা খরচ করি খাদ্যের জন্য, তাহলে বাজার খাদ্য যে মাংস তাও বোধহয় আমি নিয়মিত খেতে পারি।

ভাল জাতের খাসী মোরগ তেমন পাওয়া যায় না, একরকম দুর্লভই বলা চলে। ওদেশের মানুষের জীবজন্তুর প্রতি দয়াটা যেন একটু বেশি মনে হয়। মোরগ বেগমখানার জন্যই প্রধানতঃ বরাদ্দ থাকে। বাজারে সাধারণ মুর্গী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, বেশ ভাল মুর্গী এবং সস্তাও। নানাজাতের মুর্গী পাওয়া যায়, তার মধ্যে একরকমের আছে খুব ছোট ছোট, কচি ও নরম। আমি তার নাম দিয়েছি 'ইথিয়োপিয়ান' মুর্গী বা হাবসী মুর্গী, কারণ তার গায়ের চামড়াটা রীতিমত কালো।[৭] পায়রাও বাজারে বিক্রি হয়, কিন্তু ছোট পায়রা নয়, কারণ বাচ্চা পায়রার উপর ভারতীয়দের মমতা খুব বেশি। একরকমের ছোট ছোট পাখিও বাজারে বিক্রি হয়। জাল ফেলে ধরা হয় পাখিগুলো এবং অনেক দূর থেকে বাজারে আনা হয়। পাখির মাংস মুর্গীর মতন খেতে সুস্বাদু নয়।

দিল্লী অঞ্চলের লোকেরা সেরকম ভাল মৎস্যশিকারী নয়। মাছ ধরতে ভাল জানে না। মধ্যে মধ্যে ভাল মাছ বাজারে আমদানি হয়, কিন্তু তার অধিকাংশই সিঙ্গী ও রুই মাছ। আমাদের এদেশের একজাতীয় মাছের সঙ্গে তার তুলনা হয়। ঠাণ্ডা পড়লে লোকে আর মাছ খেতে চায় না, কারণ শীত বা ঠাণ্ডাকে তারা ভয়ানক ভয় করে, ইয়োরোপীয়রা গরমকে যা ভয় করে তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং শীতকালে যদি কোনো মাছ বাজারে আসে তখনই

৭। বার্নিয়েরের সজাগ দৃষ্টির এটি আর-একটি দৃষ্টান্ত। অন্যান্য পর্যটকরা মাংস কালো রঙের বলেছেন, কিন্তু বার্নিয়ের বলেছেন যে, গায়ের চামড়াই কালো। সামান্য মুর্গীর ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অন্যান্য কোনো সমসাময়িক পর্যটকের মধ্যে পাওয়া যায় না।—অনুবাদক

খোজারা তা কিনে নেয়। খোজারা বিশেষ করে মাছ খুব বেশি ভালবাসে। কেন বাসে জানি না। আমীর-ওমরাহরা চাবুকের ভয় দেখিয়ে জেলেদের মাছ ধরতে পাঠায়। লম্বা-লম্বা চাবুক তাঁদের দরজার সামনে সব সময় ঝোলে।

মোটামুটি যে বিবরণটুকু দিলাম তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে, প্যারিস ছেড়ে দিল্লী শহর একবার বেড়াতে যাওয়া উচিত কি-না। বড-বড় ধনী লোক যাঁরা, তাঁরা অবশ্য বেশ আরামে ও আনন্দেই থাকেন, কারণ তাঁদের হুকুম তামিল করার জন্য চাকরবাকরের অভাব থাকে না। টাকার জোরে তো বটেই, চাবুকের জোরেও তাঁরা লোকজনকে দিয়ে নানারকমের কাজ করিয়ে নেন।

দিল্লী শহরে কোনো মধ্যবর্তী স্তরের বা অবস্থার লোকের অস্তিত্ব নেই। দুই শ্রেণীর লোক দিল্লীতে সাধারণতঃ বেশি দেখা যায়। হয় উচ্চশ্রেণীর ধনী লোক, আর না হয় নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোক। মধ্যশ্রেণী বা মধ্যবর্তী স্তর বলতে কিছু নেই।[৮]

ভোজনের বিবরণ

আমি নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করি এবং খরচ করতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় এমন অবস্থা হয় যে আমার অদৃষ্টে কোনো খাদ্য জোটে না। বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না অধিকাংশ দিন এবং যা-ও বা পাওয়া যায় তা ধনিকদের ভুক্তাবশেষ বা উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু নয়। ভোজনপর্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে মদ, তাও দিল্লীর একটিমাত্র দোকানে পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ মদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে, কারণ দেশী আঙুর থেকে হিন্দুস্থানে বেশ উত্তম মদ তৈরি হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ বাইরের দোকানে বিক্রি হয় না, কারণ হিন্দুদের শাস্ত্র ও মুসলমানদের শরিয়তে মদ্যপান নিষিদ্ধ। যৎকিঞ্চিৎ মদ্য আমি মধ্যে মধ্যে আমেদাবাদ ও গোলকুণ্ডায় পান করেছিলাম, তাও ডাচ ও ইংরেজদের গৃহে অতিথি হয়ে, কিন্তু সে-মদের আস্বাদ তেমন ভাল নয়।[৯] মোগল রাজ্যের মধ্যে মদ যা পাওয়া যায় তা সাধারণতঃ

৮। ভারতীয় সমাজের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'মধ্যবিত্তশ্রেণী' বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিকাশ হয়েছে আধুনিক শিল্পযুগে। মধ্যযুগে 'মধ্যশ্রেণী' বলে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কোনো সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না।

৯। ভোজনবিলাসী বার্নিয়েরের মন্তব্য থেকে মনে হয়, এককালে দেশী মদ বোধহয় বিলাতী মদের চেয়েও ভাল ছিল।

দু-রকমের—শিরাজ ও ক্যানারি। 'শিরাজ' পারস্যদেশ থেকে আমদানি হয়। পারস্য থেকে বন্দর আব্বাসি হয়ে সুরাটে এসে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে দিল্লীতে আসে ৪৬ দিনে। 'ক্যানারি' মদ ডাচরা নিয়ে আসে সুরাটে। কিন্তু এই দু-রকমের মদেরই দাম এত বেশি যে, তার আস্বাদ দামের জন্যই নষ্ট হয়ে যায়।[১০] অর্থাৎ অত বেশি দাম দিয়ে মদ খেতে হলে তা খেতে ভাল লাগে না। প্যারিসে যে মদের পাইট বিক্রি হয়, সেইরকম তিন পাইট মদের দাম দিল্লীতে ছয়-সাত ক্রাউন। একরকমের দেশী মদ চিনি বা গুড় থেকে চোলাই করে এদেশে তৈরি হয়। তাও প্রকাশ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। লুকিয়ে চুরিয়ে লোকে খায়, খৃস্টানরা প্রকাশ্যেই খায়। দেশী আরকজাতীয় মদ পোলাণ্ডের ধেনো মদের চেয়ে অত্যন্ত কড়া, খাবার সময় রীতিমত গলা থেকে বুক পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়। বেশি খেলে নানারকমের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। বিচক্ষণ ও মিতাচারী ব্যক্তি যাঁরা তাঁরা বিশুদ্ধ জল পান করেন অথবা সোডা-লেমনেড জাতীয় কিছু পানীয়। দামেও সস্তা, দেহেও সহ্য হয়, সুতরাং যত খুশি প্রাণভরে পান করতে কোনো বাধা নেই। সত্য কথা বলতে কি, খুব কম লোকই ভারতবর্ষে মদ্যপান করে। মদের প্রতি সেরকম কোনো বিশেষ আসক্তি ভারতবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। এদিক থেকে তাদের মিতাচারী ও সংযমী বলা যায়। দেশের আবহাওয়ার গুণে লোকে হাঁপানি রোগে ভোগে খুব বেশি। কিন্তু বাত, পেটের অসুখ, স্টোন ইত্যাদি ব্যাধির বিশেষ কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই জাতীয় ব্যাধি নিয়ে যদি কেউ বাইরে থেকে আসে তাহলে তার সম্পূর্ণ আরোগ্য হতেও বেশি সময় লাগে না। আমার নিজের এই ব্যাধি ছিল এবং আমি কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠেছিলাম। এমনকি উপদংশ রোগেরও (veneral disease)

১০। ফ্রায়ার (Fryer) লিখেছেন 'বোম্বাই ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি, কিন্তু পর্তুগীজরা ও দেশীয় লোকেরা বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দীর্ঘজীবী। তার কারণ তারা অত্যন্ত সংযমী এবং মদ্য পান করে না। ইংরেজরা খুব বেশি মদ্যপান করে বলে অকালে মারা যায়। বরং বৃদ্ধবয়সে কিছু কিছু মদ্যপান করা উচিত, কিন্তু অল্প বয়সে নয়।' (A New Account of East India and Persia : Hakluyt. Sec. Vol., P. 180.)

ভারতীয় পানীয়ের মধ্যে 'শরবত' অন্যতম। শরবতের প্রচলন হিন্দুযুগেও ছিল, কিন্তু তার বৈচিত্র্য তেমন ছিল না। লেবুর রস ও ফলের শরবত ইত্যাদি নানারকমের শরবতের প্রচলন হয় মুসলমানযুগে। অতিথিকে শরবত পান করতে দেওয়া (চা বা মদ্য নয়) ভারতীয় সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য রীতি।

হিন্দুস্থানে বেশ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তেমন মারাত্মক আকারে দেখা যায় না এবং অন্যান্য দেশের মতন তার ফলাফলও খুব ভয়াবহ নয়।[১২] সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভালই বলা চলে, কিন্তু তাহলেও শীতপ্রধান দেশের লোকের মতন তারা কর্মঠ ও পরিশ্রমী নয়। বোধ হয়, অত্যধিক গরমের জন্য দেহ ও মনের জড়তা তাদের বেশি, কাজেকর্মে তেমন উদ্যোগ ও উৎসাহ নেই। শৈথিল্য ও অবসাদই তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। অবসাদের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই হিন্দুস্থানে। নির্বিচারে সকল শ্রেণীর লোককে এই জড়তা ও অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমন কি, বিদেশী ইয়োরোপবাসীরাও এর হাত থেকে মুক্তি পান না। বিশেষ করে গ্রীষ্মের পরিবেশে যাঁরা তেমন অভ্যস্ত হতে পারেননি, তাঁদের তো কথাই নেই।

কারিগরদের কথা

দিল্লীতে সুদক্ষ কারিগরদের ভাল কারখানা বেশি নেই। অন্ততঃ সেদিক থেকে গর্ব করার মতন বিশেষ কিছু নেই দিল্লীর। তার মানে, ভাল ভাল কারিগর যে ভারতবর্ষে নেই তা নয়। সুদক্ষ কারিগর ভারতের প্রায় সর্বত্রই আছে এবং যথেষ্ট আছে। উঁচুদরের কারুশিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়, যা কারিগররা যন্ত্রপাতি বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও, এবং কোনো গুরুর কাছ থেকে কোনোরকম শিক্ষা না পেয়েও তৈরি করে।[১৩] এক-এক সময় বিদেশী ইয়োরোপীয় শিল্পদ্রব্য তারা এমন নিখুঁতভাবে নকল করে যে আসল কি নকল তা সহজে ধরা যায় না।[১৪] ভারতীয় কারিগররা বেশ চমৎকার বন্দুক বানাতে পারে। সোনার

১২। ভারতীয় ব্যাধি সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বার্নিয়ের বলেছেন যে, হাঁপানি রোগই ভারতবর্ষে বেশি দেখা যায় এবং গ্রীষ্মজনিত চারিত্রিক অবসাদ ও জড়তাকেও তিনি ব্যাধি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাত বা পেটের পীড়া ভারতবর্ষে নেই বললেই হয়—বার্নিয়েরের এই মন্তব্যে আজকাল রীতিমত বিস্মিত হবার কথা। উপদংশ রোগ সম্বন্ধে মন্তব্যও কৌতূহল উদ্রেক করে।—অনুবাদক

১৩। কারিগরদের সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই উক্তি থেকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। কারিগরদের 'গিল্ড' বা শ্রেণী ও সংঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তার বৈশিষ্ট্য হল বংশানুক্রমে কারিগরিবিদ্যায় দীক্ষা দেওয়া। কারিগরদের অনেকের যন্ত্রপাতি নেই বলতে তিনি নিঃস্ব দরিদ্র কারিগরদের কথাই বলতে চেয়েছেন মনে হয়।—অনুবাদক

১৪। ভারতীয় শিল্পকলায়, বিশেষ করে কারুশিল্পে, ইয়োরোপীয় প্রভাব মোগলযুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বার্নিয়েরের এই উক্তি তার প্রমাণ।—অনুবাদক

নানারকমের অলঙ্কার এত সুন্দর তারা তৈরি করে যে, তার কারুকার্য দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। ইয়োরোপের স্বর্ণকাররা এইদিক থেকে কারিগরিতে ভারতীয় স্বর্ণকারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় চিত্রকরদের ছবির প্রশংসা আমি অনেকবার করেছি। বিশেষ করে ছোট-ছোট চিত্রের নৈপুণ্য ও কলাকুশলতার তুলনাই হয় না। একটি চিত্রিত ঢাল দেখেছিলাম একবার, আকবর বাদশাহের আমলে।[১৫] তখনকার দিনের বিখ্যাত কোনো চিত্রকর সাত বছর ধরে ঐ ঢালের চিত্রগুলি এঁকেছিলেন। চিত্রায়নের সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বিস্ময়কর। এরকম বিচিত্র কলাকুশলতা সচরাচর দেখা যায় না। ভারতীয় চিত্রকরদের, আমার মনে হয়, চিত্রের সামঞ্জস্যবোধ বা প্রমাণবোধ (sense of proportion) তেমন সজাগ নয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে মুখের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই শুধরানো যেতে পারে, কোনো গুরুর কাছে শিক্ষা পেলে। শিল্পকলার পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার দরকার এবং তার জন্য দরকার শিক্ষার। ভারতীয় শিল্পীদের এই শিক্ষার অভাব আছে বলে মনে হয়।[১৬]

সুতরাং কেবল প্রতিভার অভাবের জন্যই যে দিল্লী শহরে ভাল শিল্পকলার নিদর্শন তেমন দেখা যায় না, তা নয়। শিল্পীরা যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উৎসাহ

১৫। এইরকম একটি চিত্রিত ঢালের বিবরণ ১৮৯১ সালের ২ শে মার্চ তারিখের বিলিতী 'টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঢালটির নাম 'রামায়ণ ঢাল'। জয়পুরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী গঙ্গা বক্স এই ঢালটিতে রামায়ণের কাহিনী সম্পূর্ণ চিত্রায়িত করেন, জয়পুর মিউজিয়মের অধ্যক্ষ মেজর হেণ্ডলের তত্ত্বাবধানে। রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী ফলকাকারে ঢালের উপর রূপায়িত করা হয়। 'আকবর বাদশাহের আমলের বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রের অনুকরণে গঙ্গা বক্স এই ঢাল চিত্রায়িত করেন। পরে নাকি হেণ্ডলে সাহেব এইরকম একটি মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত ঢালও তৈরি করান। জয়পুরের মিউজিয়মে এই ঢালগুলি এখনও রক্ষিত থাকবার কথা।—অনুবাদক

১৬। ভারতের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার নিখুঁত বর্ণনায় বার্নিয়েরে তাঁর সমসাময়িক পর্যটকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। কিন্তু এখানে ভারতীয় শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা হয়ত সাধারণ শ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু সর্বশ্রেণীর শিল্পীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। বোঝা যায়, অন্যান্য বিষয়ে বার্নিয়েরের অসাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিলেও, শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না। বিশেষ করে, ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে তিনি প্রায় অজ্ঞ ছিলেন বলা চলে। থাকাও স্বাভাবিক। তখনকার দিনের একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার মতন বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়।—অনুবাদক

পতেন, তাহলে ভারতবর্ষে শিল্পকলার আশ্চর্য বিকাশ হত। কিন্তু কোনো উৎসাহই ভারতীয় শিল্পীরা পান না। সাধারণতঃ শিল্পীরা অবজ্ঞার পাত্র এবং তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেহনতের জন্য তাঁরা উপযুক্ত মজুরিও পান না। ধনী লোক যাঁরা, তাঁরা সস্তায় জিনিস কিনতে চান, অর্থব্যয় করতে চান না। কোনো আমীর বা মনসবদার যদি কোনো কারিগরকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চান, তাহলে তাকে বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসেন। অনেক সময় জোর করে, ভয় দেখিয়ে ধরে আনেন এবং হুমকি দিয়ে তাকে কাজে নিযুক্ত করেন। কাজটি যখন শেষ হয়ে যায় তখন প্রভু তাকে যা মজুরী দেন তা তার মেহনত অনুপাতে নয়। দয়া করে যা দেন, তাই তাকে ঘাড় হেঁট করে নিতে হয়। কোনোরকম বাদ-প্রতিবাদ করার অধিকার নেই তার। কারণ তাহলে দানের সঙ্গে আমীর বেত্রাঘাত দক্ষিণা দিতেও দ্বিধা করেন না। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের কাজ করতে হয়। সুতরাং কোথা থেকে তাঁরা কাজের প্রেরণা পাবেন? কি জন্য তাঁরা শিল্পোন্নতির চেষ্টা করবেন? যশ, খ্যাতি, সম্মান, এসবের প্রতি কোনো আকর্ষণই তাদের থাকে না। খেয়ালী ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য কোনোরকম কাজের নামে তাঁরা দায় উদ্ধার করতে চান। তা না হলে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই একটুকরো রুটির জন্য তাঁরা আমীর-ওমরাহদের হুকুম তামিল করেন। এই হল সাধারণ শিল্পীদের অবস্থা। যে সব শিল্পীর প্রতিষ্ঠা আছে বা মর্যাদা আছে, তাঁরা সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহের অনুগ্রহজীবী, অথবা বড় বড় আমীর-ওমরাহ তাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা একটু ভাল খেতে পরতে পান ও আরামে থাকেন। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠা হয়। তা না হলে অর্থাৎ রাজা-বাদশাহের মতন পৃষ্ঠপোষক না থাকলে, শিল্পীর কোনো কদর নেই হিন্দুস্থানে।[১৭]

প্রাসাদের বর্ণনা

ব দুর্গের মধ্যে বেগমমহল ও অন্যান্য রাজকীয় ভবন আছে। কিন্তু 'লুভের' বা 'এসকিউরিয়ালে'র অট্টালিকাদির মতন নয়।[১৮] ইয়োরোপীয় ঘরবাড়ির গঠনের

১৭। ভারতীয় শিল্পকলার গুণাগুণ সম্বন্ধে বার্নিয়েরের মন্তব্যের মধ্যে ত্রুটি থাকলেও, শিল্পীদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য বলা চলে।—অনুবাদক

১৮। ফার্গুসন সাহেব তাঁর 'The History of Indian Architecture' গ্রন্থের মধ্যে (৮৭৬ সং) বলেছেন: 'দিল্লীর রাজপ্রাসাদ প্রাচ্যের সমস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, এমনকি

সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্যই নেই। থাকা উচিতও নয়। কেন নয় তা আমি আগেই বলেছি। ফরাসী বা স্পেনীয় স্থাপত্যের সঙ্গে তার তুলনা করা উচিত নয়। যদি পরিবেশোপযোগী নিজস্ব আভিজাত্য তার থাকে, তা হলেই যথেষ্ট।

দুর্গের প্রবেশদ্বারের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। দুটি বড় বড় পাথরের হাতি আছে দুদিকে। একটি হাতির উপর চিতোরের রাজা জয়মলের প্রস্তর প্রতিমূর্তি, অন্যটির উপর তাঁর ভাইয়ের। এই দুজন দুঃসাহসী বীর ও তাঁদেব বীর জননী ইতিহাসে অমর হযে আছেন, কাবণ আকবর বাদশাহ যখন চিতোর অবরোধ করেছিলেন তখন তাঁরা অমিতবিক্রমে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা অতুলনীয়।[১৯] সেই প্রতিরোধ যখন চূর্ণ হযে গেল, যখন দেশরক্ষার আর কোনো উপায় রইল না, তখন তাঁরা তাঁদের জননীসহ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তবু তাঁরা উদ্ধত শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। মাথা উঁচু করেই তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। তাঁদের এই অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হযেই তাঁদের শত্রুরা এই মর্মরমূর্তি তৈরি করেছিল। যখনই আমি এই দুটি হাতির পিঠে এই বীরের মর্মরমূর্তির দিকে চেয়ে দেখি তখন আমার এমন এক অনুভূতি জাগে মনে, যা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

এই প্রবেশদ্বার দিযে নগরদুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে একটি সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাস্তা দেখা যায় সামনে। রাস্তাটির (দিল্লীর প্রাচীন 'চাঁদনি চক্' নামে রাস্তাটি) মাঝখান দিয়ে একটি জলের খাল বয়ে গেছে। রাস্তার দু পাশে লম্বা উঁচু বাঁধ প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু এবং চার ফুট চওড়া। বাঁধের পাশেই সারিবদ্ধ তোরণ

সারা পৃথিবীর রাজপ্রাসাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এমন সুন্দর স্থাপত্যের পরিকল্পনা রাজপ্রাসাদ-নির্মাণে আর অন্য কোথাও দেখা যায় না।' মোগল সম্রাটের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে হারেম, বেগমমহল ও অন্যান্য গোপন বিভাগের যে আয়তন ছিল এবং যতটা স্থান জুড়ে ছিল, ইয়োরোপের সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদেরও ততটা বিস্তৃতি ছিল না। আকারে, আয়তনে, বৈচিত্র্যে, ঐশ্বর্যে ও পরিকল্পনায় দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য ছিল।—অনুবাদক

১৯। আকবর চিতোর অবরোধ করে অধিকার করেছিলেন ১৫৬৮ সালে। এই মর্মরমূর্তি দুটির বিস্তৃত বিবরণ ও ইতিবৃত্ত কৌতূহলী পাঠকরা H. G. Keene-এর A Handbook for Visitors to Delhi and Its Neighbourhood (৪র্থ সং) গ্রন্থের মধ্যে (Appendix 'A') পাবেন। মর্মরমূর্তি দুটি এখন দিল্লীর মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে এবং হাতি দুটির একটি সাধারণ-উদ্যানে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় হাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৮৬৩ সালে হস্তীসহ এই মর্মরমূর্তি দুটি দুর্গের মধ্যস্থ আবর্জনাস্তূপের তলা থেকে খুঁজে বার করা হয়।—অনুবাদক

রাস্তা বরাবর চলে গেছে। এই বাঁধের উপরেই বাজারের রাজকর্মচারীরা তাঁদের খাজনা ট্যাক্স শুল্ক ইত্যাদি আদায় করেন এবং রাস্তার উপর দিয়ে ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি চলাচল করে। মনসবদাররা ও নিম্নপদস্থ ওমরাহরা বাঁধের উপর ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেন। খালের জল বেগমমহলের অন্দরে পর্যন্ত চলে গেছে। নানা জায়গার ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গিয়ে খালের জল দুর্গের বাইরের পরিখায় গিয়ে পড়েছে। খালটি দিল্লীর প্রায় পাঁচ-ছয় লীগ দূরে যমুনা নদী থেকে, বিশেষ যত্ন ও মেহনত করে, কেটে আনা হয়েছে। অনেক মাঠের উপর দিয়ে, পাথুরে মাটির বুক চিরে এসেছে খালটি।[২০]

অন্য দুর্গদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকলে আরও একটি লম্বাচওড়া রাস্তা দেখা যায়। তারও দুদিকে বেশ উঁচু ও প্রশস্ত বাঁধ দেওয়া আছে। কেবল বাঁধের পাশে সারবন্দী তোরণের বদলে আছে দোকান।

রাস্তাটি আসলে একটি বাজারই বলা চলে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না, কারণ রাস্তাটির উপরে ছাদ আছে। আলোবাতাসের অভাব নেই। ছাদের মধ্যে যথেষ্ট বড়-বড় ফাঁক আছে আলোবাতাস প্রবেশের জন্য।

এই দুটি প্রধান রাস্তা ছাড়াও, নগরদুর্গের মধ্যে, ডাইনে-বামে আরও অনেক ছোট-ছোট রাস্তা আছে। সেই সব রাস্তা দিয়ে ওমরাহদের বাসাঞ্চলে যাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা করে ওমরাহরা প্রত্যেকে সেখানে পাহারা দেন, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পালা পড়ে প্রত্যেকের। যেখানে ওমরাহরা এইভাবে পাহারা দেন, সেই স্থানগুলি সত্যিই খুব মনোরম। নিজেরা খরচ করে তাঁরা সেই স্থান সাজান। প্রশস্ত উঁচু বাঁধ বা ঘরের মতন জায়গা, চারিদিকে তার ফুলবাগান, ছোট-ছোট জলের খাল, ঝরনা ইত্যাদি। যাঁরা পাহারা দেন অর্থাৎ পাহারাদার ওমরাহরা সম্রাটের কাছ থেকে খাদ্য পান। যথাসময়ে রাজপ্রাসাদ থেকে খাদ্য আসে এবং যথারীতি আদবকায়দা সহকারে ওমরাহরা সেই খাদ্য ভোজনের জন্য গ্রহণ করেন। খাদ্যের থালার সামনে দাঁড়িয়ে

২০। দিল্লীর এই বিখ্যাত 'কেন্যাল' বা খালটি আলি মর্দন খাঁ কাটিয়েছিলেন। আলি মর্দন খাঁ সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন এবং দক্ষতার জন্য তিনি কাবুল ও কাশ্মীরের গবর্নর হয়েছিলেন। জনকল্যাণকর কাজে (Public Works) তাঁর মতন উদ্যোগী শাসক তখন খুব অল্পই ছিলেন। অনেক কীর্তি তাঁর আছে, তার মধ্যে দিল্লীর এই খালটি একটি। ১৬৫৭ সালে তিনি মারা যান।—অনুবাদক

রাজপ্রাসাদের দিকে ফিরে তাঁরা তিনবার সেলাম করেন এবং কুর্নিশের ভঙ্গীতে ওঠানামা করে খাদ্যের পাত্রটি হাত পেতে গ্রহণ করেন।[২১]

এই রকম আরও অনেক বড়-বড় উঁচু বাধ ও তাঁবু আছে নগরের মধ্যে। সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের লেনদেন ও আফিসের কাজকর্মের স্থান হিসেবে সেগুলি ব্যবহার করা হয়।

কারখানার বর্ণনা

বড়-বড় হলঘর অনেক জায়গায় দেখা যায়। তাকে 'কারখানা' বলে।[২২] কারিগরদের ওয়ার্কশপের নাম কারখানা। কোনো হলঘরে দেখা যায় সূচিশিল্পের কাজ হচ্ছে, ওস্তাদ তদারক করছেন। কোনো হলঘরে স্বর্ণকাররা কাজ করছে, কোথাও চিত্রকররা। কোথাও বানিশ, পালিশ ও লাক্ষার কাজ হচ্ছে। কোথাও চর্মকার, দরজী ও সূত্রধররা কাজ করছে। কোথাও কাজ করছে রেশম-ব্রকেডের কারিগররা, কোথাও সূক্ষ্ম মসলিন ইত্যাদি কাপড় তৈরি হচ্ছে। তাই দিয়ে শিরোপা, কোমরবন্ধ, কামিজ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে কোথাও, সোনালি ফুলের ঝালর দেওয়া ও বিচিত্র কারুকাজ করা। মেয়েদের পোশাক তৈরি হচ্ছে কোথাও, এত সূক্ষ্ম যে একরাত্রির বেশি হয়ত ব্যবহার করা চলে না। এই ধরনের একরাত্রির পোশাক, কয়েকঘণ্টার পোশাক, সূক্ষ্ম সূচের কারুকার্যের জন্য হয়ত দশ-বারো ক্রাউন পর্যন্ত দামে বিক্রি হতে পারে।

কারিগররা প্রতিদিন সকালে উঠে কারখানায় যায় এবং সারাদিন কারখানায়

২১। মনসব, জায়গীর, খিলাত, হাতি ঘোড়া ইত্যাদি উপহার, যা কিছু হোক, সম্রাটের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময় তিনবার সেলাম করাই হল প্রথা ('আইন-ই-আকবরী')।

২২। মোগলযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে এই 'কারখানা'গুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বার্নিয়েরের মতন বিচক্ষণ পর্যটক স্বচক্ষে এই সব কারখানার কাজকর্ম-প্রণালী দেখেছিলেন এবং তাঁর বিবরণও অত্যন্ত মূল্যবান। বার্নিয়ের ছাড়া তাভার্নিয়ের (Tavernier), মানুচ্চি (Manucci) প্রমুখ পর্যটকরাও তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে এইসব কারখানার বিবরণ দিয়ে গেছেন। 'আইন-ই-আকবরী'তেও এইসব কারখানার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ২৬টি প্রধান কারখানার স্বতন্ত্র বিবরণ ছাড়াও আরও ১০টি কারখানার উল্লেখ আছে—অর্থাৎ মোট ৩৬টি কারখানার কথা আছে। অন্যান্য অনেক মূলগ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মোগলযুগের 'কারখানা' সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন শ্রীযদুনাথ সরকার তাঁর ('Mughal Administration') গ্রন্থের মধ্যে (৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৫-১৭৯)। —অনুবাদক

খেটে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আসে। এইভাবে কারখানার নির্জন হলঘরের কোণে সকলের অগোচরে একাগ্রচিত্তে মেহনত করে তাদের জীবনের দিনগুলি কেটে যায়। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে কারও কোনো কিছু থাকে না এবং নিজেদের জীবনযাত্রার কোনোরকম উন্নতির জন্যেও কেউ সচেষ্ট হয় না। যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তারা জন্মায়, সেই অবস্থার মধ্যেই তারা সারাজীবন একভাবে থাকে। সূচিশিল্পী যে, সে তার পুত্রকেও সূচিশিল্পের শিক্ষা দেয়; স্বর্ণকার যে, সে তার পুত্রকে করে স্বর্ণকার এবং শহরের বৈদ্য যে, সে তার পুত্রকেও বৈদ্য করতে চায়। সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যেই সকলে বিবাহাদি করে। এই সামাজিক বিধি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কারিগররা কঠোর-ভাবে পালন করে। এর কোনোরকম ব্যতিক্রম আইনের চোখে পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সামাজিক বিধানের ফলে অনেক সুন্দরী মেয়েদেরও আজীবন হয়ত অবিবাহিত কুমারী জীবন যাপন করতে হয়, কারণ সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠির মধ্যে অনেক সময় ভাল পাত্র পাওয়া যায় না এবং সেক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী উচ্চ বা নিম্নস্তরের কোনো কারিগরগোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহও সম্ভবপর নয়।[২৩]

আমখাসের কথা

'আমখাসে'র কথা বলি। আমখাসের (যে দরবার-গৃহে সম্রাট প্রজাদের দর্শন দেন) কথা সত্যই ভোলা যায় না। এইসব রাস্তাঘাট, বাঁধ তোরণ ইত্যাদি পার হয়ে অবশেষে আমখাসে এসে পৌছতে হয়। সুন্দর গঠন এই আমখাসের, স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে চমৎকার। বিশাল চতুষ্কোণ কোর্ট একটি, অনেকটা আমাদের 'প্লেস রয়ালে'র মতন, চারিদিকে তার তোরণ দিয়ে ঘেরা। তোরণের উপরে কোনো ঘরবাড়ি কিছু নেই। তোরণের মধ্যে মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে যাতায়াত করার জন্য দরজা আছে। কোর্টের একদিকে মাঝখানে একটি খোলা উঁচু জায়গা আছে, তার উপর 'নাকাড়াখানা'। যেখান থেকে বাদ্যকররা নাকাড়া বাজায় তাকে 'নাকাড়াখানা' বলে। নাকাড়াখানায় কাড়ানাকাড়া দুন্দুভি ইত্যাদি

২৩। কারিগররা বিভিন্ন 'গিল্ডে' বিভক্ত ছিল পেশানুযায়ী। 'গিল্ডে'র সামাজিক বিধিনিষেধ কতকটা আদিম 'ক্ল্যানে'র (Clan) মতন ছিল—অর্থাৎ আধুনিক যুগে আমরা যে 'স্বজাতি' বা 'গোত্র' বলি তার মতন। মধ্যযুগীর সমাজের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বত্র এই গিল্ড।—অনুবাদক

বাজ্য থাকে এবং বাদ্যকররা দিনরাত্রির নির্দিষ্ট ঘণ্টায়-ঘণ্টায় নানারকম সংকেতধ্বনির জন্য সেগুলি বাজায়। বিদেশী ইয়োরোপবাসীর কাছে নাকাড়াখানার বাদ্যকরদের এই বাজনা বিচিত্র বলে মনে হয়, কারণ বিশ-পঁচিশজনের একত্রে এই বাজনা শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। বড বড শানাই, কাডানাকাডা ও মন্দিরা যখন একত্রে বাজতে থাকে তখন বাস্তবিকই অদ্ভুত শোনায়। শানাইয়ের আকার কি ? একটি শানাই দেখেছি, নাম তার 'কর্ণ', বিশাল লম্বা এবং নিচের চাবিকাঠিগুলি প্রায় একফুট জুডে রয়েছে। কাঁসা ও লোহার মন্দিরাগুলি খুব বড-বড। আওয়াজ তার কিরকম হতে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায় এবং নাকাডাখানা থেকে এই সব বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত শব্দ যে কতখানি জোরালো হতে পারে তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমি প্রথম দিন এই বাজনা শুনে রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার কান এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এই কাড়ানাকাডা শানাই-মন্দিরার ঐকবাদন আমার কাছে অপূর্ব শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়। রাত্রে বিশেষ করে, যখন দূরে কোনো অট্টালিকা-শীর্ষের শয়নকক্ষে আমি শুয়ে থাকি, তখন দূর থেকে ভেসে-আসা নাকাডাখানার এই ঐকবাদন আমার কাছে সুন্দর, সুগম্ভীর ও সুরৈশ্বর্যময় বলে মনে হয় এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই অবশ্য। কারণ বাদ্যকররা সকলেই প্রায় বাল্যকাল থেকে বাদ্যচর্চা ও সুরচর্চা করে সুরের তাল তান, মীড মূর্ছনায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে। সেইজন্য এই সব বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র শব্দধ্বনি ও সুরের মিশ্রণে তারা চমৎকার শ্রুতিমধুর ঐকতান রচনা করতে পারে এবং দূর থেকে তা শুনতে এত ভাল লাগে যে বলা যায় না। নাকাডাখানা সম্রাটের প্রাসাদ থেকে দূরে তৈরি করা হয় এবং উঁচু মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সম্রাট বাজনার সুর শুনতে পান, অথচ তার তীব্রতা বা কটুতা (কাছে থাকার জন্য) তাঁর কানে না পৌছয়।

সম্রাট সন্দর্শনের প্রথা

সিংহদরজার উল্টো দিকে, কোর্ট পার হয়ে, সামনে বিরাট একটি হলঘর। হলঘরের মধ্যে সারবন্দী স্তম্ভ। ছাদ ও স্তম্ভ দুইই সুন্দরভাবে চিত্রিত, সোনার কাজ করা। অপূর্ব দেখতে। জমি থেকে বেশ উঁচুতে হলঘরটি তৈরি, প্রচুর আলোবাতাস খেলে। তিনদিক খোলা, বাইরের চত্বরটির দিকে। মধ্যে একটি প্রাচীর, তার ওপাশে বেগমমহল। প্রাচীরের মধ্যস্থলের কাছাকাছি বাইরের

চেয়েও উঁচু একটি বেদী-মঞ্চ এবং সেখানে জানালার মতন একটি বড় গবাক্ষ আছে। সেইখানে সম্রাটের সিংহাসন। প্রতিদিন প্রায় মধ্যাহ্নকালে সম্রাট সেই সিংহাসনে এসে একবার করে বসেন, দক্ষিণে ও বামে রাজকুমাররা বসে থাকেন। খোজারা পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরের পাখা ও চামর দিয়ে বাতাস করে। কেউ-কেউ বিনম্র ভঙ্গীতে দাসানুদাসের মতন সব সময় তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করে, কখন কি আদেশ হয় সেইজন্য। রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একটি স্থান আলাদা রুপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকে, পদস্থ আমীর-ওমরাহ দেশীয় রাজা ও বিদেশী রাজদূতদের জন্য। তাঁরা সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, নিচের দিকে চোখ নামিয়ে, ঘাড় হেঁট করে হাত দুখানি সামনের দিকে ক্রস করে। আরও একটু দূরে মনসবদাররা ও সাধারণ ওমরাহরা দাঁড়িয়ে থাকেন, ঠিক ঐ একই ভঙ্গীতে, নতশিরে। বাকি জায়গায় হলঘরে ও চত্বরে, সবরকমের লোক থাকে নানা স্তরের ও নানা শ্রেণীর লোক,—পদস্থ ও সাধারণ ধনী ও নির্ধন। সকলেরই সেখানে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ এই হলঘরেই মোগল সম্রাট প্রতিদিন একবার করে সকলকে দর্শন দেন, উচ্চ-নিচু ভেদাভেদ নির্বিশেষে। সেইজন্যই এই হলঘরের নাম 'আমখাস', অর্থাৎ সর্বসাধারণের রাজদর্শন-গৃহ।

রাজদর্শনের অনুষ্ঠানটি প্রায় দেড় ঘণ্টা দু ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। অশ্বশালার ভাল-ভাল ঘোড়াগুলিকে সিংহাসনের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কারণ সম্রাট স্বচক্ষে দেখতে চান, তাদের কি অবস্থায় কেমন যত্নে রাখা হয়েছে না-হয়েছে। অশ্বশালায় ঘোড়ার পর পিলখানার হাতিরা মন্থরগতিতে চলে যায় সিংহাসনের সামনে দিয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব হাতি, কালো কুচকুচে রঙ করা, কপাল থেকে শুঁড়ের ডগা পর্যন্ত দুটি লাল রঙের রেখা অঙ্কিত। সুন্দর সব কারুকাজ করা নানা রঙের কাপড়চোপড় দিয়ে হাতিগুলি সাজানো। দুটি বড়-বড় রুপোর ঘণ্টা পিঠের দু পাশে রুপোর শিকল দিয়ে ঝুলানো থাকে এবং কানের দু পাশ তিব্বতী গরুর সাদা লেজ লম্বাকারে বাঁধা থাকে গুম্ফের মতন। হাতিগুলি এক অপূর্ব দৃশ্য রচনা করে। দুটি ছোট-ছোট হাতি তার মধ্যে সবচেয়ে জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে অন্য সব বড়-বড় হাতির সামনে এমনভাবে নড়েচড়ে বেড়ায় যে দেখলে মনে হয় যেন তারা বড় হাতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, প্রভুদের হুকুমের অপেক্ষা করছে। পোশাক-পরিচ্ছদে হাতিরাই সবচেয়ে জমকালো এবং মনে হয় সে সম্বন্ধে যেন তারা বেশ সচেতন। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়েই যেন তারা নিজেদের মেজাজকে হেলেদুলে দোলরা-

চোমরাদের মতন চলতে থাকে। চলতে-চলতে যেমন একে-একে তারা সম্রাটের সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ায়, অমনি মাহুত ডাঙ্গশের একটি ঘা মেরে, পিঠের উপর শুয়ে পড়ে কানে কানে কি যেন তাদের বলে দেয় মনে হয়। চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটি জানু বাঁকিয়ে নত হয়ে, কপালের দিকে শুঁড় উঁচুতে তুলে গর্জন করে ওঠে হাতি। অর্থাৎ সম্রাটকে হাতিও সশ্রদ্ধ সেলাম জানায়।

হাতির পর অন্যান্য জন্তুদের পালা। পোষা হরিণের দল যায়, হরিণের লড়াই দেখার জন্য সম্রাট অনেক রকমের হরিণ পোষেন। নীল গাই, গণ্ডার যায়। বাংলাদেশের বড় বড় মহিষ যায়, লম্বা লম্বা পাকানো তাদের শিঙ। এই শিঙ দিয়ে তারা বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করে, সম্রাট দেখে আনন্দ পান। পোষা প্যান্থার ও চিতাবাঘ যায়, হরিণ শিকারের জন্য যত্ন করে পোষা। উজবেকিস্তানের সব ভাল ভাল খেলোয়াড় শিকারী কুত্তা যায় প্রত্যেকটি কুত্তার পায়ে একটি করে লাল রঙের কোর্তা জড়ানো। সবার শেষে নানারকমের শিকারী পাখি ও বাজপাখি যায়, শুধু পাখি খরগোস ইত্যাদি শিকারেই যে তারা অভ্যস্ত তা নয়, হরিণ পর্যন্ত শিকারেও নাকি ওস্তাদ। বন্য হরিণের ঘাড়ের উপর বিদ্যুৎবেগে ছোঁ দিয়ে পড়ে এবং হরিণের মাথাটি ঠুকরে ঠুকরে ঘায়েল করে দেয়। বড় বড় ডানা ঝাপটে তাদের দিশাহারা করে দিয়ে ধারালো থাবায় আচড়ে ধরাশায়ী করে।[২৪]

জন্তুজানোয়ারের এই বিচিত্র শোভাযাত্রা ছাড়াও, দু-চারজন ওমরাহের অশ্বারোহী সেনারাও সামনে দিয়ে যায়। অশ্বারোহী সৈন্যরা ভাল-ভাল পোশাক পরে থাকে, এবং সেদিন ঘোড়াগুলিকে নানারঙের রঙীন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

আর একটি দৃশ্য দেখতে সম্রাট ভালবাসেন, তলোয়ার দিয়ে মৃত মেষ কাটার দৃশ্য। মৃত মেষটির নাড়ীভুঁড়ি ছাড়িয়ে, চার পা বেঁধে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসা হয়। তরুণ ওমরাহ, মনসবদার ও গুর্জ-বরদাররা নিজেদের কারদানি

২৪। নানারকম শিকারের, শিকারী জন্তুর ও শিকারী পক্ষীর চমৎকার বিবরণ আছে 'আইন-ই-আকবরী' (ব্লকম্যান অনূদিত ও Phillot সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের 'শিকার' ও 'আমোদ-প্রমোদ'-সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি পড়তে পারেন (পৃঃ ২৯২-২৯৬, এবং পৃঃ ৩০৮-৩১৩)।
—অনুবাদক

ও শক্তি দেখাবার জন্য মেষটিকে এক কোপে এফোঁড়-ওফোঁড় করবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এত সব বিচিত্র অনুষ্ঠান পর্ব গৌণ ব্যাপার মাত্র। আসল কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের নিজে একবার দেখেন তো নিশ্চয়, গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকে তিনি প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চান। নিজে সব স্বচক্ষে তদারক করেন এবং নিজের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কারও তনখা ও পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেন, কারও বা কমিয়ে দেন, কাউকে আবার নোকরি থেকে বরখাস্তও করেন। আমখাসে সমবেত প্রজাদের মধ্যে থেকে যেসব আরজি-আবেদনপত্র পেশ করা হয়, সেগুলি সম্রাটের কাছে এনে, তাঁর সামনেই পড়া হয় যাতে তিনি শুনতে পান। তারপর আবেদনকারীদের প্রত্যেককে একে-একে সম্রাটের সামনে ডাকা হয়, তিনি নিজে স্বচক্ষে তাদের দেখেন এবং সামনা সামনি অনেক সময় অধিকাংশ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেন। অন্যায়ের জন্য অপরাধীদের দণ্ডও দেন। সপ্তাহে একদিন নিভৃতে বসে তিনি সাধারণ প্রজাদের ভিতর থেকে দশজনের আবেদনপত্র নিজে বিচার করেন। আদালতখানাতেও সপ্তাহে একদিন করে যান এবং সেখানে সাধারণতঃ দুজন কাজীর সঙ্গে বসে আবেদন-অভিযোগের বিচার করেন। সম্রাটের এই কাজগুলি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এশিয়ার সম্রাটদের বর্বরতা ও অবিচার সম্বন্ধে আমাদের মতন বিদেশীদের যে ধারণা আছে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

মোসাহেবির নমুনা

আমখাসের অনুষ্ঠানাদির যে বিবরণ দিলাম তা নিন্দনীয় নিশ্চয় নয়। তার মধ্যে যুক্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ব্যাপার আমার কাছে অতি জঘন্য ও অসহ্য বলে মনে হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। সেটা হল, মোসাহেবি, স্তোকবাক্য ও প্রশস্তি। সম্রাটের মুখ দিয়ে যখনই কোনো একটি কথা বেরোয়, তা সে যে কথা বা যত নগণ্য কথাই হোক-না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোকসভায় তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকে। প্রধান ওমরাহরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আশমানের দিকে হাত বাড়িয়ে, দেবতার আশিস্-প্রার্থীর মতন কাতরকণ্ঠে 'কেরামৎ, কেরামৎ' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। অর্থাৎ প্রভু কি কথাই বললেন, কেউ

আর কোনোদিন এমন কথা বলেননি, বলবেনও না কোনোদিন! কি আশ্চর্য কথা! কি সুবিচার! কি দূরদৃষ্টি! পারস্যভাষায় একটি লোকপ্রবাদ আছে, তার অর্থ হল; 'শাহ যদি বলেন দিনটাকে রাত, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে অন্যেরা বলবেন, আহা! কি সুন্দরই না চাঁদ উঠেছে আকাশে, কি চমৎকার তারার ঝলমলানি!' মোগল দরবারেও ঠিক তাই হয়ে থাকে।

স্তাবকতা মোসাহেবি যেন অস্থিমজ্জায় সকলের মিশে রয়েছে, সবস্তরের লোকের মধ্যে। যদি কোনো মোগলের আমার কাছে কোনো কাজ থাকে, তাহলে তিনি আমার মতন ব্যক্তিকেও বলবেন: 'আপনি? আপনার মতন লোক আর দেখা যায় না। আপনি আরিস্ততল, আপনি হিপোক্রেটিস, আপনিই বর্তমান যুগের আবিসিন্না-উজ-জমান্।' প্রথম প্রথম আমি তো ঘাবড়েই যেতাম এবং আমার সহানুভূতি-প্রার্থীদের আমি বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে, আমি কিছুই নই, সামান্য একজন লোক মাত্র, আমার এমন কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি প্রতিভা নেই যে ঐ সব মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করা যেতে পারে! কিন্তু দেখলাম শেষ পর্যন্ত যে আমার অনুনয়-বিনয়ে কোনো কাজ হয় না, বরং উল্টো ফল ফলে, এবং স্তাবকতা ক্রমে বাড়তেই থাকে। সুতরাং কানটাকে ক্রমে অভ্যস্ত করে নেওয়াই ঠিক করলাম এবং তাঁদের কোনো স্তোকবাক্যেই আর আমার মনে এখন কিছুই হয় না। এখানে একটি ছোট্ট কাহিনী উল্লেখ করব। বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ না করে পারছি না। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আমি আমার আগাসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। আগাসাহেবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীরপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করে, নানারকমের সব আজগুবি চাটুবাক্য বর্ষণ করে, পণ্ডিত মশায় শেষকালে বললেন তাঁকে: 'আপনি যখন আগাসাহেব আপনার অশ্বারোহী সেনার আগে-আগে ঘোড়ার পিঠে জিনে পা লাগিয়ে চলতে থাকেন, তখন মনে হয় যেন আপনার পায়ের তলায় মেদিনী পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। যে আটটি হাতির মাথার উপর মেদিনীটা অবস্থান করছে, তারা আর তখন আপনার ভার সইতে না পেরে মাথা নাড়তে থাকে এবং মেদিনী টলমল করে ওঠে।' পণ্ডিতের এই চাটুবাক্যের বর্ষণ শেষ হবার পর শ্রোতাদের মনে কি তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা বুঝতেই পারছেন। আমি তো হো হো করে সজোরে হেসে উঠলাম। আগাসাহেবকে আমি ঠাট্টা করে বললাম: 'আপনার উচিত আরও সাবধানে ঘোড়ায় চড়া কারণ আপনার ঘোড়ায় চড়ার জন্যে যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে তো মারাত্মক ব্যাপার!'

আগাসাহেব বুদ্ধিমান ও রসিক ব্যক্তি। আমার কথার উত্তরে তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, তা তো বটেই। সেইজন্যই তো ভয়ে পারতপক্ষে আমি ঘোড়ায় চড়ি না, পালকিতেই চড়ে বেড়াই।'

গোসলখানার বর্ণনা

'আমখাসের বিশাল হলঘরের ভিতর দিয়ে আর একটি নিভৃত ঘরে যাওয়া যায়, তার নাম 'গোসলখানা'।[২৫] গোসলখানা হাতমুখ ধোওয়া ও স্নানাদি করার ঘর বলা হয়। গোসলখানায় অবশ্য সকলের প্রবেশ নিষেধ, এবং তার আয়তনও আমখাসের মতন বিশাল নয়। তা না হলেও ঘরটি বেশ বড় হলঘরের মতন এবং চমৎকারভাবে রঙীন চিত্র ও নকশায় সুশোভিত, দেখতে অতি সুন্দর ও মনোরম। চার-পাঁচ ফুট উঁচু ভিতের উপর তৈরি, বড় প্ল্যাটফর্মের মতন। সাধারণতঃ, এই গোসলখানার নির্জন কক্ষে সম্রাট একটি চেয়ারে বসে, আমীর-ওমরাহ পরিবেষ্টিত হয়ে সঙ্গোপনে রাজ্যের বিবরণাদি শোনেন, জরুরী আর্জি-আবেদনপত্রাদির বিচার করেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সলাপরামর্শ করেন। সকালের দিকে আমখাসে যেমন ওমরাহরা উপস্থিত থাকেন, তেমনি সন্ধ্যার দিকে গোসল-খানায় তাঁদের উপস্থিত থাকতে হয়। দুবেলা হাজিরা দিতে তাঁরা বাধ্য, তা না হলে তাঁদের অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রতিদিন দুবেলা, আমখাসে ও গোসল-খানায়, হাজিরা দেওয়া তাঁদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। একজন ব্যক্তি কেবল এই দৈনন্দিন বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, তিনি আমার মনিব আগাসাহেব, দানেশমন্দ খাঁ। তাঁকে স্বাধীনতা দেবার কারণ হল, সম্রাট তাঁকে তার রাজ্যের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে করেন এবং সেইজন্য তাঁকে দৈনন্দিন দরবারী রীতিনীতি মানতে বাধ্য করেন না। সেই সময়টা তাঁকে অধ্যয়নাদির জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। সপ্তাহে একদিন মাত্র, প্রতি বুধবারে তাঁকে আমখাসে ও গোসলখানায় একবার হাজিরা দিতে হয়। এবং ঐদিনই তাঁর উপর গার্ড দেওয়ার ভার পড়ে। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার করে রাজসভাগৃহে হাজিরা দেবার এই প্রথা খুব প্রাচীন। কোনো আমীর এই প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না, কারণ সম্রাট নিজেও দুবেলা এইভাবে নিয়মিত হাজিরা দেন

২৫। 'গোসলখানা' স্নান-প্রক্ষালনাদির গৃহ হলেও, সম্রাটের গোপন সভাকক্ষও বটে। গোপনে ও নিভৃতে যেসব বিষয় রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, তা আমখাসের বদলে গোসলখানাতে বসেই করা হত। মোগলযুগের প্রচলিত রীতি ছিল তাই।

এবং দেওয়া তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেন [২৬] বিশেষ গুরুতর কোনো ব্যাপার না ঘটলে অথবা অসুখবিসুখ না হলে, সম্রাট নিজে দুবেলা যথারীতি আমখাসে ও গোসলখানায় তাঁর দৈনন্দিন রাজকার্যের জন্য উপস্থিত হন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব যখন সাংঘাতিকভাবে পীড়িত হয়েছিলেন, তখনও তাঁকে প্রতিদিন অন্তঃপুর থেকে শায়িত অবস্থায় হয় আমখাসে, না হয় গোসলখানায়, যে-কোনো এক সভাগৃহে একবার করে বহন করে নিয়ে আসা হত। তিনি নিজে এইভাবে অন্ততঃ দৈনিক একবার করে বাইরের সকলের সামনে 'দর্শন' দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন। কারণ রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন এমন ভয়াবহ ছিল যে একদিন তিনি দর্শন না দিলেই বাইরে তাঁর মৃত্যুর গুজব পর্যন্ত রটনা হতে পারত এবং গণবিদ্রোহ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়াও দেখা দিত।

গোসলখানায় বসে সম্রাট যদিও এইসব কাজকর্ম করেন তাহলেও আমখাসের মতন আদবকায়দা সেখানেও বজায় রাখা হয়। তবে দিনের শেষে কাজ শুরু হয় বলে এবং গোসলখানার সংলগ্ন কোনো মুক্ত চত্বর না থাকার জন্য, ওমরাহদের পক্ষে অশ্বারোহী সেনার কোনো কুচকাওয়াজ দেখানো সেখানে সম্ভব হয় না। গোসলখানার সান্ধ্য সভায় একটি উৎসব বিশেষভাবে পালন করা হয় দেখেছি। মনসবদার যাঁরা পাহারা থাকেন তাঁরা সম্রাটের সামনে দিয়ে একবার করে সমারোহে 'সেলাম' করে যান। তাঁদের হাতে নানারকমের 'প্রতীক' থাকে এবং দৃশ্যটি নানাদিক থেকে বিশেষ উপভোগ্য হয়। প্রতীকের মধ্যে অনেকগুলি রুপোর মূর্তি থাকে, রুপোর দণ্ডের উপর বসানো। তার মধ্যে দুটি মূর্তি হল বড়-বড় মাছের মূর্তি, দুটি হল বৃহদাকার কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর মূর্তি, নাম 'আশদাহ' —একরকমের ড্রেগন বিশেষ। এছাড়া দুটি সিংহের মূর্তি, দুটি হাতের পাঞ্জার মূর্তি, একজোড়া দাঁড়িপাল্লা এবং আরও অনেক কিছুর মূর্তি প্রতীকরূপে মনসবদাররা বহন করে নিয়ে যান। এই সব প্রতীকের নাকি একটা গভীর তাৎপর্য আছে। মনসবদারের সঙ্গে গুর্জবদাররাও থাকে, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ সব। তাদের কাজ হল সভাকালীন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজাদেশ পালন করা এবং প্রয়োজন হলে সম্রাটের হুকুম বিদ্যুৎগতিতে তামিল করা।

২৬। প্রতিদিন দুবার করে সভাগৃহে সম্রাটের দর্শন দেবার এই রীতির কথা 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে (আইন-ই-আকবরী—১ম খণ্ড, ১৫৭)।

হারেমের বর্ণনা

এইবার আপনাকে মোগল বাদশাহের হারেম বা জেনানা-মহলের সামান্য পরিচয় দেব। কিন্তু জেনানা-মহলের গৃহবিন্যাস বা স্থাপত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই কোনো পর্যটকেরই নেই। সম্রাটের সেই হারেমের অন্দরমহল দেখার সৌভাগ্য কারও হয়নি আজ পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে দিল্লী থেকে সম্রাট যখন চলে যেতেন বাইরে, তখন আমি দু-একবার অনেক চেষ্টা করে জেনানা-মহলের মধ্যে ঢুকেছি এবং কিছুটা দেখেছি। একবার সম্রাট বেশ কিছুদিনের জন্য দিল্লী থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় জেনানা-মহলের কোনো মহিলার কঠিন অসুখ হয়। বাইরে আসা, যে-কোনো কারণে, তাঁদের নিষেধ। পর্দাপ্রথা সনাতন প্রথা। সুতরাং চিকিৎসক হিসেবে আমাকেই অন্দরমহলে যেতে হল। যেতে যখন বাধ্য হলাম তখন দু চোখ খুলে যাওয়া সম্ভব হল না। একটি বড় কাশ্মিরী শাল দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল। অতঃপর একজন খোজা এসে আমাকে হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। অন্ধের মতন আমি বেগমমহলে প্রবেশ করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু আমার পথপ্রদর্শক খোজার মুখে হারেমের কথা শুনে যা বুঝলাম, তাই আপনাকে বলছি।

খোজারা বলল—জেনানা-মহলে সুন্দর সুন্দর সব কামরা আছে। বেশ বড় বড় কামরা, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, এক কামরার সঙ্গে অন্য কামরার কোনো যোগাযোগ নেই। কামরার বাহার ও বাইরের পরিপাটিও আছে যথেষ্ট। যেমন জেনানা, তেমনি তাঁর কামরা। যিনি উচ্চপদস্থ, যাঁর রোজগার বেশি, তাঁর কামরাটিও তেমনি বাহারে। যিনি সেরকম নন, তাঁর কামরারও তেমন বাহার নেই। চারিদিকেই বাগান আছে জেনানা-মহলের, সুন্দর সাজানো বাগান ও বাগিচা আছে। প্রত্যেক কামরার দরজার কাছে একটি করে জলের ট্যাঙ্ক আছে। সুন্দর সুন্দর মনোরম রাস্তা, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন, ঝরনা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, উঁচু মঞ্চ ও তোরণ ইত্যাদিও আছে। এমনভাবে সব ব্যবস্থা করা আছে যে, জেনানা-মহলের সীমানার মধ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ কিছু বোঝা যায় না। সূর্যকে আড়াল করে আনন্দ করার মতন আরামকুঞ্জ আছে, আবার উচ্চ মঞ্চের উপর শুয়ে বসে চাঁদের আলো ও ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করবার মতন ব্যবস্থাও আছে। নদীর সামনে একটি ছোট মিনারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুনেছি খোজাদের। মিনারটি নাকি সোনার পাত দিয়ে মোড়া, আগ্রার দুটি মিনারের মতন। তার কক্ষগুলিও

স্বর্ণমণ্ডিত এবং নানারকম রঙীন চিত্রে সুশোভিত। বড়-বড় আয়নাও আছে দেওয়ালের গায়ে লাগানো (বার্নিয়ের 'খাসমহলে'র কথা বলছেন)।

এবার রাজদুর্গ থেকে বিদায় নেবার আগে আর একবার আমখাসের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। মনে করিয়ে দেবার বিশেষ কারণ আছে। আমখাসে আমি কতকগুলি বাৎসরিক উৎসব-পার্বণের অনুষ্ঠান দেখেছি। বিশেষ করে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, সমারোহ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে তার তুলনা হয় না। আমি অন্ততঃ আর কখনও সেরকম অনুষ্ঠান দেখিনি।

আমখাসের উৎসব

আমখাসের হলঘরের প্রান্তে সিংহাসনের উপর সম্রাট রাজপোশাক পরে উপবেশন করেন। সাদা ধবধবে সাটিনের মের্জাই গায়ে, রেশম ও সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তার উপর। শিরস্ত্রাণও স্বর্ণখচিত কাপড়ের তৈরি, মাথার গোড়ায় নানা আকারের হীরে বসানো। মধ্যে একটি ওরিয়েণ্টাল 'পুষ্পরাগ' বা পোখরাজ, সূর্যের কিরণের মতন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে আসে তার ভিতর থেকে। তুলনা হয় না তার সৌন্দর্যের।[২৭] গলায় একটি মুক্তার মালা, উদর পর্যন্ত লম্বা। হিন্দুস্থানের অন্যান্য ভদ্রলোকরাও এরকম মালা পরেন, প্রবালের মালা। সিংহাসনের ছটি পায়া একেবারে নীরেট সোনার, তার উপর হীরে, পান্না, চুনি তারার মতন ছড়ানো। কতরকমের মণিমুক্তারত্ন এবং তার মূল্যই বা কত, তা সঠিকভাবে আমি আপনাকে বলতে পারব না, কারণ আমি জহুরী নই এবং সবরকমের মণিরত্ন সকলের পক্ষে চেনাও মুশকিল। তবে আমার মনে হয়, সিংহাসনটির মূল্য অন্ততঃ চার কোটি টাকার কম নয়। একশ হাজারে এক লক্ষ, এবং একশ লক্ষেতে এক কোটি হয়। সুতরাং সিংহাসনের মূল্য প্রায় চারশ লক্ষ টাকার সমান হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পিতা সাজাহান এই সিংহাসনটি তৈরি করিয়েছিলেন। প্রচুর মূল্যবান মণিরত্ন রাজকোষে মজুত হয়েছিল,

---

২৭। এই রত্নটিই মনে হয় পর্যটক তাভার্নিয়েরকে (Tavernier) দেখানো হয়েছিল, ১৬৬৫ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে (Tavernier: Travels, Vol. I, P. 400)। তাভার্নিয়ের রত্নটির বর্ণনা করেছেন—'of very high colour, cut in eight panels'—বলে। রত্নটির ওজন 'ইংরেজী' ১৫২ ক্যারেটের কিছু সামান্য বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে গোয়া থেকে এটি মোগল বাদশাহের জন্য ১৮১,০০০ টাকায় কেনা হয়।

দেশীয় নৃপতিদের ও পাঠান রাজাদের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা মণিরত্ন, বাৎসরিক নজর ও উপঢৌকনরূপে পাওয়া মণিরত্ন, আমীর-ওমরাহদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ উৎসবে উপহার পাওয়া রত্ন। সম্রাট সাজাহান তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন এই সিংহাসনটি তৈরি করে। সিংহাসন নির্মাণ-কৌশল বা কারিগরি তার মণিরত্নের উপাদানের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না। কেবল মণিমুক্তাখচিত ময়ূর দুটি প্রশংসার যোগ্য। পরিকল্পনা ও কারিগরি দুইই ভাল।[২৮] একজন খুব ক্ষমতাশালী শিল্পী এই ময়ূর দুটি তৈরি করেছিল, ফরাসী শিল্পী, নাম।[২৯] অদ্ভুত কৌশলে নকল মণিরত্ন দিয়ে ইয়োরোপের রাজাদের প্রতারণা করে, তিনি শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পালিয়ে এসে হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাটের রাজদরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে কাজ করে ফরাসী শিল্পীর ভাগ্য ফিরে গিয়েছিল।

রাজসিংহাসনের পায়ের কাছে আমীর-ওমরাহরা একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর, জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্ল্যাটফর্মটি একটি রুপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা, মাথায় সোনার ঝালর দেওয়া চাঁদোয়া। হলঘরের স্তম্ভগুলিতে সোনার কাজ করা দামী ব্রকেড ঝুলানো থাকে। ফুলতোলা সাটিনের চাঁদোয়া আগাগোড়া টাঙানো, লাল রেশমী দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং সেই বাঁধনের কাছ থেকে বড় বড় রেশমের ও সোনার সব ট্যাসেল ঝুলানো। মেঝেটি সিল্কের কার্পেট দিয়ে মোড়া। এত বড় কার্পেট বা গালিচা দেখা যায় না। একটি প্রকাণ্ড তাঁবু বাইরে খাটানো থাকে, হলঘরের চাইতেও বড়। তাঁবুর সঙ্গে হলঘরের যোগও থাকে। প্রাঙ্গণের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে তাঁবু খাটানো হয়, চারিদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রুপোর পাত দিয়ে মোড়া। তাঁবুর ভার বহন করে মোটা মোটা থামের মতন পোস্ট, কয়েকটা বেশ মোটা, বড় জাহাজের মাস্তুল পোস্টের মতন। অন্যগুলি ছোট। তাঁবুর উপরের দিকটা লাল রঙের, ভিতরের দিকটা চমৎকার মসলিপত্তনের কাপড় দিয়ে সাজানো।

২৮। পর্যটক তাভার্নিয়েরও এই সিংহাসনেরও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে (Travels, Vol. I, P. 381-385)। তেহারণ ট্রেজারীতে পারস্যের শাহার দখলে এখন এই সিংহাসনটি রয়েছে। নাদীর শাহ যখন ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন এই সিংহাসনটি পারস্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৯। বার্নিয়ের শিল্পীর নামটি প্রকাশ করেননি কেন জানা যায় না, কিন্তু বার্নিয়েরের ভ্রমণ-কাহিনীর স্টুয়ার্ট সংস্করণে (কলিকাতা ১৮২৬) "La Grange" এই নামটি পাওয়া যায়। নামটি সত্য কি মিথ্যা তা অবশ্য বলবার উপায় নেই।

কাপড়টিতে বড় বড় ফুল তোলা। নানা রঙের ফুল। এত স্বাভাবিক দেখতে ফুলগুলি এবং এত উজ্জ্বল রং যে তাঁবুটি যেন সত্যিই ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা মনে হয়।

চারিদিকে যেসব গ্যালারী ও আর্কাদ আছে, সেগুলি ভাল করে সাজাবার ভার পড়ে ওমরাহদের উপর। এক-একজন আমীর একটি করে গ্যালারী সাজাবার দায়িত্ব নেন। তার জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন যাতে তাঁর নিজের গ্যালারীটি সবচেয়ে ভাল সাজানো হয় এবং সম্রাট দেখে সবচেয়ে বেশি খুশী হন ও বাহবা দেন। তার ফলে গ্যালারী সাজানো খুব চমৎকার হয়, এবং প্রত্যেক আর্কাদ ও গ্যালারী আগাগোড়া গালিচা ও ব্রকেড দিয়ে ঢাকা থাকে।

উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট এবং সম্রাটের পরে তাঁর আমীর-ওমরাহরা দাঁড়িপাল্লায় নিজেদের ওজন করান। দাঁড়িপাল্লা ও বাটকারা দুই নীরেট সোনার তৈরি। আমার বেশ মনে আছে, যে-বছরের কথা আমি বলছি, সেই বছরের উৎসবের সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের ওজন নিয়ে যখন দেখা গেল যে তার আগের বছরের তুলনায় দুই পাউণ্ড বেড়েছে, তখন সকলে তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

এইরকম উৎসব প্রত্যেক বৎসরেই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু যে-বৎসরের কথা আমি বলছি বা যে অনুষ্ঠান আমি দেখেছি, সেরকম জাঁকজমক ও সমারোহ সাধারণত কোনো বৎসর হয় না। শোনা যায়, উৎসবের এই সমারোহের বিশেষ একটা কারণ ছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে রেশম, ব্রকেড ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের কেনাবেচা একরকম ছিলই না বলা চলে। সম্রাট ঔরঙ্গজীব এই উৎসবের মাধ্যমে কয়েক বছরের সঞ্চিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন বণিকদের। ওমরাহদের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল এই উৎসবে, তা কল্পনাতীত। কিছুটা এই অর্থের অংশ সাধারণ সেপাইদের ভাগ্যেও জুটেছিল, কারণ ওমরাহরা তাদের মের্জাই তৈরি করার জন্যও ব্রকেড কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহুকালের একটি প্রচলিত প্রথাও পালন করা হয়ে থাকে। প্রথাটি ওমরাহদের কাছে খুব প্রীতিকর নয়। প্রথাটি হল, বাৎসরিক উৎসবের সময় সম্রাটকে পদমর্যাদা ও তনখা অনুযায়ী প্রত্যেক ওমরাহের পক্ষ থেকে ভেট বা উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা। কেউ কেউ অবশ্য এই সুযোগে বেশ মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সম্রাটকে খুশী করার সুযোগও পান। অনেক কারণে তাঁরা এই সুযোগ খোঁজেন। সরকারী কর্মচারী যিনি যা অপকর্ম,

অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, যাতে সে সম্বন্ধে কোনো তদন্ত না হয়, অথবা সম্রাট তার জন্য কোনো কৈফিয়ত না তলপ করবেন, তার জন্যও কেউ কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে বহু মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে সম্রাটের কাছে হাজির হন। কেউ কেউ আবার ভাল সেলামী দেন নিজেদের পদোন্নতি বা তনখা বৃদ্ধির জন্য। কেউ উপঢৌকন দেন বহু মূল্যবান মণিরত্ন—হীরে জহর পান্না চুনি ইত্যাদি, কেউ দেন সোনার পাত, রত্নখচিত, কেউ দেন সোনার মোহর। একবার এই উৎসবের সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীব জাফর খানের কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর উজীর বলে নয় শ্যালক বলে। জাফর খাঁ তাঁকে এক লক্ষ ক্রাউন মূল্যের সোনার মোহর, সুন্দর সুন্দর মুক্তা, চুনি ইত্যাদি প্রায় চল্লিশ হাজার ক্রাউন মূল্যের রত্ন উপহার দিয়েছিলেন। অবশ্য সম্রাট সাজাহান নাকি এইসব রত্নের মূল্য আরও অনেক কম বলে ধার্য করেছিলেন, পঁচিশ ক্রাউনেরও কম। তাতে অনেক বড় বড় জহুরী পর্যন্ত বোকা বনে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁরাও তার সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারেননি।[30]

হারেমের মেলার বর্ণনা

এই উৎসবের সময় হারেমের বা জেনানা মহলে একটি অদ্ভুত ধরনের মেলা হয়।[31] মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নেন আমীর ওমরাহদের পত্নীরা, সাধারণত তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী স্ত্রী যাঁরা তাঁরা। বড় বড় আমীর-ওমরাহ ও মনসবদারদের সুন্দরী ভার্যারাই হারেমের এই বিচিত্র মেলার পরিচালিকা। যে সমস্ত দ্রব্য মেলায় সাজানো হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জরীর ফুললতাপাতা-তোলা রেশমী কাপড়, ভাল ভাল সূচীশিল্প, সোনার কারুকাজ-করা

৩০। তাভার্নিয়ারের বিবরণ থেকে জানা যায় সম্রাট ঔরঙ্গজেব একবার নাকি সাজাহানকে একজন জহুরী মনে করে, এইসব মণিরত্নের যথার্থ মূল্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

৩১। প্রতি মাসের উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট একটি করে মেলা আহ্বান করেন, বিশ্বের সুন্দর সুন্দর সামগ্রীর বিষয় প্রশ্নাদি করার জন্য। তখনকার বণিকরা তাতে যোগদান করতেন এবং পণ্যদ্রব্যের পসরা সাজাতেন। সম্রাটের হারেমের মহিলারা এবং অন্যান্য মহিলারাও তাতে আমন্ত্রিত হতেন। একটা মেলার মতন সেখানে বেচাকেনা চলত। সাধারণত দিনেই সম্রাট তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন, নানা জিনিসের মূল্য ঠিক করে দিতেন। দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আহরণ করতেন। সারা সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা, দেশের কারখানাদির ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সব এই মেলায় ধরা পড়ত। এই মেলামেশা ও পণ্যবিনিময়ের দিনটিকে সম্রাট বলতেন—'খুশরোজ'—অর্থাৎ 'খুশীর দিন।' (আইন-ই-আকবরী)

শিরস্ত্রাণ, দামী মস্‌লিন ইত্যাদি সব বিলাসের সামগ্রী। মেলাব বিশেষত্ব হল, সুন্দরী পরিচালিকারা (আমীর ও মনসবদারদের স্ত্রী) বিচিত্র বেশবিন্যাস করে বেচাকেনাব কাজ করেন। তাঁবাই বিক্রেতা সাজেন। ক্রেতা হলেন্ সম্রাট, তাঁর বেগমরা এবং হারেমের নামজাদা মহিলাবা। যদি কোনো আমীর-পত্নীর কোনো বয়স্কা সুন্দবী কন্যা থাকে, তাহলে তিনি তাকেও সঙ্গে করে সাজিয়ে-গুজিয়ে মেলায় নিযে যান, যাতে কন্যাটির দিকে সম্রাট ও তাঁব বেগমদেব নজর পড়ে এবং তার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হন। মেলার প্রধান আকর্ষণ হল, কেনাবেচাব চমৎকাব হাস্যকর অভিনযটি। সম্রাট নিজে ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্তর দেখেন এবং সুন্দবী বিক্রেতা আমীব-মনসবদাব-পত্নীদের সঙ্গে দরদস্তুরও করেন। দরদস্তুরের ভঙ্গিমাটি খুব মজাব। অনেক সময় দু-চার পয়সা নিয়ে সম্রাট দব কষাকষি করেন সুন্দরীদের সঙ্গে এবং এমন ভাব দেখান যে তিনি তাব চেয়ে এক কডিও বেশি মূল্য দিতে নারাজ। সম্রাট বলেন—'তোমবা বেশি দাম চাইছ, যেবকম জিনিস নয় তাব চেয়ে বেশি। তাহলে বইল তোমাদের জিনিস, আমি চললাম অন্য কাবও কাছে, দেখি যদি ঐ দামে কেউ বিক্রি করে।' এইবকমেব অনেক কেনাবেচার কথাবার্তা হয়। সুন্দরীবাও তখন সম্রাটকে নানাভঙ্গীতে জিনিস গছাবার চেষ্টা কবেন এবং তাঁকে নিয়ে বেশ টানাটানি চলে। সম্রাটও সহজে ছাড়ার বান্দা নন। দুই পক্ষে যখন টানাটানি ও কষাকষির অভিনয় চলে তখন সম্রাট যদি কিছুতেই রাজী না হন, তাহলে সুন্দরী আমীর-পত্নী ও মনসবদার-পত্নীরাও মুখ ঘুরিযে বেশ জোর গলায় দু-চার কথা শোনাতে ছাড়েন না। তাঁরাও সম্রাটকে বলেন—'না নেবেন, না নেবেন! আপনি এসব জিনিসের কদর বুঝবেন কি করে? দেখেছেন কখনও এমন জিনিস? বেশ, না নেন যদি তাহলে দেখুন অন্য কোথাও সুবিধে পান কি না'—ইত্যাদি। এইভাবে কেনাবেচার একটা রংতামাসা চলতে থাকে মেলার মধ্যে। সম্রাটের বেগমরা সস্তায় কেনার আগ্রহ আরও যেন বেশি করে দেখান এবং নানারকম অভিনয় করেন দর নিয়ে। মধ্যে মধ্যে আমীর-পত্নী ও মনসবদার-পত্নীদের সঙ্গে সম্রাট ও তাঁর বেগমদের দরাদরি ও তর্কবিতর্ক রীতিমত কলরবে পরিণত হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটি মিলে একটি চমৎকার কৌতুকনাট্যের অভিনয় করা হয় বলে মনে হয়। অবশেষে সুন্দরীরা অবশ্য জিনিস বিক্রি করতে রাজী হন সম্রাট ও বেগমদের কাছে। তখন সম্রাট ও তাঁর বেগমরা অনবরত জিনিস কিনতে থাকেন মেলা থেকে, এবং অনর্গল টাকা দিতে থাকেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে

হয়ত সম্রাট দাম ছাড়াও দু-চারটে সোনার মোহর সুন্দরী বিক্রেতা অথবা তাদের রূপসী কন্যাদের বিতরণ করেন পুরস্কার-স্বরূপ। 'সাধু ব্যবসায়ী' বলে তিনি পুরস্কার দেন। গোপনেই সকলে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এবং হাসিঠাট্টা রঙ্গ-তামাসার মধ্যে এইভাবে হারেমের মেলাটি শেষ হয়ে যায়।

কাঞ্চনবালার কাহিনী

সম্রাট সাজাহানের নারীর প্রতি অনুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং তিনিই নাকি এই সব উৎসবে এই জাতীয় মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। তার জন্য ওমরাহরা নাকি বিশেষ খুশি হতেন না।[৩২] সাজাহান তাঁর হারেমে বাইরের নাচওয়ালীদের প্রবেশাধিকার দিয়ে নিশ্চয় শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন বলতে হবে। তিনি তাঁর হারেমে বাইরের যে নর্তকীদের নিয়ে আসতেন নাচগানের জন্য, তাদের 'কাঞ্চন' বলত। কাঞ্চনবর্ণ রূপসী যুবতী মেয়ের দল। বাইরে থেকে হারেমের মধ্যে তাদের সম্রাট নিয়ে আসতেন এবং রাতভোর আটকে রেখে দিতেন। তারা কিন্তু বাজারের বারাঙ্গনা নয়। গৃহস্থ ও ভদ্রঘরের মেয়েই বেশি। আমীর-ওমরাহ ও মনসবদারদের বিবাহোৎসবে এরা নাচগান করার জন্য আমন্ত্রিত হয়। অধিকাংশ কাঞ্চনবালা বেশ সুন্দর দেখতে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, এবং নৃত্যগীতকলায় রীতিমত পারদর্শী। যেমন নাচিয়ে, তেমনি গাইয়ে। দেহের গড়ন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন নরম ও কোমল যে নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গিমা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন লীলায়িত হয়ে ওঠে। তাল ও মাত্রাজ্ঞানও চমৎকার। কণ্ঠের মিষ্টতাও অতুলনীয়। অথচ এই কাঞ্চনবালারা সাধারণ ঘরের মেয়ে। সম্রাট সাজাহান তাদের যে শুধু মেলাতেই নিয়ে আসতেন তা নয়। প্রতি বুধবারে আমখাসে তাদের হাজিরা দিতে হত সম্রাটের সামনে। এটা নাকি অনেক কালের প্রাচীন প্রথা। সম্রাট সাজাহান কেবল তাদের একবার চোখে দর্শন করেই মুক্তি দিতেন

৩২। গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলমানরা সাধারণত এই ধরনের মেলার বিরোধী ছিলেন। বাদাউনি (Badaoni) ছিলেন আকবর বাদশাহের আমলের সবচেয়ে নির্ভীক ঐতিহাসিক (আঃ ১৫১৬খ্রীঃ)। মেলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'আমাদের ইসলামধর্মের নীতিকে আঘাত করার জন্যই যেন মনে হয় যে বাদশাহ এই বাৎসরিক মেলায় (নববর্ষের সময়) বেগমদের, হারেমের মহিলাদের ও অন্যান্য বিবাহিত স্ত্রীলোকদের ইচ্ছানুযায়ী যোগদান করার ও পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় করার আদেশ দিয়েছেন। এই ধরনের মেলায় বাদশাহ নিজেও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করেন। তাছাড়া হারেমের মহিলাদের অনেক গোপনীয় ব্যাপার, বিবাহাদির কথাবার্তা, যুবক-যুবতীদের প্রেমের সূত্রপাত, সবই এই মেলাতেই ঘটে থাকে।"

না। প্রায়ই তিনি সারারাত তাদের আটকে রাখতেন এবং রাজকর্মের শেষে তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন, তাদের সঙ্গে মস্করা করে সময় কাটাতেন। ঔরঙ্গজীব তাঁর পিতার চেয়ে অনেক বেশি গোড়া ধর্মানুরাগী ও আত্মসংযত পুরুষ ছিলেন। তিনি কাঞ্চনবালাদের হারেমে প্রবেশ করতে দিতেন না। তবে বহুকালের প্রথানুযায়ী তাদের প্রতি বুধবারে একবার করে আমখাসে আসবার হুকুম দিয়েছিলেন। আমখাসে এসে বহুদূর থেকে তারা সম্রাটকে সেলাম করে তৎক্ষণাৎ চলে যেত।

বার্নার্ড বৃত্তান্ত

উৎসব-অনুষ্ঠান, মেলা, কাঞ্চনবালা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে 'বার্নার্ড' (Bernard) নামে একজন স্বজাতীয় ও স্বদেশবাসীর কথা মনে পড়ছে। এখানে বার্নার্ড-সংক্রান্ত একটি ছোট্ট কাহিনীর উল্লেখ না করে পারছি না। প্লুটার্ক (Plutarch) ঠিকই বলেছিলেন যে নগণ্য ঘটনা বা বিষয় কখনও উপেক্ষা করা বা গোপন করা উচিত নয়, কারণ বাইরে থেকে যা সামান্য মনে হয়, ঐতিহাসিকের কাছে তার অসামান্য মূল্য থাকতে পারে। সামান্য ব্যাপারের মধ্যে অনেক সময় লোকচরিত্র ও লোকপ্রতিভার বিশেষত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, অসামান্য ঘটনার মধ্যে সাধারণত তা পাওয়া যায় না। এইদিক থেকে বিচার করলে আমার বার্নার্ড কাহিনী যদিও হাস্যকর, তাহলেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে। বার্নার্ড সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে থাকতেন তাঁর রাজত্বের শেষদিকে। ভাল চিকিৎসক ও সার্জেন বলে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল তখন। তিনি মোগল বাদশাহের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রায় সম্রাটের সঙ্গে এক টেবিলে খানাপিনায় যোগদান করতেন।[৩৩] অনেক সময় তারা দুজনেই খুব বেশি পরিমাণে সুরাপান করতেন শোনা যায়। দুজনেরই রুচি একই রকমের ছিল প্রায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর সর্বক্ষণ তাঁর নিজের সুখস্বচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বা দায়িত্ব যা কিছু তা সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। নুরজাহান বিদুষী ও

৩৩। কাত্রু (Catrou) জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে বলেছেন : 'আগ্রার ফিরিঙ্গীদের সম্রাটের কাছে স্বচ্ছন্দ গতিবিধি আছে, কারও উপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। সম্রাট এই ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সারারাত মদ্যপান করেন। প্রধানত মুসলমান পরবের দিনেই তাঁর এই রাত্রিব্যাপী মদ্যপান ও স্ফূর্তি চলতে থাকে।'

বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন এবং রাজকার্য এমন সুন্দর নিখুঁতভাবে তিনি করতেন যে কোনোদিন কারও হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজন হত না। তাঁর স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। বার্নার্ডের দৈনিক তনখা ছিল দশ ক্রাউন করে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উপরি অর্থ তিনি রোজগার করতেন নিয়মিত হারেমের মহিলাদের ও ওমরাহদের চিকিৎসা করে। কঠিন অসুখ-বিসুখ সারিয়ে অনেক উপঢৌকনও তিনি পেতেন। হারেমের মহিলারা ও আমীর ওমরাহরা পাল্লা দিয়ে ভাল ভাল উপহার দিয়ে তাঁকে খুশী করবার চেষ্টা করতেন। সুতরাং চিকিৎসক বার্নার্ড সাহেবের অর্থের অভাব ছিল না। উপহার পাবার আরও একটা কারণ হল, সকলেই জানতেন যে তিনি সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই সকলে তাঁকেও ভেট দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বার্নার্ড সাহেবের অর্থের প্রতি বিশেষ মমতা ছিল না। যা তিনি পেতেন, তার অধিকাংশই তিনি নিজে আবার বিলিয়ে দিতেন উপহার দিয়ে। তার জন্য সকলেই তাঁকে আরও ভালবাসত। বিশেষ করে নর্তকী কাঞ্চনবালাদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি, কারণ তার অর্থের বেশির ভাগ তিনি তাদের জন্যই ব্যয় করতেন। তাঁর গৃহে কাঞ্চনবালারা নিয়মিত আসত এবং নৃত্যগীত করে তাঁকে খুশি করত। এইভাবে বার্নার্ডের দিন কেটে যায়। কিন্তু এর মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে গেল। বার্নার্ড একটি কাঞ্চনবালার প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রচণ্ডভাবে প্রেমে পড়লেন। কাঞ্চনের নৃত্যভঙ্গিমায় বার্নার্ড বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য বার্নার্ড সেই কাঞ্চনের পাণিপ্রার্থী হলেন। কিন্তু কাঞ্চনরা সাধারণত কুমারীই থাকে, তাদের বাপ-মারা তাদের বিবাহ দিতে চান না, কারণ বিবাহ করলে তাদের রূপযৌবন বেশি দিন স্থায়ী হবে না এবং অর্থোপার্জনে বিঘ্ন ঘটবে, এই তাঁদের ধারণা। সুতরাং বার্নার্ড-প্রেয়সীর জননী যখন বুঝতে পারলেন যে বার্নার্ড সাহেব তাঁর কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তখন থেকে তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন তাঁর কন্যাটির উপর, যাতে কোনোরকম অঘটন কিছু না ঘটে। বার্নার্ডের করুণ কাকুতি-মিনতি দিনের পর দিন কাঞ্চনবালা প্রত্যাখ্যান করে ঘরে ফিরে যায়। বার্নার্ডের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ক্রমেই তিনি হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েন। এমন সময় একদিন হঠাৎ আমখাসে সকলের সামনে সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন যে, বার্নার্ডের সুচিকিৎসার জন্য তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। হারেমে কোনো মহিলার দুরারোগ্য ব্যাধির সার্থক চিকিৎসা করেছিলেন বলে সম্রাট তাঁকে

পুরস্কার দিতে চান। আমখাসে সকলের সামনে এই ঘোষণার পর বার্নার্ড উঠে বলেন: 'সম্রাট! মার্জনা করবেন। আমি আপনার এই মূল্যবান উপহার গ্রহণ করতে অক্ষম। আমার বিনীত নিবেদন, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে কোনো উপহার দিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে কাঞ্চনবালাদের দলের মধ্যে ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনাকে সেলাম করার জন্য, ওকে উপহার দিন আমাকে।' সভায় সমস্ত লোকজন বার্নার্ড সাহেবের উক্তি শুনে হো-হো করে হেসে উঠলো। সম্রাটের উপহার প্রত্যাখ্যান করার ধৃষ্টতা এবং খ্রীষ্টান হয়ে মুসলমানকন্যাকে উপহার চাওয়ার স্পর্ধা তাদের কাছে হাস্যকরই মনে হবার কথা। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোনোদিনই ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না কিছু। বার্নার্ডের প্রস্তাব শুনে তিনি নিজেও অট্টহাসি হাসলেন এবং হেসে হুকুম দিলেন, কাঞ্চনকন্যাকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারসাহেবকে দান করে দিতে। সম্রাট বললেন: 'মেয়েটিকে দল থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে ডাক্তারের কাঁধে এখনই বসিয়ে দাও এবং তাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে ডাক্তারকে চলে যেতে বলো।' যেমন বলা, তেমনি করা। বলা মাত্রই সভাসুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে মেয়েটিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে আমখাসের মধ্যেই ডাক্তার বার্নার্ডের স্কন্ধের উপর চাপিয়ে দিল এবং বার্নার্ড সাহেবও কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বিজয়ী বীরের মতন সগর্বে কাঞ্চনবালাকে কাঁধে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হাতির লড়াই

উৎসবের শেষে একরকমের ক্রীড়া হয় যা আমাদের দেশ ছাড়া ইয়োরোপে দেখা যায় না। ক্রীড়াটি হল—হাতির লড়াই। নদীর তীরে বালুভূমির উপর সকলের সামনে এই হাতির লড়াই হয়। সম্রাট নিজে, রাজান্তঃপুরের মহিলারা, আমীর ওমরাহরা প্রত্যেকে যে যার স্বতন্ত্র গবাক্ষ থেকে এই হাতির লড়াই দেখেন ও রীতিমত উপভোগ করেন।

তিন-চার ফুট চওড়া এবং পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু একটি মাটির দেয়াল তৈরি করা হয়। দুটি বৃহদাকার জন্তু (অর্থাৎ হাতি) দেয়ালের দুদিক থেকে মন্থরগতিতে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেক হাতির পিঠে দুজন করে মাহুত থাকে। প্রথম মাহুতটি, যে কাঁধের উপর বসে লোহার ডাঙ্গস নিয়ে হাতি চালায়, সে যদি কোনোরকমে বেকায়দায় পড়ে যায় তাহলে যাতে পিছনের দ্বিতীয় মাহুতটি তৎক্ষণাৎ এসে তার স্থানটি দখল করে কাজ চালিয়ে নিতে পারে, তার জন্য এই

জোড়া-মাহুতের ব্যবস্থা। মাহুতরা হয় আদর করে মিষ্টিকথা বলে, অথবা নানারকম সাঙ্কেতিক ভাষায় গালাগালি দিয়ে, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে হাতিদের সম্মুখসমরে প্ররোচিত করে। পা-দানিতে পা চেপেও তারা হাতিকে উৎসাহিত করে। অবশেষে ঐ মাটির দেয়ালের দুদিকে দুটি হাতি এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রথম আঘাতটি মারাত্মক। দেখলে অবাক্ হতে হয় ভেবে যে কি করে তারা পরস্পরের গজদন্ত, মাথা ও শুঁড়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকে। লড়াই একটানা চলে না, মধ্যে মধ্যে উভয়-পক্ষই বিশ্রাম নেয়, আবার প্রচণ্ডভাবে পুনরাক্রমণ হয়। ক্রমে মাটির দেওয়ালটি মাটিতে মিশিয়ে যায় এবং বেশি দুর্ধর্ষ হাতিটি অন্য হাতিটিকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে শুঁড় বা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। এমন ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরে যে কোনোভাবে আর দুজনকে ছাড়াবার উপায় থাকে না। তখন নিরুপায় হয়ে চর্‌কি জ্বালিয়ে, বাজি ফুটিয়ে তাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কারণ এই একটি মাত্র অস্ত্র যা হাতিরা যমের মতন ভয় করে। আগুন তারা সহ্য করতে পারে না, এবং পটকা বা বোমার আওয়াজ শুনলে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়। এইজন্য আগ্নেয়াস্ত্রের যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির ব্যবহার একেবারে অচল হয়ে গেছে। যুদ্ধে আর হাতির কোনো কদর নেই। সিংহলের হাতি সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও সাহসী, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ট্রেনিং না দিয়ে আগে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। বছরের পর বছর কানের কাছে বন্দুকের আওয়াজ করে, এবং পায়ের কাছে পটকা বোমার শব্দ করে, তাদের অভ্যস্ত করা হয়, ট্রেনিং দেওয়া হয়। তারপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হয়, তার আগে নয়।

এই হাতির লড়াই দেখতে হলে অনেক সময় খুব নিষ্ঠুরের মতন দেখতে হয়। কারণ মাহুতরা কেউ কেউ মধ্যে মধ্যে হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে পদতলে দলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। হাতির লড়াইয়ে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দুই পক্ষের হাতিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতির পিঠ থেকে মাহুতকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে এবং তার জন্য অনেক সময় শুঁড় দিয়ে মাহুতকে জড়িয়ে ধরতে যায়। এ ভয় সবসময় থাকে। তাই হাতির লড়াইয়ের দিনে যে মাহুতদের উপর হাতিতে চড়ার পালা পড়ে তারা তাদের স্ত্রীপুত্রআত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসে। যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, মৃত্যুর মঞ্চারোহণ করতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাদের একমাত্র সান্ত্বনা হল এই যে যদি তারা কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারে এবং যদি তাদের হাতির

লড়াই দেখে সম্রাট খুশী হন, তাহলে তাদের মাসিক তনখা বৃদ্ধি হবে এবং তারা এক থলে পয়সা (পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক আন্দাজ) পুরস্কার-স্বরূপ পাবে। হাতির পিঠ থেকে নামা মাত্র তাদের ঐ পয়সার থলেটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।[৩৪] তাদের আরও একটা মস্তবড় সান্ত্বনা এই যদি তাদের মৃত্যু হয় তাহলে তাদের বিধবা পত্নীরা তাদের তনখা ভাতাস্বরূপ পাবে এবং তাদের যোগ্য পুত্র থাকলে সেই চাকরিতে বহাল হবে। কিন্তু হাতির লড়াইয়ের মর্মান্তিক মজার শেষ হয়নি এখনও। আরও কিছুটা বাকি আছে, বলা হয়নি। প্রায়ই দেখা যায়, হাতির লড়াইয়ের সময় মাহুতরাই যে মরে তা নয় দর্শকদের মধ্যেও কেউ কেউ বেকসুর প্রাণটা হারায়। উন্মত্ত হাতি মধ্যে মধ্যে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ছুটে চলে এসে আতঙ্কের সঞ্চার করে। ঘোড়া, মানুষ যে যেখানে থাকে ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে এবং কেউ হাতির পায়ের তলায় পড়ে, কেউ বা ভিড়ের চাপে পড়ে মারা যায়। এত প্রচণ্ডভাবে ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি আরম্ভ হয় যে কারও কোনো দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। দ্বিতীয়বার আমি যখন এই হাতির লড়াই দেখেছিলাম তখন আমিও কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম, কেবল আমার দুরন্ত ঘোড়াটির জন্য এবং আমার অনুচর ভৃত্যটির প্রাণপণ চেষ্টার জন্য।

দিল্লীর মসজিদ ও সরাই

এইবার দুর্গ ত্যাগ করে আবার শহরে ফিরে যাই, কারণ দিল্লী শহরের দুটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি।* তার মধ্যে একটি হল জুম্মা মসজিদ।[৩৫] শহরের মধ্যে একটি উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত

৩৪। পিলখানার প্রত্যেক হাতির একজন করে নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, লড়াইয়ের জন্য। সম্রাটের হুকুম পেলেই তাদের লড়াইয়ের জন্য বাইরে আনা হয়। লড়াইয়ের সময় কৃতী মাহুতদের পুরস্কার দেবার জন্য তার পয়সা থাকে। প্রায় এক হাজার 'দাম' বা পয়সার এক-একটি থলে ('দাম' ও পয়সা ঠিক এক নয় অবশ্য)। আনুমানিক পঁচিশ টাকার বেশি পুরস্কারের মূল্য নয়।

* 'দিল্লী ও আগ্রা' সম্বন্ধে চিঠির বাকি অংশটুকুতে বার্নিয়ের জুম্মা মসজিদ বেগম সরাই ও আগ্রার তাজমহলের বর্ণনা দিয়েছেন। মোগলযুগের শেষে ভারতবর্ষে খ্রীস্টানধর্মের ক্রমবিস্তারের কাহিনীটুকু ছাড়া, এই অংশে মূল্যবান সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ বিশেষ কিছু নেই; এইজন্য এই অংশটুকু মধ্যে মধ্যে মর্মানুবাদ করেছি। খ্রীস্টান পাদরীদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বার্নিয়েরের বক্তব্য অবশ্য যথাযথ অনুবাদ করেছি।—(অনুবাদক)

৩৫। জুম্মা মসজিদ ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট সাজাহান নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন এবং ছয় বছরে নির্মাণের কাজ শেষ হয়। মসজিদের সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন বলেছেন—'It is

বলে মসজিদটিকে দূর থেকে অদ্ভুত দেখায়। টিলার উপরটা আগেই সমতল করে নেওয়া হয়েছিল এবং তার আশেপাশের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে ঘোরাবের মতন করা হয়েছিল। এইখানে চারটি বড় বড় রাস্তা এসে চারদিক থেকে মিলিত হয়েছে মসজিদের ঠিক চারিদিকে। মসজিদের প্রধান ফটকের ঠিক সামনে একটি, পিছন দিকে একটি, দুপাশের দুটি ফটকের সামনে আর দুটি রাস্তা। তিন দিকের তিনটি ফটকে উঠতে হলে পঁচিশ থেকে ত্রিশটি করে সিঁড়ি পার হতে হয়। পিছন দিকটি একেবারে টিলার সঙ্গে লাগানো, যেন একসঙ্গে গেঁথে তোলা। তিনটি ফটকই শ্বেতপাথরের তৈরি, দেখতে অতি সুন্দর এবং তার দরজাগুলিতে তামার পাত বসানো। প্রধান ফটকটি অন্যান্য ফটকের তুলনায় অনেক বেশি জমকালো দেখতে এবং তার উপর ছোট ছোট সাদা মিনার আছে অনেক। দেখতে অপূর্ব দেখায়। মসজিদের পেছনে তিনটি বড় বড় গম্বুজ আছে, তার মধ্যে মাঝখানের গম্বুজটি সবচেয়ে বড় ও উঁচু। গম্বুজগুলিও শ্বেতপাথরের তৈরি। প্রধান ফটক ও তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানটি উন্মুক্ত। প্রচণ্ড গরমের জন্য এই উন্মুক্ততার প্রয়োজন আছে। বড় বড় শ্বেতপাথরের চাঁই বসানো মাঝখানে। আমি স্বীকার করি যে মসজিদটি স্থাপত্যবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী নিখুঁতভাবে তৈরি হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু রুচিসম্মত নয় এমন কিছু ত্রুটি নেই মসজিদের গড়নের মধ্যে কোথাও। প্রত্যেকটি অংশ তার নিখুঁতভাবে তৈরি। সমতা ও সামঞ্জস্যবোধ তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। আমি অন্তত মনে করি যে এই মসজিদের মতন যদি কোনো গির্জা থাকত প্যারিসে, তাহলে স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে তা সকলের কাছে প্রশংসা অর্জন করত। গম্বুজ আর মিনারগুলি কেবল শ্বেতপাথরের তৈরি। এ ছাড়া বাকি অংশ লাল বেলেপাথরের।

সম্রাট প্রতি শুক্রবারে মসজিদে যান প্রার্থনা করতে। আমাদের যেমন রবিবার, মুসলমানদের তেমনি শুক্রবার। যে রাস্তা দিয়ে তিনি মসজিদে যান, সেই রাস্তায় জল ছিটানো হয় আগে থেকে, ধুলো ও উত্তাপ দুইই কমানোর জন্য। দুর্গের ফটকের কাছ থেকে মসজিদের ফটক পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে সারবন্দী

---

one of the few mosques either in India or elsewhere, that is designed to produce a pleasing effect externally'—(History of Indian and Eastern Architecture, 2nd Ed. Vol, II, P 318)

হয়ে বন্দুকধারী সৈন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচ-ছয়জন অশ্বারোহী সামনে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যায় এবং তারা অনেকটা এগিয়ে থাকে সামনে, পাছে তাদের চলার পথের ধুলো সম্রাটের বিরক্তির কারণ হয়। এইভাবে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলে, সম্রাট মসজিদের পথে যাত্রা করেন। হয় সুসজ্জিত হাতির পিঠে চড়ে যান, আর তা না হলে আটজন বাহকের স্কন্ধে সিংহাসনে চড়ে যান। নানারকমের রঙ-বেরঙের কাপড়, বনাত ইত্যাদি দিয়ে হাতির হাওদা ও সিংহাসন সাজানো থাকে। সম্রাটের অনুগমন করেন একদল ওমরাহ, কেউ ঘোড়ায় চড়ে কেউ বা পাল্‌কিতে চড়ে। ওমরাহদের সঙ্গে অনেক মনসবদারদেরও দেখা যায়। অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সময় যেরকম জমকালো শোভাযাত্রা হয়, মসজিদে প্রার্থনা করতে যাবার সময় ঠিক সেরকম কিছু না হলেও, যা হয় তাও কম রাজকীয় নয়।

জুম্মা মসজিদের পর উল্লেখযোগ্য হল দিল্লীর বেগমসরাই। সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগমসাহেবা এই সরাইটি তৈরি করেছিলেন বলে এর নাম বেগমসরাই। শুধু বেগমসাহেবা নন, ওমরাহরাও এইভাবে শহরের শ্রীবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন। বেগমসরাই অনেকটা খোলা স্কোয়ারের মতন, চারিদিকে তোরণপথ। তোরণগুলি রাজপ্রাসাদের তোরণের মতন, কেবল পৃথকভাবে পার্টিশন দেওয়া। ভিতরে ছোট ছোট কামরা আছে অনেক। ধনী পারসী, উজবেক ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বিশ্রামের স্থান এই সরাই। কামরা খুলে তাঁরা সরাইয়ে স্বচ্ছন্দে নিরাপদে থাকতে পারেন, কারণ রাতে প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দিলে ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। চমৎকার ব্যবস্থা অতিথিদের জন্য। প্যারিসে যদি এই ধরনের সরাই কয়েকটা থাকত তাহলে বাইরের যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হত না। তাঁরা প্যারিসে এসে প্রথমে কয়েকদিন এই সরাইযে থেকে ধীরেসুস্থে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

•

দিল্লীর লোকজন

দিল্লীর বিবরণ শেষ করার আগে আরও দু-একটি প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে চাই। আমি জানি, এই প্রশ্ন হয়ত আপনার মনে জাগবে। দিল্লীর লোকসংখ্যা কত, এবং তার মধ্যে ভদ্রশ্রেণীর সংখ্যাই বা কত? ফ্রান্সের রাজধানীর সঙ্গে তার তুলনা হয় কি না? প্যারিসের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় যেন তিন-চারটি শহরের সমাবেশ হয়েছে একসঙ্গে। তার আগাগোড়া অট্টালিকা ও লোকজনে

পরিপূর্ণ। গাড়ি-ঘোড়ার অন্ত নেই যেন। কিন্তু সেই অনুপাতে খোলা জায়গা, স্কোয়ার, বাগান-বাগিচা ইত্যাদি নেই। দেখলে মনে হয় প্যারিস যেন পৃথিবীর নার্সারী এবং ভাবা যায় না যে দিল্লীর লোকসংখ্যা প্যারিসের সমান। আবার দিল্লী শহরের বিশাল আয়তন এবং অসংখ্য দোকান-পাটের কথা ভাবলে অন্য-রকম মনে হয়। তার সঙ্গে দিল্লীর লোকসংখ্যার কথা ভাবলেও অবাক না হয়ে পারা যায় না। আমীর-ওমরাহ ছাড়াও দিল্লী শহরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য ও বহু দাসদাসী থাকে, তাদের প্রভুরা থাকেন। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কোঠায় বাস করে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে। এমন কোনো গৃহ নেই যা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ নয়। বাইরের গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন একটু কমে যায়, যখন লোকজন রাস্তায় চলাফেরা করার জন্য বেরিয়ে আসে, তখনও দিল্লীর পথের দৃশ্য দেখে মনে হয় না যে দিল্লীর লোকসংখ্যা কম। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় রাস্তায় বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও, লোকের ভিড়ে প্রায় পথ চলা যায় না। সুতরাং লোকসংখ্যার দিক থেকে দিল্লী ও প্যারিসের তুলনামূলক আলোচনা করার আগে এ সব কথা বিবেচনা করা উচিত। বিবেচনা করলে মনে হয় যে প্যারিসের সমান লোক-সংখ্যা না হলেও, দিল্লীর লোকসংখ্যা প্যারিসের চেয়ে বেশি কম নয়।

অবস্থাপন্ন ও ভদ্রশ্রেণীর লোকের কথা ধরলে অবশ্য অন্যরকম মত প্রকাশ করতে হয়। প্যারিসে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশি। প্যারিসের প্রতি দশজন লোকের মধ্যে অন্তত সাত-আটজন ভদ্রবেশী, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয় মোটামুটি অবস্থাপন্ন কিন্তু দিল্লী শহরে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। প্রতি দশজনের মধ্যে সাত-আটজন দরিদ্র ও জীর্ণবেশী, আর দু-একজন মাত্র ভদ্রবেশী। এই সব দরিদ্র লোক শহরে আসে সৈন্যবাহিনীতে চাকুরির লোভে। অবশ্য আমি নিজে যাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং সাধারণত যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা অধিকাংশই অবস্থাপন্ন। খুব মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁরা ব্যবহার করেন এবং সব সময় খুব ফিট্‌ফাট থাকেন। আমীর-ওমরাহ, রাজা-রাজড়া ও মনসবদাররা যখন আমখাসে বা অন্য কোনো সময় রাজদরবারে যাওয়ার জন্য সমবেত হন দুর্গের সামনে, তখন সত্যিই উপভোগ করবার মতন দৃশ্য হয়। মনসবদাররা চারিদিক থেকে ঘোড়ায় করে দৌড়ে আসেন, চারজন করে ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এবং প্রভুদের জন্য পথ পরিষ্কার করতে থাকেন। তারপর ওমরাহ ও রাজারা কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ বা হাতির পিঠে চড়ে দরবার অভিমুখে যাত্রা করেন। অধিকাংশই অবশ্য ছয়

:বেগাবাব সুসজ্জিত প লকিতে চড়ে যান, মকমলেব গদিতে হেলান দিয়ে বসে, পান চিবুতে চিবুতে। পান খাওয়াব উদ্দেশ্য হল মুখেব সুগন্ধ ছড়ানো এবং ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল কবা। আমিবী ভঙ্গীতে পাল্কিতে তাকিযা হেলান দিয়ে বসে ওমবাহ ও বাজাবা সুগন্ধি পান চিবুতে থাকেন এবং পাল্কিব সঙ্গে একজন ভৃত্য দৌড়তে থাকে পিকদান নিয়ে। পোর্সেলিন বা রুপোব পিকদান। ওমবাহ ও বাজাবা পিকদানে পিক ফেলতে ফেলতে যান। পালকিব একদিকে এইভাবে পিকদান হাতে ভৃত্য দৌড়তে থাকে, আব একদিকে আবও দুজন ভৃত্য ময়ূবপুচ্ছেব পাখা নিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে ও ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে যায়। তিন-চাবজন লোকব পালকিব সামনে দৌড়তে থাকে, পথেব লোকজন ও জন্তু-জানোযাব হটাতে হটাতে এবং কয়েকজন বাছাই-কবা দুবন্ত অশ্বাবোহী পালকিব পিছনে ছুটতে থাকে।

দিল্লীব পাশেব অঞ্চগুলি খুব উর্বব বলে মনে হয়। নানাবকমেব ফসল উৎপন্ন হয় এইসব অঞ্চলে। চিনি, নীল, চাল, তিন চাব বকমেব ডাল প্রচুর পবিমাণে হয়। দিল্লী শহব থেকে কয়েক মাইল দূবে আর একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে কুতবউদ্দীনেব নামেব সঙ্গে জড়িত। আব একদিকে, কযেক মাইল দূবে সম্রাটেব বাগানবাড়ি, নাম 'শালিমাব'।[৩৬] দিল্লী ও আগ্রাব মধ্যে আব বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ভাল শহব নেই। সমস্ত পথটা একঘেয়ে ও বিবক্তিকব, দেখবাব মতন কোথাও কিছু নেই। কেবল মথুবা শহবটি উল্লেখযোগ্য, কাবণ এই প্রাচীন শহবটিতে অনেক সুন্দব সুন্দব দেবালয়, পান্থশালা ইত্যাদি আছে। এছাড়া আব কিছু নেই। বাস্তাব দুপাশে বড় বড় গাছ সাববন্দী কবে বসানো, পথচাবীব ছায়ার জন্য। সম্রাট জাহাঙ্গীবের আদেশে এই সব গাছ বোপণ করা হয়েছিল। এক ক্রোশ অন্তর একটি কবে উঁচু মিনার, পথেব নির্দেশক বা নিশানারূপে নির্মিত। এগুলিকে 'ক্রোশ-মিনাব' বলা হয়।[৩৭] পথের মধ্যে মধ্যে কুযো আছে, পথিকেব পিপাসা নিবারণেব জন্য এবং গাছ-পালায় জলসেচনেব জন্য।

৩৬। 'শালিমার' উদ্যান সম্রাট সাজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে, ১৬৩২ সালে রচিত হয়। কাত্রু (Catrou) বলেন যে উদ্যানের পরিকল্পনাটি নাকি একজন ভেনীসিয়ান তৈরি করেছিলেন।

৩৭। প্রায় ১৬৮টি এইরকম ক্রোশ মিনারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁর মধ্যে ১০৫টি হল রাজপুতানার। দিল্লীর কাছাকাছি ক্রোশ-মিনার কয়েকটি মেপে দেখা গেছে যে তাদের দূরত্ব প্রায় ২ মাইল ৪ ফার্লং ১৫৮ গজের মতন।

আগ্রার কথা

দিল্লী শহরের যে বর্ণনা করেছি তাই থেকে আগ্রা শহর সম্বন্ধে, অনেকটা ধারণা করতে পারবেন। যমুনার তীরে শহরের অবস্থান সম্বন্ধে, রাজপ্রাসাদ ও দুর্গাদি সম্বন্ধে এবং বড় বড় অট্টালিকা সম্বন্ধে। কিন্তু আগ্রা শহর দিল্লীর চাইতেও প্রাচীন শহর সম্রাট আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তৈরি। সেইজন্য আগ্রার প্রাচীন নাম ছিল আকবরাবাদ। দিল্লীর চাইতে অনেক বড় শহর, আমীর-ওমরাহ রাজা-রাজড়াদের বাড়িঘরও অনেক বেশি। পাকাবাড়ি ইটপাথরের বাড়ির সংখ্যা দিল্লীর চাইতে আগ্রায় বেশি, ক্যারাভান-সরাইয়ের সংখ্যাও বেশি। দুটি বিখ্যাত কীর্তিস্তম্ভের জন্য আগ্রার এত খ্যাতি। আগ্রার রাস্তাঘাট অবশ্য দিল্লীর মতন সুপরিকল্পিত নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র চার-পাঁচটি রাস্তা মোটামুটি সুন্দর ঘরবাড়িও মন্দ নয়। তা ছাড়া বাকি সব রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ ঘিঞ্জি ও আঁকাবাঁকা যে বলা যায় না। দিল্লীর তুলনায় এইদিক দিয়ে আগ্রাকে অনেকটা মফঃস্বল শহরের মতন মনে হয়। আমীর ওমরাহ, রাজা-রাজড়াদের ঘরবাড়ি অনেকটা বাগানবাড়ির মতন উদ্যান পরিবেষ্টিত। তার মধ্যে ধনী হিন্দু বেনিয়ান ও ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলি ঠিক প্রাচীন দুর্গের মত দেখায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে বিচার করলে আগ্রা শহর দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশি মনোরম মনে হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সবুজের সমারোহ যে কত মনোমুগ্ধকর তা বর্ণনা করা যায় না। ফ্রান্সে বা প্যারিসে যে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাব আছে তা নয়।

আগ্রার পাদরী সাহেব

আগ্রা শহরে জেসুইটদের একটি গির্জা আছে। একটি প্রতিষ্ঠানও আছে পৃথক বাড়িতে, তাকে 'কলেজ' বলা হয়। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি খ্রীস্টান পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এখানে খ্রীস্টানধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোথা থেকে কিভাবে এই খ্রীস্টান-পরিবারগুলি এখানে জুটল তা জানি না। এইটুকু জানি যে জেসুইটদের আর্থিক দানের লোভেই তারা এখানে এসেছে এবং তার উপর নির্ভর করেই তারা বসবাস করছে। এই পাদ্রী সাহেবরা আকবর বাদশাহের আমলে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন এখানে। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি ছিল যখন খুব বেশি, তখন সম্রাট আকবর এই ধর্মযাজকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে

এনেছিলেন। সম্রাট আকবর এই পাদ্রীদের একটা বাৎসরিক আয়েরই যে ব্যবস্থা করেছিলেন শুধু তাই নয়, আগ্রায় ও লাহোরে তাঁদের গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। জেসুইট পাদ্রীরা অবশ্য আকবর বাদশাহের পুত্র জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আরও বেশি সহযোগিতা ও সমর্থন পান। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের কাছ থেকে তাঁরা পান প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা। সম্রাট সাজাহান পাদ্রী সাহেবদের ভাতা বন্ধ করে দেন এবং নানাদিক থেকে অত্যাচার করে তাঁদেব নির্মূল কবার চেষ্টা করেন। তিনি লাহোর ও আগ্রাব গির্জাগুলি ধ্বংস করে ফেলেন। আগ্রার একটি বিখ্যাত গির্জাব চুড়ো পর্যন্ত তিনি ধূলিসাৎ কবে দেন। এক সময় এই গির্জার ঘড়িব শব্দ সারা আগ্রা শহবে শোনা যেত।

জাহাঙ্গীরের খ্রীস্টান-প্রীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পাদ্রী সাহেবরা একরকম নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে হিন্দুস্থানে খ্রীস্টানধর্মেব অগ্রগতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে জাহাঙ্গীরের মোটেই ধর্ম-গোঁড়ামি ছিল না এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও কোরানের ধার তিনি বিশেষ ধারতেন না। খ্রীস্টানধর্মের প্রতি তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তাঁব দুজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষা নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, এমন কি মির্জাকেও সম্মতি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি, কারণ তাঁর মতে মির্জা খ্রীস্টান পিতামাতার সন্তান। মির্জার মা ছিলেন আর্মেনিয়ান এবং তাকে হারেমে আনা হয়েছিল সম্রাটের ইচ্ছানুক্রমেই।

জেসুইটরা বলেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের খ্রীস্টান-প্রীতি এত প্রবল ছিল যে তিনি দরবারের সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ইয়োরোপীয় ধরনে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসরও হয়েছিলেন এবং পোশাকও তৈরি করিয়ে ফেলেছিলেন। একদিন ইয়োরোপীয় পোশাকে সেজেগুজে সম্রাট নিজে তাঁর একজন প্রিয়ের ওমরাহকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে নতুন পোশাকে তাঁকে কেমন মানিয়েছে। ওমরাহ তার এমন জবাব দেন যে সম্রাট সেইদিন থেকে ইয়োরোপীয় পোশাকে দরবারে যাবার সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। এত লজ্জা পান তিনি সকলে

ব্যাপারটার জন্য যে শেষ পর্যন্ত ওমরাহদের কাছে বলতে বাধ্য হন যে তিনি এমনি কৌতুক করছিলেন মাত্র।[৩৮]

জেসুইট সাহেবরা এমন কথাও বলেন যে সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি তাঁর মৃত্যুশয্যায় খ্রীস্টানরূপে মরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং সেইজন্য তিনি খ্রীস্টান যাজকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা বা বাণী বাইরে প্রকাশ করা হয়নি। অনেকে বলেন, এ কাহিনীর কোনো ভিত্তি নেই। জাহাঙ্গীর কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি কোনো প্রগাঢ় আস্থা বা শ্রদ্ধা নিয়ে মরেননি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল, কতকটা তাঁর পিতা আকবর বাদশাহের মতন যে তিনি পয়গম্বরের মতন নূতন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করে মরবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আমাকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বলেছিলেন। এই ভদ্রলোকের পিতা ছিলেন জাহাঙ্গীরের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কাহিনীটি এই একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যপানে বিভোর হয়ে কয়েকজন বিচক্ষণ মোল্লা ও একজন খ্রীস্টান পাদ্রী সাহেবকে ডেকে পাঠান। পাদরী সাহেবকে তিনি 'ফাদার আতশ' বলে ডাকতেন। 'আতশ' অর্থে আগুন। পাদ্রী সাহেবের মেজাজ খুব গরম ছিল বলে তিনি তাঁর এই নাম রেখেছিলেন। ফাদার আতশ এসে প্রথমে ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন, মহম্মদের বিরুদ্ধে যা খুশি উক্তি করেন এবং নিজের খ্রীস্টধর্ম ও যীশুখ্রীস্টের স্বপক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলেন। সম্রাট

৩৮। এই কাহিনীর অন্যরকম বিবরণ দিয়েছেন কাফ্রে (Cat. III)। তিনি লিখেছেন জাহাঙ্গীর কোরানের বিধিনিষেধে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে পানাহারের ব্যাপারে। আহারের মধ্যে কয়েকটি জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা কোরানে নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধে ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট একদিন জিজ্ঞাসা করেন: 'এমন কোন ধর্ম আছে দুনিয়ায় যাতে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই?' সকলে বলেন যে খ্রীস্টান ধর্মে এ রকম কোনো নিষেধ নেই। সম্রাট বলেন 'তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের খ্রীস্টান হওয়া উচিত। এই কথা বলে সম্রাট দরজীদের ডাকেন ও হুকুম দিলেন এবং বললেন যে, এখনই আমাদের যাবতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ খ্রীস্টান পোশাকে রূপান্তরিত করা হোক। মোল্লা মৌলবীরা সম্রাটের কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভয়ে তাঁরা দিশাহারা হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কি করা যায় কিছুই ভেবে পেলেন না। অবশেষে তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন যে, কোরান-শরীফের বিধিনিষেধ সম্রাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সবসময়। সম্রাট কোনো অন্যায় করতে পারেন না আল্লার কাছে। অতএব সম্রাটের পানাহারের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

জাহাঙ্গীর আদ্যোপান্ত শুনে সিদ্ধান্ত করেন যে, ধর্ম নিয়ে পাদরী ও মোল্লার এই বাক্‌যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। তিনি হুকুম দিলেন 'একটা গর্ত খোঁড়া হোক মাটিতে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। ফাদার আতশ তার বাইবেল হাতে করে, এবং মোল্লা তাঁর কোরান হাতে করে সেই আগুনের কুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিন। আগুন যাঁকে দগ্ধ করতে পারবে না, আমি তাঁর ধর্মে দীক্ষা নেব।' সম্রাটের অগ্নি-পরীক্ষার আহ্বানে ফাদার আতশ সন্তুষ্টচিত্তে রাজী হলেন, কিন্তু মোল্লা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তখন সম্রাট উভয়েরই অবস্থা দেখে করুণার হাসি হেসে তাঁদের মুক্তি দিলেন।[৩৯]

কাহিনীটি যাই হোক, সত্য বা মিথ্যা, তাতে কিছু যায়-আসে না। একথা ঠিক যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জেসুইটদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল দরবারে এবং সম্রাটও তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। সুতরাং পাদরী সাহেবরা যদি মনে করে থাকেন যে হিন্দুস্থানে খ্রীস্টান ধর্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হিন্দুস্থানে যেসব ঘটনা ঘটেছে (দারার সঙ্গে পাদরী বুসের সম্পর্কের ঘটনা ছাড়া) তাতে মনে হয় না যে খ্রীস্টানধর্মের এরকম সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কোনো সার্থকতা আছে। যাই হোক, পাদরী সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গত বলে ফেলেছি। যখন বলে ফেলেছি তখন এ সম্বন্ধে আরও দু চারটে দরকারী কথা এখানে আমি বলতে চাই।

খ্রীস্টান ও ইসলামধর্ম

ধর্মপ্রচারের এই পরিকল্পনা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। যে পাদরী সাহেবরা ধর্মপ্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁরা যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য, তাও স্বীকার করি। বিশেষ করে কাপুচিন ও জেসুইটরা এত শান্ত ও সংযত-

৩৯। কাত্রু বলেন যে ফাদার আতাশের আসল নাম নাকি ফাদার জোসেফ দ্য কস্তা। তিনি নাকি সম্রাটের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে রাজী হয়েছিলেন। ফাদার দ্য কস্তা বলেছিলেন 'আগুন জ্বালানো হোক এবং আগুনের মধ্যে ইসলাম-ধর্মের ধারক ও বাহক মোল্লা কোরান হাতে করে ঝাঁপ দিন, আর খ্রীস্টান ধর্মের প্রতিভূরূপে আমি বাইবেল হাতে করে ঝাঁপ দিই। তারপর দেখা যাক ঈশ্বর কার পক্ষে রায় দেন এবং যীশু ও মহম্মদের মধ্যে কে বড় বলে ঘোষণা করেন।' ফাদারের কথা শুনে সম্রাট মোল্লার দিকে ফিরে চাইলেন। চেয়ে দেখলেন মোল্লা ভয়ে কাঁপছেন। তখন সম্রাটের করুণা হল এবং পরীক্ষার দরকার নেই বললেন। সেইদিন থেকে ফাদার জোসেফকে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'ফাদার আতশ' বা 'ফাদার আগুন' বলে ডাকতেন।

ভাবে ধর্মকথা বলেন যে, তাঁদের শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। তাঁদের বক্তৃতাদির মধ্যে বিদ্বেষের কোনো ঝাঁজ নেই। ক্যাথলিক, গ্রীক, আর্মেনিয়ান, নেস্টরিয়ান, জেকোবিন প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের খ্রীস্টানদের প্রতি এই যাজকদের মনোভাব অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তাঁরা সত্যই পীড়িত ও ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে পারেন ধর্মের বাণী শুনিয়ে এবং তাঁদের নিজের বিদ্যা ও চারিত্রিক গুণের জোরে তাঁরা অজ্ঞ ম্লেচ্ছদের নানারকম কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কথা স্মরণ করাতে পারেন। কিন্তু সকলের চরিত্র যে এরকম প্রশংসনীয় এবং পাদ্রী সাহেব মাত্রই যে শ্রদ্ধার যোগ্য তা নয়। অনেকের স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং যাজক-সম্প্রদায়ের উচিত তাঁদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ধর্মপ্রচারকের ছাপ মেরে তাঁদের বাইরে পাঠানো কোনোমতেই উচিত নয়। খ্রীস্টানধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তাঁরা কোনোরকম সাহায্য তো করেনই না, উপরন্তু ধর্মকে কলঙ্কিত করেন। অবশ্য সকলেই যে এরকম অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তা আমি বলছি না। যাজকতার বিরোধীও আমি নই। বরং আমি তার সমর্থক। ধর্মপ্রচারকের প্রয়োজন আছে, আমি স্বীকার করি। পৃথিবীর সর্বত্র যে ধর্মপ্রচারক পাঠানো দরকার খ্রীস্টানধর্মের প্রসারের জন্য, তাও আমি স্বীকার করি। অবশ্য খ্রীস্ট ও তাঁর ভক্তদের যুগ কেটে গেছে অনেকদিন। এখন সেই সরল বিশ্বাসের যুগ আর নেই। একথাও মনে রাখা দরকার। তখন ধর্মপ্রচার করা ও মানুষকে ধর্মে দীক্ষিত করা যতটা সহজ ছিল, এখন আর ততটা সহজ নয়। আধুনিক যুগে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘকাল ধরে আমি ম্লেচ্ছদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে জড়িত, কিন্তু তবু তাদের প্রতি আমার সেরকম কোনো আস্থা নেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুসলমানধর্মীদের সম্পর্কে আমার কোনো আশাভরসা বিশেষ নেই। প্রাচ্যাঞ্চলের নানাস্থানে আমি ঘুরেছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি যে, হিন্দুদের যদিও বা ধর্মান্তরিত করা সম্ভবপর দু-চারজনকে, মুসলমানদের করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দশ বছরের মধ্যে যদি একজন মুসলমানকে খ্রীস্টান করা সম্ভব হয়, তাহলে জানবেন যথেষ্ট হয়েছে। মুসলমানরা যে খ্রীস্টানদের বা খ্রীস্টানধর্মকে শ্রদ্ধা করে না তা নয়। যীশুখ্রীস্টের নাম তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। তারা যীশুর দেবত্বও অবিশ্বাস করে না। কি তাহলেও একথা কল্পনাও করবেন না যে তারা তাদের নিজেদের ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টানধর্ম বা অন্য কোনো ধর্ম কোনোদিন গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। প্রাণ থাকতে করবে না। তবু খ্রীস্টানধর্ম-প্রচারকদের

সর্বপ্রকার সাহায্য করা উচিত। মহান কাজে তাদের উৎসাহিত করাও উচিত। প্রধানত ইয়োরোপীয়ানদেরই উচিত এই সব প্রচারকদের ব্যয়ভার বহন করা। অন্যদেশের জনসাধারণের স্কন্ধে সে ভার চাপানো উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে প্রচারকদের অর্থসাহায্য করা উচিত এবং অর্থের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করা ঠিক নয়, কারণ অর্থাভাবেও অনেক সময় পাদরীরা হীন কাজ করতে বাধ্য হন। সুতরাং প্রত্যেক খ্রীস্টান রাষ্ট্রের কর্তব্য, ধর্মপ্রচারকদের মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করা।

মুসলমান বা ইসলামধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি না, সাধারণ মুসলমানদের উপর ইসলামধর্মের প্রভাব কতখানি। ধর্মের প্রতি মুসলমানদের গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্মত্ততা যে কত তীব্র তা বাস্তবিকই খ্রীস্টানদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত। কারণ খ্রীস্টানধর্মে অন্ধ উন্মত্ততার বিশেষ কোনো স্থান নেই বা প্রকাশের সুযোগ নেই। আমার নিজের ধারণা—মুসলমানধর্মের ভিত্তি মারাত্মক ও ভয়াবহ। অস্ত্রবলের জোরে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেমন, তেমনি সেই অস্ত্রের জোরেই তার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। সহনশীলতা বা উদারতার কোনো স্থান নেই তার মধ্যে। খ্রীস্টানদের উচিত কৌশলে মুসলমানদের ধর্মগোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করা। চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত দেখে আমরা শিখতে পারি এবং জাহাঙ্গীরের জীবন থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। পাদ্‌রী সাহেবদের আরও একটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। গির্জার মধ্যে দেবতার বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে খ্রীস্টানরা যে লঘুচিত্ততার পরিচয় দেন, তা নিন্দনীয়। মসজিদে আল্লার কাছে প্রার্থনা করার সময় মুসলমানরা একটি বারও ঘাড় পর্যন্ত বেঁকায় না। তাদের একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা বাস্তবিকই অনুকরণযোগ্য।

ডাচ্ বণিকদের কথা

ডাচদের একটি কুঠি আছে আগ্রায়। প্রায় চার-পাঁচজন লোক থাকে কুঠিতে। আগে ডাচ্ বণিকরা আগ্রা শহরে কাপড়, ছোট বড় আয়না, নানা-রকমের সোনা-রুপোর কাজ-করা ফিতা, লোহা-লক্কড় ইত্যাদির ব্যবসা করত। তাছাড়া আগ্রার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে তারা নীল কিনত এবং সেই নীলের ব্যবসা করত। কাপড়ের ব্যবসাতেও তাদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। জালালপুর ও লক্ষ্ণৌ শহর থেকে তারা কাপড় কিনত। প্রতি বছর তারা লক্ষ্ণৌতে কয়েকজন

ফ্যাক্টর বা কর্মচারী পাঠাত কাপড় কেনা-কাটার জন্য। এখন মনে হয় এই ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের অবস্থা তেমন ভাল নয়। আর্মেনিয়ান বণিকদের প্রতিযোগিতার জন্য এবং আগ্রা থেকে সুরাটের দূরত্বের জন্য ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিয়েছে। পথে ক্যারাভানের নানারকম দুর্গতি ঘটে এবং বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্গম রাস্তা ও পাহাড়-পর্বত এড়িয়ে যাবার জন্য তারা গোয়ালিয়র থেকে বুরহানপুরের সোজা পথ ধরে যায় না। তার বদলে আমেদাবাদ দিয়ে ঘুরে বিভিন্ন রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হত। তবে যত অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি থাকুক না কেন আমার মনে হয় না যে ডাচ্ বণিকরা ইংরেজ কুঠিয়ালদের মতন আগ্রার কুঠি ছেড়ে চলে যাবে। এখনও ডাচরা ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা পায় এবং দরবার সংশ্লিষ্ট লোকজনদের অনুনয়-বিনয় করে, বাংলাদেশে, পাটনা, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাদের বাণিজ্যকুঠি পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে নেয়। প্রাদেশিক শাসকদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রতিকার করারও অসুবিধা হয় তাদের।

আগ্রার তাজমহল

এইবার আগ্রার দুটি প্রধান কীর্তিস্তম্ভের কথা উল্লেখ করে 'দিল্লী ও আগ্রা' সম্বন্ধে এই চিঠি শেষ করব। আগ্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এই স্তম্ভ দুটি। একটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরি আকবর বাদশাহের স্মৃতিস্তম্ভ। আর একটি সম্রাট সাজাহানের তৈরি বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ 'তাজমহল'। আকবর বাদশাহের সমাধি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলব না, কারণ তার যা সৌন্দর্য তা তাজমহলের মধ্যে আরও চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।*

তাজমহল বাস্তবিকই বিস্ময়কর কীর্তি। হয়ত বলবেন যে আমার রুচি অনেকটা ভারতীয় ধরনের হয়ে গেছে, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকার জন্য। কিন্তু তা নয়, আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে মিশরীয় পিরামিড আগ্রার

---

* তাজমহলের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ের, প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী। তার সম্পূর্ণ অনুবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে, কারণ 'তাজমহলের'র রূপবর্ণনা এদেশের পাঠকরা অনেক পড়েছেন। তাই চিঠির এই অংশটুকু থেকে বার্নিয়েরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের (তাজমহল সম্বন্ধে) অনুবাদ করে বাকি অংশটুকু বাদ দিয়েছি।—অনুবাদক

তাজমহলের তুলনায় এমন কিছু আশ্চর্য কীর্তির নিদর্শন নয়। মিশরের পিরামিডের কথা অনেক শুনেছি এবং দু-দুবার নিজে চোখে দেখেও যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ পাইনি, একথা স্বীকার করতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। নিরাকার পাথরের স্তূপ ছাড়া মিশরীয় পিরামিড আমার কাছে আর কিছু মনে হয়নি। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটা কিমাকার কিছু গড়ে তুললেই বিস্ময়কর কীর্তি হয় না। তার মধ্যে মানুষের কল্পনা বা কারিগরির নিদর্শন কিছু নেই, কিন্তু আগ্রার তাজমহলের মধ্যে তা আছে।

হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কথা

[ফ্রান্সের একজন দরিদ্র কবি জাঁ শাপলাকে একখানি পত্রে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন। নিজের চোখে যা তিনি দেখেছিলেন এবং নিজের কানে যা শুনেছিলেন, তাই তিনি লিখেছিলেন বলে তার মূল্য আছে, বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে।—অনুবাদক]

ফরাসী ও ভারতীয় সূর্যগ্রহণ

জীবনে আমি দুটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি, যা কোনোদিন ভুলতে পারব বলে মনে হয় না। তার মধ্যে একটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি ফ্রান্সে ১৬৫৪ সালে, আর একটি দেখেছি দিল্লীতে ১৬৬৬ সালে। প্রথম গ্রহণের সময় ফরাসী জনসাধারণের এমন সব যুক্তিহীন ও অর্থহীন আচরণ স্বচক্ষে দেখেছি, যা আমার মনে গেঁথে রয়েছে চিরদিনের মতন। এমন ভয়াবহভাবে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো তারা যে অনেকে গ্রহণ লাগার আগে ঔষধপত্র কিনে খেতে লাগলো আত্মরক্ষার জন্য। অনেকে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল সারাদিন বন্দী হয়ে এমনভাবে তারা চারিদিক বন্ধ করে বসে ছিল যাতে আলোর রশ্মি পর্যন্ত ঘরে না প্রবেশ করতে পারে। অন্ধকার কুঠরি খুঁজে তার মধ্যে ঢুকে বসে রইল অনেকে। দলে দলে হাজার হাজার লোক চলল গির্জার দিকে দেবতার কাছে প্রার্থনা করার জন্য। কেউ কেউ উদভ্রান্ত হয়ে গেল আসন্ন বিপদের আশঙ্কায়—কি জানি কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে। অনেকে ভাবল পৃথিবীর ও মানুষের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে, গ্রহণ লাগলে পৃথিবীর ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠে হয়ত সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধরনের আজগুবী সব ধারণা ও বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশবাসীর। গ্যাসেণ্ডী, রোবারভাল ও অন্যান্য বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও গ্রহণ সম্পর্কে লোকের আতঙ্ক ও ভুল ধারণার সীমা ছিল না। বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছেন, গ্রহণ লাগলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, কারও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের ভয় গেল না। কিছু মতলববাজ গণৎকার ও জ্যোতিষীর অপপ্রচার ও মিথ্যা কল্পনার ফলে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের বদ্ধমূল রইল।

১৬৬৬ সালে হিন্দুস্থানে দিল্লী শহর থেকে যে সূর্যগ্রহণ আমি দেখেছি তাব কথাও আমার বিশেষভাবে মনে আছে। গ্রহণ সম্পর্কে ঐ একই হাস্যকর ধারণা ও কুসংস্কার ভারতীয়দেরও আছে দেখলাম। যে সময় গ্রহণ লাগবাব কথা, সেই সময় আমি আমার বাড়ির উপরেব একটি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যমুনার তীবেই আমাব বাড়ি ছিল, সুতরাং সমস্ত দৃশ্যটি দেখবারও আমার সুযোগ হয়েছিল। দেখলাম যমুনাব তীবে অসংখ্য লোকের ভিড় জমেছে। এককোমর জলে নেমে দাঁড়িযে আছে তারা উর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে, করজোড়ে, সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায যখন গ্রহণ লাগবে। গ্রহণ লাগলেই তাবা জলে ডুব দিযে স্নান করবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েবা সকলেই প্রায উলঙ্গ; পুরুষদের অধিকাংশের পরনে গামছা; বিবাহিতা ও ছয-সাত বছবের মেয়েদের পরনে শাড়ি। বড় বড় রাজা মহারাজা ও ধনী লোকেবা, ব্যবসাযী, ব্যাঙ্কার ও জুয়েলারবা সপরিবারে যমুনার তীরে এসে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। যমুনার জলে চারিদিকে পর্দা টাঙিযে জনতার চক্ষুব অন্তরালে তাদের পরিবার-বর্গের স্নানের ব্যবস্থা হযেছে। যে মুহূর্তে গ্রহণ লাগাব সংবাদ রটল, অমনি যমুনার বক্ষ থেকে হাজার হাজার কণ্ঠেব একটা সম্মিলিত ধ্বনি উঠলো এবং সকলে জলে ডুব দিতে লাগলো বার বার। ডুব দিয়ে তাবা জলে দাঁড়িয়ে, হাতজোড় করে সূর্যেব দিকে চেয়ে বিড়-বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করল এবং মধ্যে মধ্যে জলে হাত ডুবিয়ে সূর্যের দিকে জল ছিটাতে লাগলো। কখনও মাথা হেঁট করে, কখনও হাত নেড়ে তারা কতরকম যে ভঙ্গী করতে আরম্ভ করল, তার ঠিক নেই। গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা এইভাবে অনবরত ডুব দিতে আর মন্ত্র পড়তে রইল। স্নান করে উঠে এসে যমুনার জলে টাকা-পয়সা ছুঁড়তে লাগল এবং দান করতে লাগলো ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণরাও বেশ বুদ্ধিমান, দিনক্ষণ বুঝে দানেব লোভে অনেকে এসে হাজির হয়েছিল সেখানে। স্নানান্তে সকলেই নতুন কাপড় পরে পুরনো কাপড় ছেড়ে ফেলে দিল।

এইভাবে আমাব ঘরের বারান্দা থেকে চোখের সামনে আমি যমুনার উপর গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। শুধু যমুনায় নয়, সিন্ধু থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এবং অন্যান্য নদনদীতে এইভাবে সমারোহে গ্রহণপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। থানেশ্বরের নদীতে প্রায় দেড়লক্ষ লোক জমা হয়েছিল গ্রহণের স্নান করার জন্য। তাদের ধারণা, গ্রহণের দিন নদীর জল অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র হয় এবং তাতে স্নান করলে পুণ্যসঞ্চয়ও হয় বেশি।

মোগল বাদশাহ, মুসলমান হলেও, হিন্দুদের এইসব ধর্মকর্মে, আহার-অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতেন না কখনও। কেবল এইজাতীয় কোনো সামাজিক পার্বণের সময় বা উৎসব-অনুষ্ঠানের সময়, ব্রাহ্মণরা দেখেছি প্রায় লাখখানেক টাকা নজর দেন বাদশাহকে, এবং বাদশাহ তার পরিবর্তে তাঁদের একটা হাতি আর কয়েকটা ভেস্ট খেলাৎ দেন।

সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কেন হিন্দুস্থানের এই ধারণা এবং কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন, সেই কথা এইবার বলব।

হিন্দুরা বলেন তাঁদের চারিটি 'বেদ' আছে— পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ব্রাহ্মণের মাধ্যমে ভগবান এই বেদ প্রচার করেছেন জগতে। বেদে কথিত আছে নাকি যে, কোনো এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ দানবীয় দেবতা সূর্যের উপর ভর করে তার জ্যোতি ম্লান করে দেয় এবং তার জন্যই সূর্যগ্রহণ হয়। দানব গ্রাস করে ফেলে সূর্য দেবতাকে। সূর্য মঙ্গলময়, করুণাময় দেবতা। তিনি জীবন দান করেন। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদিত অবস্থায় যখন সূর্যদেব যন্ত্রণা ভোগ করেন তখন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাঁকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া। প্রার্থনা করে পূজার্চনা করে, দানধ্যান করেই একমাত্র তা করা সম্ভবপর। সূর্যগ্রহণের সময় এইজন্য এইসব কাজের গুরুত্ব বেশি এবং কাজ করলে পুণ্যার্জনও করা যায় বেশি। গ্রহণের সময় দান করলে যা পুণ্য হয়, অন্য সময় তার একশভাগের একভাগও হয় না। এত যখন লাভ হয় তখন কে তার সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়বে বলুন?*

মোটামুটি এই হল হিন্দুস্থানের সূর্যগ্রহণ। এই গ্রহণ কি কখনও ভুলতে পারা যায়? লোকের এই কল্পনা, ধারণা ও বিচিত্র বিশ্বাস সম্বন্ধে আমি আর কিছু মন্তব্য করতে অক্ষম। বাকিটা আপনি ভেবে নেবেন।

পুরীর জগন্নাথ

বঙ্গোপসাগরের কূলে জগন্নাথ দেবতার নামে একটি শহর আছে। জগন্নাথের মন্দিরও আছে সেখানে, বিখ্যাত মন্দির। প্রত্যেক বছর জগন্নাথের যে বিরাট উৎসব হয়, তা প্রায় আট-নয় দিন ধরে চলতে থাকে। উৎসবের সময় হিন্দুস্থানের সমস্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়, আগে যেমন হনুমানের মন্দিরে

* বলা বাহুল্য, বার্নিয়েরের মতন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা এর চেয়ে সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম, দেবতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ভুল হলেও, প্রণিধানযোগ্য। —অনুবাদক।

হত এবং এখন যেমন হয় মক্কায়। শুনেছি, সমাগত লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বিশাল একটি কাঠের রথ (বার্নিয়ের 'কাষ্ঠযন্ত্র' বলেছেন) তৈরি করা হয় এবং তাতে নানারকমের সব কিম্ভুতকিমাকার জীব ও মূর্তি বসানো থাকে—যেমন ভয়ংকর তেমনি কদর্য। চোদ্দটি বা ষোলটি চাকার উপর রথটিকে বসানো হয়, যেমন কামানগাড়ির উপর কামান বসানো হয় তেমনি। বসিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সেটা টানতে থাকে। জগন্নাথের মূর্তিটি মধ্যিখানে বসানো হয় রীতিমত সাজিয়ে গুজিয়ে এবং তাকে টানতে টানতে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

উৎসবের প্রথম দিনে যেদিন মন্দিরে জগন্নাথের দর্শনের জন্য দরজা খোলা হয় সেদিন যাত্রীদের এমন প্রচণ্ড ভিড় হয় যে ভিড়ের চাপে যাত্রীদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং অনেকের মৃত্যু হয়। বহু দূর থেকে যাত্রীরা জগন্নাথ দর্শনের জন্য পায়ে হেঁটে আসে এবং পথের ক্লান্তিতে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং ভিড়ের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না তাদের। যাদের মৃত্যু হয়, হাজার হাজার যাত্রীর কাছে তারা সবচেয়ে বেশি পুণ্যাত্মা হয়ে ওঠে এবং সকলেই তাদের সশরীরে স্বর্গযাত্রার জন্য 'ধন্য ধন্য' করে। অতঃপর যখন সেই জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর করে চলতে থাকে তখন সমবেত দর্শক-যাত্রীদের মধ্যে এমন এক বিকট বন্য উদ্দামতার সঞ্চার হয় যে তার তাড়নায় অনেকে সেই চলন্ত রথের চাকার তলায় পথের উপর শুয়ে পড়ে এবং নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যু বরণ করে। দর্শকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সকলেই উচ্চকণ্ঠে বাহবা ধ্বনি দিতে থাকে। এর চেয়ে মহত্তর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন আর কিছু নেই, তাদের মতন আত্মত্যাগী বীরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এইভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারলে তারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলে যাবে এবং সেখানে দেবতা তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন ও পালন করবেন। সংসারের দুঃখ বা জ্বালা-যন্ত্রণা বলে কিছু থাকবে না। মহাসুখে তারা স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে।

সাধরণ মানুষের মধ্যে এইসব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্য প্রধানত হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণরাই দায়ী। নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যই ব্রাহ্মণরা এই জাতীয় ধর্মকর্ম ও কুসংস্কারের প্রেরণা দিয়ে থাকেন। রথের সময় দেখেছি একটি সুন্দরী মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে জগন্নাথের 'কনে' বলে পরিচয় দেওয়া হয় এবং জগন্নাথের পাশে বসিয়ে মহাসমারোহে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য মন্দিরে। সেখানে মেয়েটি জগন্নাথের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস,

জগন্নাথ ঠাকুর মেয়েটিকে ভার্যার মতন মনে করবেন এবং সেইভাবে তার সঙ্গে ব্যবহারও করবেন। মেয়েটিকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, যেমন এ-বছর কেমন যাবে, মঙ্গল হবে কি না ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তরের জন্য মুক্তহস্তে দানধ্যান করা হয় মানত করা হয়। তার পরদিন রথ যখন ফিরে যায়, তখন পুরোহিত তাকে রাত্রে কানে-কানে যা বলে দেয়, সেই সব কথা সে সাক্ষাৎ জগন্নাথের উক্তি মনে করে দর্শকদের চেঁচিয়ে বলতে থাকে। দর্শকরাও মেয়েটির প্রত্যেকটি মুখের কথা বিশ্বাস করে।

জগন্নাথের রথের সামনে ও মন্দির-প্রাঙ্গণে বারাঙ্গনারা নানারকম দৃষ্টিকুট ভঙ্গী করে নৃত্য করতে থাকে (বার্নিয়ের 'দেবদাসী' নৃত্যের কথা বলেছেন)। কেউ কোনো আপত্তি করে না। এরকম অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি জগন্নাথধামে। 'বারাঙ্গনা' বলতে যা বোঝায়, তারা ঠিক তা নয়। হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক বা খ্রীস্টানই হোক, কাউকেই তারা সংস্পর্শে আসতে দেয় না, এবং কারও কাছ থেকে তারা কোনো টাকা-পয়সা বা উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করে না। তারা মনে করে দেবতার উদ্দেশে তাদের জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা পুণ্যাত্মা সাধু ছাড়া তাদের ছায়া মাড়াবার পর্যন্ত অধিকার নেই কারও। ভাল কথা, সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা তো বলাই হল না। মন্দিরের সীমানার মধ্যে চারিদিকে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। সকলেই প্রায় নগ্ন অবস্থায় বসে থাকে, মাথায় বড় বড় জটা, মুখে দাড়ি, গায়ে ভস্ম মাখা।

সতীদাহ ও সহমরণ

সতীদাহ ও সহমরণ-প্রথা সম্বন্ধে অনেক পর্যটক অনেক কথা বলেছেন। নতুন কথা কিছু বলবার নেই। অনেকে অবশ্য সতীদাহের যথেষ্ট অতিরঞ্জিত বিবরণও দিয়েছেন। ক্রমেই সতীদাহের সংখ্যা কমে আসছে মনে হয়। এবং আগের তুলনায় এখন অনেক কমে গেছে। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান বাদশাহরা নানাভাবে হিন্দুদের সহমরণপ্রথা নিবারণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনও কোনোদিন তাঁরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেননি এবং প্রত্যক্ষভাবে বিধিনিষেধ জারী করে সতীদাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। নানারকম কৌশলে তাঁরা এই অমানুষিক দাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাদেশিক গবর্ণর বা সুবাদারের অনুমতি ছাড়া কেউ সহমরণ বরণ করতে পারবেন না বলে তাঁরা এক

আদেশ জারী করে দিয়েছিলেন। সহমরণের জন্য সুবাদারের অনুমতি নিতে হবে এবং তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে। আবেদন করলে সুবাদার সহজে অনুমতি দিতেন না, নানাভাবে চেষ্টা করতেন আবেদনকারীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাঁচাবার জন্য। নানারকম যুক্তি দিয়ে আশার কথা বলে সুবাদার নিজে যখন ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি সহমরণপ্রার্থিনীকে অন্দরমহলে মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সুবাদারের পরিবারের মহিলারা তাঁকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। সমস্ত ব্যর্থ হলে এবং বাইরে থেকে কোনো প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে না বলে সুবাদারের বিশ্বাস হলে, তবে তিনি সহমরণের অনুমতি দিতেন। এত চেষ্টা সত্ত্বেও সহমৃতার সংখ্যা হিন্দুস্থানে খুব বেশি বলা চলে। বিশেষ করে প্রায়-স্বাধীন হিন্দু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। মুসলমান শাসকরা এইসব রাজ্যের মধ্যে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। হিন্দুরাজারা সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যে অবাধে সতীদাহ চলতে থাকে। যতগুলি সতীদাহ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার বিস্তৃত বিবরণ আমি এখানে দেব না। কেবল দু-তিনটে ঘটনার কথা উল্লেখ করব। প্রত্যেকটি সহমরণের সময় আমি নিজে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে দেখেছি। প্রথম এমন একটি সতীদাহের বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করব, যার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত ছিলাম। অর্থাৎ সহমরণপ্রার্থিনীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিবৃত্ত করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি কৃতকার্য হয়েছিলাম।

আগা দানেশমন্দ খাঁর একজন অন্যতম কেরানী ছিলেন, নাম বেণীদাস। বেণীদাস আমারও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রায় দু'বছর ধরে কঠিন অসুখে ভুগে তিনি মারা গেলেন। আমি তাঁর চিকিৎসা করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী স্থির করলেন স্বামীর সহমৃতা হবেন। আগার কাছে বেণীদাসের আরও অনেক বন্ধুবান্ধব চাকরি করতেন। আগা খাঁ তাঁদের বললেন যে, কোনোরকমে বেণীদাসের বিধবা পত্নীকে বুঝিয়ে সহমরণের সঙ্কল্প যাতে তিনি ত্যাগ করেন সেই চেষ্টা করতে। বেণীদাসের বন্ধুবান্ধবরা আগার কথায় উৎসাহিত হয়ে চেষ্টা করলেন যথেষ্ট বেণীদাস পত্নীকে বোঝাতে। তাঁরা বললেন যে, সহমরণের সঙ্কল্প যে তিনি গ্রহণ করেছেন সেটা খুবই সাধু সঙ্কল্প। পুণ্যাত্মা আদর্শ স্ত্রী ছাড়া এরকম সঙ্কল্প অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারেন না। এতে তাঁর কুলগৌরব যে বাড়বে এবং তিনি নিজে দেবীর মত পূজিত হবেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

তবু তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন কয়েকটা কথা ভেবে দেখতে তিনি কয়েকটি সন্তানের জননী এবং তারা প্রায় সকলেই বয়সে শিশু, তাদের দেখবে কে? কে তাদেব প্রতিপালন করবে? মায়ের চেয়ে বেশি কে তাদের স্নেহ করবে. পিতার অবর্তমানে? তাদের এরকম অনাথ ও অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়া উচিত কি? তাবা তো কোনো অপরাধ করেনি। কিছুই জানে না তাবা, ধর্ম কি, পুণ্য কি? অন্তত তাদের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর উচিত, সহমরণের সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করা। পতিপ্রেমেব চেয়ে অসহায় সন্তানদের কল্যাণচিন্তা তাঁর কাছে এখন বড় হওয়া উচিত।

এত অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি, যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও কিছু ফল হল না। বেণীদাসপত্নী সহমরণের সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন। অবশেষে শেষ চেষ্টা করার জন্য খাঁ সাহেব আমার শরণাপন্ন হলেন এবং আমাকে ডেকে বললেন: 'বার্নিয়েব সাহেব! আপনি তো বেণীদাস কেরানীবাবুর একজন পুরাতন বন্ধু। চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন তাঁব পরিবারের সকলের সঙ্গে আপনি পরিচিত। আপনি একবাব শেষ চেষ্টা কবে দেখুন কেরানীবাবুর স্ত্রীকে বাঁচানো যায় কি না।' আমি রাজী হলাম এবং কেবানীবাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম। বাড়ি গিয়ে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। মৃত বেণীদাসকে ঘিরে সাত-আট-জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও চার-পাঁচ জন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। সকলে মধ্যে মধ্যে প্রাণপণ চীৎকাব করে উঠছেন, একটা বীভৎস আর্তনাদের মতন, এবং সজোরে হাত চাপড়াচ্ছেন। মনে হল যেন নরকে ভূতপ্রেতের রাজ্যে ঢুকেছি। মৃতস্বামীর পায়ের কাছে বিধবা পত্নী বসে আছেন, চুল আলুথালু, মুখ শুকনো। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, আগুনের মত দপদপ করে জ্বলছে যেন। ব্রাহ্মণরা যখন আর্তনাদ করে উঠছেন বিকটভাবে, তখন তিনিও তাঁদের সঙ্গে চীৎকার করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে তাল দিয়ে হাত চাপড়াচ্ছেন। হল্লা, চীৎকাব ও চাপড়ানি যখন খানিকটা শান্ত হল, তখন আমি হতভম্বের মতন তাঁদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কেরানীবাবুর স্ত্রীকে ডেকে বললাম: 'আগা খাঁ নিজে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন আপনাকে জানাতে যে তিনি আপনার দুই পুত্রের জন্য দুই ক্রাউন করে মাসিক ভাতা দেবার বন্দোবস্ত করবেন, যদি আপনি সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। আপনি জানেন, আপনার ছেলেদের মানুষ করার জন্য, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আপনার বেঁচে থাকা কত প্রয়োজন। আমরা ইচ্ছা করলে জোর করে যে আপনার সহমরণ বন্ধ করতে

পারি না তা নয়, স্বচ্ছন্দেই পারব। শুধু তাই নয়, যেসব পাষণ্ড মতলববাজ আপনাকে এইভাবে সহমরণের জন্য প্ররোচিত করছে, তাদেরও কিভাবে শাস্তি দিতে হয়, তাও আমরা জানি। তা আমরা করতে চাই না। আপনার সুবুদ্ধির কাছেই আমরা আবেদন করতে চাই। আপনার আত্মীয়স্বজন সকলেই চান যে অন্তত সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে আপনি বেঁচে থাকুন। আপনি সন্তানের জননী, সুতরাং নিঃসন্তান তরুণী বিধবাদের বেঁচে থেকে যেরকম লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপবাদ সহ্য করতে হয় আপনাকে তা করতে হবে না।' এই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি কতবার বললাম, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ থেকে কোনো উত্তর শুনলাম না। মুখ বুজে তিনি সব শুনলেন। অবশেষে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন 'আমাকে যদি সহমরণে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব।' আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম মনে হয় আপনার সঙ্গে কোনো প্রেতাত্মা বা অপদেবতা ভর করেছে তা না হলে এরকম কথা মা হয়ে আপনি কি করে বলতে পারেন কল্পনা করা যায় না। বেশ, তাই হোক তাহলে। কিন্তু তার আগে আপনার ছেলেদের কাছে ডাকুন এবং নিজের হাতে তাদের গলা কেটে আপনার স্বামীর চিতায় সমর্পণ করে দিন। এ কাজ আপনাকে করতেই হবে। যদি না করেন, তা হলে তা। অনাহারে তিলে তিলে মরবে এবং এখনই আমি খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে তাদের ভাতা নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা করব।' অত্যন্ত সংযত ও সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো আমি বলে ফেললাম। বেণীপত্নীর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, কিছুটা কাজ হয়েছে কথায়। একটি কথাও আর তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে রইলেন। দেখলাম, ঘরের বৃদ্ধরা ও ব্রাহ্মণরা একে-একে চম্পট দিলেন ঘর থেকে। মুখের উপর তাঁদের ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব খুব স্পষ্ট। যাই হোক, আমি তারপর তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে রেখে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, ঘোড়ায় চড়ে ঘরমুখো রওয়ানা হলাম। সন্ধ্যার সময় যখন খাঁ সাহেবের কাছে আমার প্রচেষ্টার ফলাফল জানাবার জন্য যাচ্ছি তখন পথে বেণীদাসের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন যে বেণীপত্নী সহমরণের সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। নিশ্চিন্ত হলাম শুনে।

মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে এত স্ত্রীলোককে দেখেছি যে সহমরণ সম্বন্ধে আমার মনে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সতীদাহের বীভৎস দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার মতন শক্তিও আর নেই আমার, এমন কি তার

বিবরণ দেবারও ইচ্ছা নেই। তবু চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব সঠিক বিবরণ দিতে। যা স্বচক্ষে দেখেছি তাই বলব। এই ধরনের ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্যের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া যে কত কষ্টকর, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। লিখিত বিবরণ পাঠ করে, সহমরণ বা সতীদাহ সম্বন্ধে মনে মনে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমেদাবাদ থেকে আগ্রা যাবার সময় অনেক দেশীয় নৃপতির রাজ্য অতিক্রম করে যেতে হয়। পথে একটি বাগানের মধ্যে আমাদের ক্যারাভান যখন বিশ্রামের জন্য থামল, তখন আমরা খবর পেলাম, কাছেই একটি সতীদাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেবার জন্য স্ত্রী প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। শুনেই তৎক্ষণাৎ আমি সেখানে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, শুকনো একটি ডোবার তলায় বেশ বড় করে গর্ত কেটে চিতা তৈরি করা হয়েছে। চিতার উপর কাঠ সাজানো। তার উপর মৃত ব্যক্তিকে সটান শুইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জীবন্ত স্ত্রীও বসে রয়েছেন সেই চিতার উপর। চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত চিতার চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। পরিপাটি করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে জন-পাঁচেক মধ্যবয়স্কা মহিলা পরস্পর হাত ধরাধরি করে, সেই চিতার চারিদিকে ঘুরে ফিরে নাচছেন গাইছেন। দর্শকদের ভিড় হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা দর্শক দুইই বেশ যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন।

প্রচুর পরিমাণে তেল-ঘি ঢালা হয়েছিল চিতার উপর। সুতরাং অগ্নিসংযোগ করতে না করতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। স্ত্রীলোকটির পরনের কাপড়ে আগুন ধরে গেল। সুগন্ধ তেল ও চন্দন পূর্বেই তাঁর গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছিল। সারা গায়ে আগুন ধরে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! এতটুকু বিচলিত হতে দেখলাম না তাকে। কোনো বেদনা যন্ত্রণা, এমন কি সামান্য অস্বস্তির ভাব পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করলেন না। স্থির হয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মুখে বেশ স্পষ্টভাবে 'পাঁচ', 'দুই' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন। 'পাঁচে'র অর্থ হল, পূর্বজন্মে এরকম পাঁচবার তিনি তাঁর এই স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করেছেন। আর দুই জন্মে দু'বার হলেই সাতবার সম্পূর্ণ হয় এবং তাহলেই এই মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি স্বর্গলোকবাসিনী হতে পারেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! দেখলে মনে হয়, কোনো অদৃশ্য শক্তি সেই স্ত্রীলোকটির মনপ্রাণ যেন একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু এ তো সবে শুরু। করুণ কাহিনীর আরও অনেক বাকি আছে। আমি ভেবেছিলাম, যে পাঁচজন মহিলা চিতার চারিদিকে ঘুরে-ফিরে নাচছে গাইছে, তারা কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা আচার পালন করছে মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। চিতার লকলকে আগুন তাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে লেগে গেল। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সেই মহিলাটিও চিতার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জনও দেখতে দেখতে তার অনুগমন করল। বাকি তিনজন তখনও সেই রকম হাত ধরাধরি করে নাচছে-গাইছে, কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম না তাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে তারাও একে-একে চিতার আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

অতঃপর বুঝলাম, এই একাধিক সহমরণের কারণ কি? ঐ পাঁচজন মহিলা ক্রীতদাসী। গৃহস্বামী যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন গৃহকর্ত্রী তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং বলতেন যে তার মৃত্যু হলে তিনিও স্বামীসহমৃতা হবেন। দাসীরা তাই শুনে স্থির করেছিল যে গৃহস্বামীর মৃত্যুতে যদি গৃহকর্ত্রীও সহমৃতা হন, তাহলে তারাও তাদের জীবন উৎসর্গ করবে।

হিন্দুস্থানের অনেক লোকের সঙ্গে এবিষয়ে আমি আলাপ-আলোচনা করেছি। তাঁরা সকলেই আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ভালবাসার আধিক্যই সহমরণের অন্যতম কারণ। হিন্দুস্থানের মেয়েরা কোমল-প্রকৃতি ও স্নেহপ্রবণ। সেইজন্য স্বামীর মৃত্যু তাঁরা সহ্য করতে পারেন না এবং নিজেরাও স্বামীর সহমৃতা হন। একথা আমি বিশ্বাস করি না। অনুসন্ধান করে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার অন্যরকম ধারণা হয়েছে। বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানের মেয়েদের মনে নানারকম কুসংস্কারের বীজ বপন করা হয়। প্রত্যেক মেয়েকে মা শিক্ষা দেন যে স্বামীই হলেন একমাত্র দেবতা এবং মৃত স্বামীর ভস্মাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহ মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে জীবনের মহত্তর কর্তব্য আর কিছু হতে পারে না। এইটাই হল সনাতন প্রথা। কোনো নারী এ-প্রথার বিরোধিতা করতে পারে না, করা উচিত নয়, মহাপাপ। আমার ধারণা, পুরুষরাই হল এই সব প্রথা ও সংস্কারের স্রষ্টা। মেয়েদের দাসীর মতন পদানত করে রাখার জন্য, তাদের সেবা-শুশ্রূষা আদায় করার জন্য, যাতে তারা কোনোদিন কোনো কারণে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে না পারে সেইজন্য পুরুষরাই মাথা ঘামিয়ে এই সব প্রথা আবিষ্কার করেছে।

যাই হোক, এরকম আরও দু-একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা বলছি যা আমি স্বচক্ষে দেখিনি অবশ্য, কিন্তু যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং যা উল্লেখ না করলে সহমরণ-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি নিজে স্বচক্ষে যা দেখেছি তাও যদি অন্যদের কাছে বলি তাহলে কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। এরকম ঘটনা এতই অবিশ্বাস্য যে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারি। তাই শোনা ঘটনা হলেও, আমি সেটা অবিশ্বাস্য মনে করি না এবং উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। হিন্দুস্থানে সকলের মুখে মুখে কাহিনীটি চালু হয়েছিল একসময়। প্রত্যেকেই কাহিনীটি সত্য বলে বিশ্বাস করেন। হয়ত হিন্দুস্থানের বাইরে ইয়োরোপেও এই কাহিনীর প্রচার হয়েছে এতদিনে।

কাহিনীটি এই। কোনো একজন হিন্দু স্ত্রীলোক তার প্রতিবেশী একজন তরুণ মুসলমান দর্জির প্রেমে পড়েছিল। মুসলমান ছেলেটি খুব ভাল সেতার বাজাতে পারত। মেয়েটি নিরুপায় হয়ে তার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করল। তার বিশ্বাস ছিল যে মুসলমান ছেলেটি তাকে বিবাহ করতে রাজী হবে। সে তার প্রেমিকের কাছে গিয়ে পতিহত্যার কাহিনী বলল এবং তাকে বিবাহ করার জন্য অনুরোধ করল। মেয়েটি বলল এখনই এই স্থান ছেড়ে তাদের চলে যাওয়া দরকার। যেতে দেরি হলে তার মৃত্যু ভিন্ন কোনো উপায় থাকবে না। স্বামীর শবদাহের সঙ্গে তাকেও সহমরণ করতে হবে। মুসলমান ছেলেটি আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখে মেয়েটিকে বিবাহ করতে রাজী হল না। মেয়েটি তখন সোজা তার আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে গিয়ে বলল যে তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে এবং স্বামীর সহমৃতা হবার সঙ্কল্প করেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তার সঙ্কল্পে খুশী হয়ে বলল যে তার মতন মহীয়সী নারী আর হয় না, পরিবারের গৌরব সে। অবশেষে শবদাহের জন্য চিতা তৈরী হল এবং তাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। মেয়েটি চিতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে আত্মীয়স্বজনকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে লাগল। বাদ্যকাররাও উপস্থিত ছিল চিতার পাশে এবং তাদের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটিও ছিল। মেয়েটি একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে সেই মুসলমান ছেলেটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, হঠাৎ তার গলা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে চিতার ধারে নিয়ে এসে, জোরে ধাক্কা দিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল এবং নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল।

সুরাট থেকে পারস্য যাত্রার সময় আমি আর একজন বিধবা মহিলার পতিভক্তি

ও সহমরণ স্বচক্ষে দেখেছি। এই সময় শুধু আমি একা নই, একাধিক ইংরেজ ও ডাচ ভদ্রলোক এবং প্যারিসের মঁশিয়ে শাঁর্দা (Chardin) উপস্থিত ছিলেন।[১] এই সতীদাহের বিবরণ নিখুঁতভাবে ভাষায় বর্ণনা করার মতন আমার ক্ষমতা নেই। মহিলার মুখে যে পৈশাচিক সাহস ও স্বচ্ছন্দতা আমি লক্ষ্য করেছি সহমরণের সময়, তা ভাষায় প্রকাশ করা কি সম্ভবপর? কি নির্ভীক নির্বিকার ভঙ্গী তাঁর! স্থিরভাবে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, আলাপ করছেন, কোনো দুর্ভাবনার ছাপ নেই কোথাও। কি অবিচলিত আত্মবিশ্বাস তাঁর! কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো কিছুতে। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই, অস্বস্তি নেই। বসে বসে নিবিষ্ট মনে চিতার কাঠখড় ইত্যাদি নেড়েচেড়ে দেখছেন। দেখবার পর শান্তভাবে চিতার উপর উঠে তিনি মৃত স্বামীর মাথাটি কোলের উপর তুলে নিয়ে বসলেন গম্ভীরভাবে। তারপর একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নিজের হাতে চিতায় অগ্নিস যোগ করলেন, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা আগুন জ্বেলে দিলেন। বর্ণনা করা যায় না সে দৃশ্য! ভাষার জোর নেই আমার। ছবি এঁকেও সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা যায় না। আগাগোড়া সতীদাহের এই দৃশ্যটি এমনভাবে আমার মনে ছাপ রেখে গেছে যে আজও আমার মনে হয় যেন মাত্র কয়েকদিন আগে আমি ঘটনাটি ঘটতে দেখেছি চোখের সামনে। সমস্ত দৃশ্যটি একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়।

অবশ্য আমি সতীদাহের এমন অনেক ঘটনাও দেখেছি, যেখানে মৃত স্বামীর চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠেছেন এবং আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তখন আমার মনে হয়েছে যে সতীদাহ থেকে আত্মরক্ষা করার যদি কোনো শাস্ত্রীয় বিধান থাকত, তাহলে এই হতভাগ্য মহিলাদের মধ্যে অনেকে হয়ত সহমরণ না করে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু পুরোহিতরা সেরকম কোনো বিধানের কথা কোনোদিন বলেননি এবং সহমরণে অনিচ্ছুক ভীত ও

১। বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক জন শাঁর্দা (John Chardin) ১৬৪৩ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১৩ সালে লণ্ডনে মারা যান। ১৬৬৫ সালে প্রথমে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন—পারস্যে ও ভারতবর্ষে। তিনি ছিলেন জুয়েলার বা জহরৎ-ব্যবসায়ী। ১৬৭০ সালে তিনি প্যারিস ফিরে যান এবং পুনরায় ১৬৭১ সালে তিনি পারস্যে ও হিন্দুস্থানে আসেন। ১৬৭৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে তিনি ইয়োরোপ ফিরে যান। ১৬৬৭ এবং ১৬৭৫ সালে শাঁর্দা সুরাটে ছিলেন। ১৬৬৭ সালে বার্নিয়েরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সতীদাহের দৃশ্য বার্নিয়েরের সঙ্গে শাঁর্দা এই সময় একসঙ্গে দেখেছিলেন।

সন্ত্রস্ত বিধবাদের তাঁরা বাধ্য করেছেন মৃত্যু বরণ করতে। অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, ভীত আতঙ্কিত মহিলাদের জোর করে ঠেলে চিতার মধ্যে ফেলে দিতে। চিতার কাছ থেকে পাঁচ-ছয় পা পিছিয়ে এসেছে ভয়ে, এরকম মহিলাদের জোর করে চিতার মধ্যে টেনে ফেলে দিতে দেখেছি। চিতার ভিতর থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছে এবং বাইরে থেকে বাঁশের গোঁজা দিয়ে জোর করে তাকে চিতার মধ্যে চেপে ধরে রাখা হয়েছে, এরকম নিষ্ঠুর দৃশ্যও একাধিক দেখেছি।

কোনো-কোনো সময় বিধবাদের পালাতেও দেখেছি। শবদাহের সময় চিতার কাছে ডোম মুর্দাফরাসদের ভিড় হয়। সতী বয়সে যদি তরুণী হয়, দেখতে সুন্দর হয়, তাহলে অনেক সময় মর্দাফরাসরা মতলব করে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। পলাতকা সতীকে তারা লুকিয়ে রাখে। যাদের আত্মীয়স্বজন তেমন নেই, সঙ্গহীন ও দরিদ্র, তাদেরই সাধারণত এইভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়। কিন্তু এইভাবে যারা পালিয়ে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করতে পারে, এবং নিম্নশ্রেণীর কাছে আশ্রয় পায়, তাদের জীবন শেষ পর্যন্ত দুর্বহ হয়ে ওঠে এবং অভিশপ্ত হতভাগিনীর মতন তারা দিন কাটায়। কেউ তাদের শ্রদ্ধা করে না, স্নেহ করে না, ভালবাসে না, সমাজের মধ্যে ভদ্রভাবে তারা আর জীবন কাটাতে পারে না। পতিতা ও কলঙ্কিনীর অপবাদ চিরজীবন তাকে সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। সুতরাং তার আশ্রয়দাতা যারা তারাও তার অসহায় অবস্থার জন্য তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। পলাতকা কোনো সতীকে সসম্মানে আশ্রয় দিতে কোনো মোগল বা মুসলমানও চায় না, ভয় পায়। সতীর ধর্মদ্রোহিতা তাদের ভয়ের কারণ। তবে অনেক হিন্দু বিধবাকে পর্তুগীজরা সতীদাহের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। প্রধানত বন্দরের কাছাকাছি জায়গাতেই তারা উদ্ধার করেছে বেশি, কারণ পর্তুগীজদের বাস ছিল বেশি বন্দরের কাছেই। আমার নিজের যা মনে হয়েছে সতীদাহের দৃশ্য দেখতে দেখতে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। মনে হয়েছে যে পুরোহিতশ্রেণী সমাজে এই শাস্ত্রীয় বিধানের প্রবর্তন করেছেন তাঁদের সকলের আগে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত।

লাহোরে একবার একটি সুন্দরী বালিকার সহমরণের দৃশ্য দেখেছিলাম, ভুলতে পারব না কোনোদিন। বছর বারোর বেশি বয়স নয় মেয়েটির। চিতার সামনে মেয়েটিকে যখন নিয়ে আসা হল তখন দেখলাম ভয়ে সে আধমরা হয়ে গেছে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। ভয়ে

কাঁপতে কাঁপতে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি। কিন্তু সমবেত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি দর্শকদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। একজন বৃদ্ধা মহিলা মেয়েটির হাত ধরল এবং চার-পাঁচজন পুরোহিত মিলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার মৃত স্বামীর চিতার উপর বসিয়ে দিলে। তার হাত পা সব বেঁধে দেওয়া হল, পাছে সে উঠে দৌড়ে পালায়। তারপর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল এবং জীবন্ত দ্বাদশী বালিকাটিকে পুড়িয়ে হত্যা করা হল। এরকম কোনো ঘটনার সামনে আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করা যে কঠিন হতে পারে তা বুঝতেই পারছেন। মনে হল, চিৎকার করে প্রতিবাদ করি। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলাম। কারণ প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আগামেমনন্ (Agamemnon) নিজের কন্যা ইফিজিনিয়াকে (Iphigenia) যখন ডায়ানার কাছে উৎসর্গ করেছিলেন তখন কবি লুক্রেসিয়াস এই ধর্মের নামে অধর্মাচরণ সম্বন্ধে দুঃখ করে যা বলেছিলেন, সেই কথা আমার মনে পড়ল।

এখনও তো এই বর্বর কুসংস্কার সম্বন্ধে, এই নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়নি। হিন্দুস্থানের সর্বত্র যে এই সতীদাহ প্রচলিত প্রথা, তা নয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় দাহ না করে তাকে টুটি টিপে হত্যা করা হয়। দু-তিনজন মিলে হঠাৎ হতভাগিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুটি চেপে ধরে এবং তাকে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহ মাটি-চাপা দিয়ে পদদলিত করা হয়।

অধিকাংশ হিন্দুরা অবশ্য শবদাহ করে। কেউ কেউ দেখেছি, নদীর ধারে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কোনো উঁচু জায়গা থেকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। গঙ্গানদীর ধারে এরকম মৃতের সৎকার আমি একাধিক দেখেছি। কাক চিল শকুন, কুমীর হাঙরের খাদ্য হয় মৃতদেহ।

কেউ কেউ রুগ্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বে নদীর ধারে বহন করে নিয়ে যায় এবং পা থেকে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখে। ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে জলে চুবিয়ে দেওয়া হয় এবং সেইভাবে জলের মধ্যে রেখে, খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে উঠে, সকলে ফিরে চলে যায়। এইভাবে সৎকার করার উদ্দেশ্য কি, একথা আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তার উত্তরে শবযাত্রীরা বলেছেন: মৃত্যুর সময় আত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে যদি গঙ্গাজলে তাকে স্নান করানো হয় তাহলে কলুষিত আত্মার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যায় এবং নিষ্কলঙ্ক আত্মার স্বর্গযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। জানি না হয় কি না হয়। তবে এ বিশ্বাস

শুধু যে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। রীতিমত শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও আমি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তর্ক করতে দেখেছি।

সাধুসন্ন্যাসী ফকিরদের কথা

হিন্দুস্থানে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির দরবেশ ইত্যাদির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এত বেশি যে তা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রমে বাস করেন এবং সেখানে গুরুর আদেশ পালন করে চলেন। আশ্রমে তাঁদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, ব্রহ্মচর্য, গুরুভক্তি ইত্যাদি আদর্শ মেনে চলতে হয়। এতরকমের বিচিত্র জীবন এই সব ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসী যাপন করেন যে, তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া সত্যিই কঠিন। একশ্রেণীর সাধু আছেন তাঁদের 'যোগী' বলে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের পন্থা যাঁরা জানেন, অথবা যোগসূত্র যাঁদের আছে, তাঁরাই হলেন যোগী। কত যোগী যে হিন্দুস্থানে আছেন তা বলা যায় না। নগ্নদেহে ভস্ম মেখে তাঁরা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন। কখনও কোনো গাছতলায়, কোনো নদনদীর ধারে, আবার কখনও বা কোনো দেবালয়ের আশে-পাশে তাঁদের যোগাসনে বসে থাকতে দেখা যায়। মাথায় অজানুলম্বিত কেশ, জট-পাকানো, মুখে দাড়ি। কেউ একটি কেউ বা দুটি হাত ঊর্ধ্বে তুলে বসে থাকেন। লম্বা লম্বা হাতের নখ—মেপে দেখেছি, প্রায় অর্ধেক আঙুলের সমান লম্বা। হাতগুলি শীর্ণ ও ক্ষুদ্র, অনাহারক্লিষ্ট রোগীর মতন। সাধুরা প্রায় অনাহারেই থাকেন বলে তাঁদের দেহ শীর্ণ দেখায়। পেশীগুলি যেন শক্ত হয়ে গেছে মনে হয়, শিরাগুলি যেন পাকিয়ে গেছে। সাধারণ লোক এই শীর্ণকায় সাধুদের দেবতার মতন ভক্তি করে এবং তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করে। দলে দলে তারা সাধুদের কাছে এসে ভিড় করে। যোগাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘজটাজুট শ্মশ্রু সম্বলিত, লম্বা নখবিশিষ্ট নগ্নদেহ এই যোগীদের দেখলে বাস্তবিক ভয় করে।

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দেখেছি, নগ্ন সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (নাগা সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন বার্নিয়ের)। ভয়াবহ দৃশ্য! কারও হাত ঊর্ধ্বে প্রসারিত; মাথার জট বৃত্তাকারে চূড়া করে বাঁধা; হাতে লাঠি, লোহার ডাণ্ডা ও ত্রিশূল; কারও পরনে, কারও কাঁধে বাঘের ছাল। ঠিক এইভাবে আমি তাদের দল বেঁধে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কোনো ভয় নেই,

সঙ্কোচ নেই। স্ত্রী পুরুষ দর্শক সকলে মিলে তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে। মহিলরা তাদের দানধ্যান করেন মহাপুরুষ মনে করে। মহাপুরুষ, সাধু-সন্ন্যাসীদের দানধ্যান করলে পুণ্য হয়, স্বর্গবাস হয়- এ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

দিল্লী শহরের মধ্যে এরকম একজন উদ্ধত উলঙ্গ সাধুর আচরণে আমি রীতিমত বিরক্তি বোধ করতাম। সারা শহরের মধ্যে, পথে ঘাটে সাধুটি উলঙ্গ হয়ে নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়াত, কচি খোকার মতন। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, ভয় ডর নেই। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের অনুরোধ ও হুমকি দুইই সে উপেক্ষা করে চলত, গ্রাহ্য করত না। বহুবার তাকে কাপড় পরে ভদ্রবেশে থাকার জন্য অনুরোধও সম্রাট করেছেন, শেষে শাস্তি দেবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে সম্রাটের আদেশে দিল্লী শহর থেকে স্থানান্তরিত করে, এই ঔদ্ধত্যের জন্য সাধুটির শিরশ্ছেদন করা হয়।

মধ্যে মধ্যে এই ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে দূরদেশে তীর্থযাত্রা করে। কেবল নগ্নদেহে নয়, বড় বড় লোহার শিকলাদি নিয়ে। হাতির পা বাঁধা শিকলের মতন মোটা মোটা লোহার শিকল। অনেক সাধুকে দেখেছি, সাত-আটদিন ধরে সমানে রাতদিন সোজা হয়ে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে। সাত-আটদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পা ফুলে যায়। কাউকে কাউকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের উপর ভর দিয়ে, মাথা নীচু করে, পা দু'খানা উপরে তুলে অবস্থান করতে। এরকম আরও নানারকমের দৈহিক কসরতের দৃশ্য দেখেছি, যা এত কষ্টকর যে সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। এসব করা হয় একটা অলৌকিক শক্তির নিদর্শনরূপে।

প্রথমে যখন হিন্দুস্থানে আমি যাই, তখন এই সব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের নিদর্শন দেখে আমার মনে রীতিমত অবজ্ঞার ভাব এসেছিল—একথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে এসব সম্বন্ধে, আমি জানতাম না। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হত এই সাধুরা একদল নৈরাশ্যবাদী ছাড়া আর কিছু নয়। কোনো শিক্ষাদীক্ষা নেই, যুক্তি বা বুদ্ধিসম্মত বিচারের ক্ষমতা নেই তাদের। মধ্যে মধ্যে মনে হত, হয়ত তারা সত্যিই সাধুপ্রকৃতির লোক, সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এরকম আচরণ অভ্যাস করছে। কিন্তু সাধুতার বিশেষ কোনো চিহ্ন তাদের মধ্যে খুঁজে পাইনি কোনোদিন। অনেক সময় মনে হয়েছে হয়ত এরকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন,

অলস, অকর্মণ্য, ভ্রাম্যমাণ জীবনের প্রতি তাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে বলেই তারা সাধু হয়েছে। আবার একথাও মনে হয়েছে যে সাধু হিসেবে তাদের একটা অহমিকাবোধ আছে এবং সেই বোধ থেকেই তারা এইসব আচরণ করে থাকে। সাধুদের সম্পর্কে এইরকম অনেক কথা আমার মনে হয়েছে।

সাধুরা যে এত কষ্ট সহ্য করেন এবং আত্মনিপীড়ন করেন তার কারণ তাঁরা মনে করেন, পরবর্তী জীবনে তাঁরা রাজা হবেন। অর্থাৎ এমন এক জীবন লাভ করবেন তাঁরা যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি রাজকীয় জীবনের চেয়ে অনেক বেশি। পরবর্তী জীবনে ইহজীবনের রাজাদের চেয়েও তাঁরা বেশি সুখী হবেন—প্রধানত এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই তারা আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করেন। অনেক সময় আমি তাঁদের বলেছি, পরজীবনে কি হবে না হবে তার জন্য ইহজীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, কি কারণে তাঁরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন? আমি বুঝতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি, কারণ আমাকে বোঝানো খুব সহজ নয়। আমি বলেছি, অতি সহজ যুক্তিতে আমি ঐ সব পরলোকের স্বর্গসুখ বা রাজকীয় সুখের কথা বুঝতে রাজী নই। নির্বুদ্ধি না হলে কেউ পরলোকের সুখের ভরসায় ইহলোকে স্বেচ্ছায় এরকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে না।

সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চস্তরের সাধু বলে জনসমাজে পরিচিত। একেবারে সিদ্ধ যোগীপুরুষ তাঁরা, ভগবানের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। সকলের ধারণা, পার্থিব জীবন থেকে তাঁরা একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংসারত্যাগী ও গৃহত্যাগী। দূরে কোনো অরণ্যমধ্যে নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন তাঁরা, সাধারণত জনপদের দিকে যান না। কেউ যদি খাবার-দাবার ভক্তিভরে তাঁদের এনে দেন, তাঁরা তা গ্রহণ করেন, আর যদি কেউ না আনেন, তাহলে তাঁরা অনাহারেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেন। ভগবান তাঁদের বাঁচিয়ে রাখেন। দীর্ঘকাল অনশন উপবাসে অভ্যস্ত বলে তাঁদের বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, এই ধর্মাত্মা যোগীপুরুষরা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন যে এইভাবে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লেশে থাকতে পারেন, কারণ তাঁদের আত্মা এই সময়ে একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে; বাহ্যজ্ঞান তাঁদের লোপ পায়, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি বলে তখন আর কিছু থাকে না। যোগীরা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন। আলোকের মতন জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ঈশ্বর তাঁদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। তখন তাঁরা এক অলৌকিক আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন এবং ইহলোক,

সংসার, পৃথিবী সব তাঁদের কাছে তখন অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়। আমার একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তিনি বলতেন যে এরকম ধ্যানস্থ হয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। সাধারণ মানুষ যারা যোগীপুরুষদের সান্নিধ্য কামনা করে তারা এই যোগসাধনা ও দেবতাদর্শন ইত্যাদি গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আমার মনে হয়, এই ধরনের যোগসাধন ও যোগবলে ঈশ্বরদর্শনাদির অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে কিছুটা সত্য হয়ত নিহিত আছে। নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাত্রা, দীর্ঘ উপবাস ও আত্মনিগ্রহের ফলে মানুষের কল্পনাশক্তি অনেক উগ্ররূপ ধারণ করে এবং তখন মানুষের পক্ষে নানারকমের অধ্যাসাদি বাস্তব সত্য বলে মনে হয়। অবশ ও ক্লান্ত দেহের মধ্যে ঘুমন্ত, মূর্ছিত মন বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে। সাধুসন্ন্যাসীরা যেভাবে আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করেন, তাতে এরকম কাণ্ডবাণ্ড অসম্ভব বলে মনে হয় না। ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁরা ক্রমে নিজেদের আয়ত্তে আনেন এবং তখন ইচ্ছা মতন ধ্যানস্থ হয়ে অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করলে তাঁদের কোনো কষ্ট হয় না। সাধুরা বলেন—কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে একাকী ধ্যানস্থ হতে হবে প্রথমে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, পূর্ণ উপবাস করতে হবে, জল পর্যন্ত স্পর্শ করা চলবে না, ঊর্ধ্বনেত্রে যোগাসনে বসে, চোখ দুটি ধীরে ধীরে আনত করে নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ করতে হবে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছুকাল অবস্থান করার পর দেবতা জ্যোতির্ময় আলোকরূপে অবতীর্ণ হবেন যোগীর সামনে।

এই ভাবোন্মত্ততাই হল যোগীদের অলৌকিক রহস্যবাদের মূল কথা। যোগীদের মতন চালচলন সুফীদের মধ্যেও দেখা যায়। আমি এটা রহস্যবাদ বলছি, কারণ সমস্ত ব্যাপারই তাঁদের কাছে গুহ্য ব্যাপার। কিছুই তাঁরা বাইরে প্রকাশ করেন না, করতে চান না। তাঁদের যোগসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই গোপনতা। হয়ত বলবেন, তাহলে আমি এত সব কথা কোথা থেকে জানতে পারলাম? একজন পণ্ডিতের সাহায্যেই আমি এই সব কথা জানতে পেরেছি। আমার মনিব আগা দানেশমন্দ খাঁ একজন হিন্দু পণ্ডিতকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। পণ্ডিত মশাই আমাদের কাছে কিছুই গোপন করতেন না। সুফীদের সম্বন্ধে দানেশমন্দ খাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

আমার নিজের বিশ্বাস—দারিদ্র্য, অনশন ও আত্মনিপীড়ন—এই তিনের প্রভাবে মানুষের পক্ষে এই ধরনের আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়। আমাদের দেশের (ইয়োরোপের), ধর্মযাজক ও সাধুপুরুষরা এইদিক

দিয়ে যে এশিয়া বা হিন্দুস্থানের যোগীপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা নয়। বরং এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হল আর্মেনীয়ান, কেল্ট, গ্রীক, নেস্টোরিয়ান, জেকোবিন ও মেরোনাইটরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে ইয়োরোপীয় সাধুদের শিক্ষানবীশ বলে মনে হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, অনশন ও উপবাসের কষ্ট শীতপ্রধান ইয়োরোপে অনেক বেশি হিন্দুস্থানের তুলনায়।

এইবার অন্য আর একশ্রেণীর ফকিরের কথা বলব, যারা ঠিক যোগীদের মতন নন, অথচ যাঁদের প্রতিপত্তি যোগীদের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। প্রায় সর্বদাই তাঁরা ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করেন, চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ান, উদাসীন ভাব দেখান এবং অনেক কিছু গুহ্য ব্যাপার জানেন বলে প্রচার করেন। সাধারণ লোক মনে করে যে এই ফকিরবেশী সাধুরা জানেন না এমন কোনো জিনিস নেই এবং তাঁদের এমন ঐশ্বরিক শক্তি আছে যে, তাঁরা যে কোনো পদার্থকে সোনা তৈরি করতে পারেন। অভ্রজাতীয় এমন এক পদার্থ তাঁরা তৈরি করেন—যা সামান্য দু-একটা দানা প্রতিদিন সকালে গলাধঃকরণ করলে যে কোনো অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে যায়, দুর্বল শরীরে শক্তিসঞ্চার হয়, যা খাওয়া যায় তাই তৎক্ষণাৎ হজম হয়ে যায়। শুধু তাই নয়। যদি এই শ্রেণীর দুজন সাধুপুরুষ দৈবক্রমে হঠাৎ কোথাও মিলিত হন, তাহলে উভয়ের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তখন দুজনেই এমন সব জাদুবিদ্যার খেল্ দেখাতে থাকেন যে সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। কে কি মনে মনে চিন্তা করেছে তা তাঁরা অনর্গল গড়গড় করে বলে দেন, পত্রপুষ্পহীন শুকনো গাছের ডালে বিড়বিড় করে ফুল ফুটিয়ে দেন, ফল ফলিয়ে দেন। এক ঘণ্টার মধ্যে, পনের মিনিটের মধ্যে বুকের ভিতর ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটান, এবং শুধু বাচ্চা নয়, যে কোনো পাখির বাচ্চা ফোটান, তাকে ঘরের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়েন। এরকম আরও অনেক তাজ্জব কাণ্ডকারখানা তাঁরা করেন, জাদুবলে ও মন্ত্রবলে যার রহস্য কারও পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব হয় না।

এই শ্রেণীর ফকিরের সম্বন্ধে লোকমুখে যা শুনেছি তা সত্য কি মিথ্যা, যাচাই করে দেখার সময় হয়নি। আবার আগা (দানেশমন্দ খাঁ) একবার এরকম একজন সবজান্তা ফকিরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাঁর মনের কথা সব ঠিক-ঠিক বলে দিতে পারেন, তাহলে আগা তাঁকে তিনশো টাকা পুরস্কার দেবেন। আগা বলেছিলেন যে আগে থেকে তিনি

একটি কাগজে তাঁর মনের কথা লিখে রেখে দেবেন, যাতে ফকিরের মনে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না উপস্থিত হয়। এক সময় আমিও ফকিরকে বলেছিলাম যে আমিও তাঁকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেব যদি আমার মনের কথা তিনি বলে দিতে পারেন। আশ্চর্য! সাধুবাবা তারপর আর আমাদের বাড়িমুখো হলেন না। আর একবার আমার ইচ্ছা হল, এই সাধুবাবা কি করে ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটান দেখতে হবে। তাও স্বচক্ষে দেখা কোনোদিন সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমার এত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন সাধুবাবার তাজ্জব কাণ্ড দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দু এক জায়গায় যখনই আমি উপস্থিত হয়েছি এবং দেখেছি যে জনতার মধ্যে বীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে তখন আমি নানারকম প্রশ্ন করে দেখেছি যে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই হল চালাকি ও ধাপ্পাবাজি, কোনো অলৌকিক শক্তির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। একবার আমার আগা সাহেবের টাকা চুরি গিয়েছিল এবং সাধুবাবা বাটি চেলে চোর ধরার কৌশল দেখাচ্ছিলেন। আমি সেই চালাচালির চালাকিটা ফাঁস করে দিয়েছিলাম।

আর একশ্রেণীর ফকির আছেন তাঁদের চালচলন অন্যরকম। তাঁরা বাইরে বিশেষ কোনো ভড়ং দেখান না পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যেও তেমন কোনো জাঁকজমক নেই এবং ভক্তির আতিশয্যও তাঁদের কম। সাধারণত খালি পায়ে তাঁরা চলাফেরা করেন, মাথাতেও কোনো পাগড়ি-টাগড়ি পরেন না। একটা লম্বা আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরে তার উপর ওড়নার মতন একটা সাদা চাদর হাতের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে, তাঁরা ঘুরে ঘুরে বেড়ান। এমনিতে তাঁরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকেন, অন্যদের মতন অপরিচ্ছন্ন নন। দুজন দুজন করে চলাফেরা করেন, একা নন। চলাফেরার ভঙ্গীও খুব নম্রসম্র। এক হাতে কমণ্ডলুর মতন একটি ভিক্ষার পাত্র থাকে। সাধারণত তাঁরা দোকানে দোকানে ঘুরে ভিক্ষা করেন না অন্যান্য সাধু-ফকিরদের মতন। ভদ্রলোকের বাড়িতে যান এবং যাওয়া মাত্রই আপ্যায়িত হন। ভদ্রলোকেরা ও গৃহস্থরা তাঁদের আগমনে কৃতার্থ বোধ করেন, প্রাণ খুলে অতিথিসৎকার করতেও কুণ্ঠিত হন না। হিন্দু গৃহস্থরা মনে করেন, এই সাধুদের আবির্ভাব সাক্ষাৎ দেবতার আবির্ভাবের মতন। যে পরিবারে যখন তাঁরা যান, সেই পরিবারের লোক তখন তাঁদের ভাগ্যবান বলে মনে করেন। বাইরে এঁদের আচার-ব্যবহার চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম কানাঘোঁষা শোনা যায়। পরিবারের সঙ্গে, এমনকি স্ত্রীলোকদের

সত্ত্বেও তাঁরা এমন অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন যে সকলেই তাঁদের সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না। মোগল রাজ্যের মধ্যে এই গুরুসেবা ও সাধুসেবার এই জাতীয় বিচিত্র প্রথা সর্বত্র প্রায় প্রচলিত আছে দেখা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এই সাধুরা নিজেদের কতকটা খ্রীস্টান পাদ্রীর সমগোত্র বলে মনে করেন। এঁদের দেখলে আমার মনে নানারকম কৌতূহলের সঞ্চার হত এবং চারিদিক দুর্বলতা ও দম্ভ দুই-ই আমার কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হত। মধ্যে মধ্যে তাঁদের ডেকে আমি আলাপ করতাম। দেখতাম তাঁরা বলাবলি করছেন আমার সম্বন্ধে 'এই ফিরিঙ্গি সাহেব আমাদের দেশের অনেক ব্যাপার জানে, কারণ অনেকদিন এখানে আছে। সাহেব জানে যে আমরা হলাম ওদের দেশের পাদ্রীদের মতন'।[1]

যাই হোক, এই সব সাধু-ফকির সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। এখন হিন্দুদের শাস্ত্র সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা

আমি সংস্কৃত ভাষা জানি না। হিন্দুস্থানে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভাষা। সেই ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি বলে যেন বিস্মিত হবেন না। আমার আগা সাহেব, দানেশমন্দ খাঁ, কতকটা আমার অনুরোধে এবং কতকটা তাঁর নিজের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য একজন বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। এরকম সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তখন হিন্দুস্থানে খুব কমই ছিলেন। আগে সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর অধীনে এই পণ্ডিত কাজ করতেন।[2] এই পণ্ডিত মশায়ের সাহচর্যে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছি এবং তিনিই আমাকে অন্যান্য আরও অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আগা সাহেবের সঙ্গে হার্ভে (William Harvey) ও পেকেতের (Jean Pecquet) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে, অথবা গ্যাসেণ্ডি (Gassendi) ও দেকার্তের (Descartes) দর্শন সম্বন্ধে, মধ্যে

১। পর্তুগীজ শব্দ 'পাদ্রি' প্রথমে রোমান পুরোহিতদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হত। পরে হিন্দুস্থানের খ্রীস্টান পুরোহিতদের সকলকে 'পাদ্রি' বলে অভিহিত করা হয়।

২। দারাশিকো যখন বারাণসীতে ছিলেন তখন সেখানকার বিখ্যাত সব হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত 'উপনিষদ' পার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই পার্সী অনুবাদ থেকে পরে আবার লাতিন ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করা হয়।

মধ্যে আমার আলোচনা হত।[৩] আমি তাঁদের রচনা পার্সী ভাষায় অনুবাদ করতাম আগার জন্য। প্রায় পাঁচ ছয় বছর খাঁ সাহেবের কাছে থেকে এই অনুবাদের কাজই করতে হয়েছে আমাকে। খাঁ সাহেবের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে আমার রীতিমত তর্ক-বিতর্ক হত। তারই ফাঁকে-ফাঁকে আমরা পণ্ডিত মশাইকে ডাকতাম এবং হিন্দুশাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করতে বলতাম। পণ্ডিত মশাই এমন গম্ভীর হয়ে শাস্ত্রকথা আলোচনা করতেন যে, আমাদের হাসি পেত অনেক সময়। অথচ শাস্ত্রালোচনার সময় তিনি একটুও হাসতেন না। আমাদের কাছে তাঁর ব্যাখ্যান ও বক্তৃতা প্রায়ই নীরস মনে হত।

হিন্দুদের বিশ্বাস যে স্বয়ং ভগবান তাদের জন্য চারখানা শাস্ত্রগ্রন্থ আদিতে সৃষ্টি করেছিলেন—তার নাম 'বেদ'। বেদ বা জ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন করলে সর্ববিদ্যাবিশারদ হওয়া যায়। যা বেদে নেই, তা অন্য কোথাও নেই। প্রথম বেদের নাম 'অথর্ববেদ', দ্বিতীয় বেদের নাম 'যজুর্বেদ' তৃতীয় বেদের নাম 'ঋক্‌বেদ', এবং চতুর্থ বেদের নাম 'সামবেদ'।[৪] বেদে আছে যে মানুষ নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তার মধ্যে প্রধান জাতি হবে চারটি।* প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জাতি হল 'ব্রাহ্মণ', যাঁরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, দ্বিতীয় জাতি হল ক্ষত্রিয়' যাঁরা যুদ্ধবিগ্রহ করেন. তৃতীয় জাতি হল 'বৈশ্য' যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করেন, এবং সাধারণত 'বেনিয়া' বলে পরিচিত, চতুর্থ জাতি হল 'শূদ্র', যারা কারিগর মজুর ও দাস। এই সব জাতির মধ্যে কোনো সামাজিক লেনদেনের সম্পর্ক নেই, এক জাতির লোক অন্য জাতিতে বিবাহাদি করতে পারবে না। কোনো ব্রাহ্মণ কোনো ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করতে পারবে না। এই বিধিনিষেধ অন্যান্য প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৫]

৩। উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) ১৬১৬ সালে লণ্ডনের চিকিৎসকমণ্ডলীর কাছে তাঁর রক্তচলাচলের (Blood circulation) যুগান্তকারী তত্ত্বকথা প্রচার করেন। জাঁ পেকেতও হার্ভের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। এই সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক দেকার্তের আবির্ভাব হয়।

৪। বার্নিয়েরের বেদের ক্রমভাগ ভুল। ঋকবেদ' সবচেয়ে প্রাচীন, তারপর যজুর্বেদ, সামবেদ এবং সর্বশেষে অথর্ববেদ রচিত হয়েছে বলে এখন পণ্ডিতেরা মনে করেন।

* বার্নিয়ের 'tribus' বা 'tribe' কথা ব্যবহার করেছেন 'জাতি'-অর্থে, 'caste' কথা ব্যবহার করেননি। পর্তুগীজ 'casta' থেকে 'caste' কথা এসেছে এবং জাতিঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—অনুবাদক।

৫। বার্নিয়েরের এই জাতিপরিচয় তাঁর অসাধারণ বোধশক্তির আর-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতের সংস্কৃত ব্যাখ্যার পার্সী অনুবাদ থেকে মুখে শুনে, ভারতীয় সমাজের পরিচয় এইভাবে

হিন্দুরা কতকটা পাইথাগোরীয়ানদের মতন আত্মার অবিনশ্বরতা, দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাস করে। তার জন্য সাধারণত তারা জীবজন্তু হত্যা করা বা ভক্ষণ করা পছন্দ করে না। এটা অবশ্য মোটামুটি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা অন্যান্য জাতির লোকেরা জীবজন্তু হত্যা করতে বা ভক্ষণ করতে পারে। তবে তাদের ক্ষেত্রেও গোহত্যা করা পাপ। সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে গরুর প্রতি। প্রায় দেবতার মতন তারা গরুকে ভক্তি করে, তার কারণ তাদের ধারণা, ইহলোক থেকে পরলোক যাত্রার সময় গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হতে হবে, সেই গরুকে পারের কাণ্ডারী ভগবানের মতন ভক্তি না-করা অন্যায়। বোধহয়, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকাররা রাখাল বালকদের এইভাবে মিশরের নীলনদ পার হতে দেখেছিলেন, এক হাতে গরুর লেজ, আর এক হাতে লাঠি নিয়ে। সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি তাঁরা এইভাবে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, গরুর উপকারিতার জন্য হিন্দুরা তাকে এই চোখে দেখে। গরুর দুধ-ঘি-মাখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে ; গরু দিয়ে হালচাষ করে ফসল ফলাতে হয়, অর্থাৎ গরু জীবন দান করে। সুতরাং জীবনীশক্তির উৎস গরু হল ভগবান। এ ছাড়া আরও একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। উত্তম চারণভূমির খুব অভাব হিন্দুস্থানে তার জন্য গো-মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা খুব বেশি সম্ভব নয়। সেইজন্য হয়তো গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, এমনও হতে পারে।৬ ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশের মতন যদি হিন্দুস্থানে গোহত্যা করা হত, তাহলে দেশের চাষবাসে রীতিমত সঙ্কট দেখা দিত। গ্রীষ্মকালে হিন্দুস্থানের উত্তাপ এত বেশি হয় যে, মাঠের গাছপালা সব শুকিয়ে পুড়ে যায় এবং গরুবাছুরের খাদ্য বলে কোথাও কিছু থাকে না। প্রায় আট মাসকাল গ্রীষ্ম থাকে এবং এই সময় গরুবাছুর খাদ্যাভাবে মাঠে-জঙ্গলে যা খুশি আবর্জনা খেয়ে শুয়োরের মতন বেঁচে থাকে। গবাদি পশুর অভাবের জন্যই সম্রাট জাহাঙ্গীর একসময় কিছুদিনের জন্য ফরমান জারি করে

লিপিবদ্ধ করে যাওয়া যে কত কঠিন, তা আজ আমরা ঠিক বুঝতে পারব না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কথা যেভাবে বার্নিয়ের ভাষান্তরিত করছেন তা যথাক্রমে এই :—Brahmens, Quetterys, Besoue, Seydra.

৬। গোহত্যা, গোমাংসভক্ষণ বা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই চমৎকার ব্যাখ্যা তাঁর অনুসন্ধানী মনের পরিচায়ক। সাধারণ বিদেশীদের মতন তাঁর রচনার মধ্যে কোনো তাচ্ছিল্যের ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিটি আচার-ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সময় হিন্দুরা এই মর্মে আবেদন করেছিল। আবেদনপত্রে তারা জানিয়েছিল যে গত পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে দেশের বনজঙ্গলের এত দ্রুত অবনতি হয়েছে যে গরুবাছুর অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে গেছে।

হিন্দু শাস্ত্রকাররা গোহত্যা বা মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার সময় হয়ত ভেবেছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মানুষের উপকার হবে এবং লোকচরিত্রের উন্নতি হবে। জীবজন্তুর প্রতি যদি তাদের করুণার উদ্রেক করা যায়, তাহলে মানুষের প্রাণে মনুষ্যত্ববোধও জাগ্রত থাকবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গভীর হবে, মানবিক হবে। শাশ্বত আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসের ফলে কোনো জীবজন্তুকে হত্যা করাকে তারা পিতৃপুরুষ হত্যার সামিল মনে করবে। তার চেয়ে ঘোরতর অপরাধ আর কী হতে পারে? এমনও হতে পারে যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্থানের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক অনিষ্টকর। সেইজন্যও হয়ত তারা গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে জারি করেছিলেন।

বেদের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য হল প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনবার পুবদিকে মুখ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। সকালে একবার দুপুরে একবার, রাত্রে একবার। তিনবার স্নান করাও তার কর্তব্য, অন্তত মধ্যাহ্নভোজনের আগে একবার তো নিশ্চয়ই। স্নান করতে হলে বদ্ধ জলে স্নান না করে, স্রোতের জলে অবগাহন করাই শ্রেয়। এখানেও দেখা যায়, দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি শাস্ত্রকারদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শীতপ্রধান দেশের লোকরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এই ধরনের শাস্ত্রীয় বিধান যদি তাদের উপর প্রয়োগ করা হত, তাহলে তাঁদের কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হত! অথচ আমি দেখেছি, হিন্দুস্থানের লোক এই শাস্ত্রীয় বিধান বর্ণে-বর্ণে পালন করেন, নদ-নদীর স্রোতের জলে স্নান করেন এবং যেখানে কাছাকাছি কোনো নদী নেই, সেখানে কলসী বা অন্য জলপাত্রে জল নিয়ে মাথায় ঢালেন। মধ্যে-মধ্যে আমি তাদের এই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতাম এবং বলতাম যে, শীতপ্রধান দেশে এ-বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এর মধ্যে ধর্মের ব্যাপার কিছু নেই, এ হল একেবারে নিছক স্বাস্থ্যের বিধান। আমার এই অভিযোগের উত্তরে তারা বলেছে. 'আমরা কি কোনোদিন বলেছি সাহেব যে, আমাদের শাস্ত্রের বিধান অন্যান্য সকল দেশের সকল জাতের লোকের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য? তা তো আমরা বলিনি কোনোদিন। ভগবান কেবল আমাদের দেশের লোকের জন্যই এই সব শাস্ত্রীয় বিধান রচনা করেছেন, বিধর্মী বিদেশীদের জন্য নয়। আমরা কোনোদিন এমন কথাও বলিনি যে, তোমাদের ধর্ম মিথ্যা। তোমাদের ধর্ম তোমাদের সাহেব, আমাদের ধর্ম আমাদের। তোমাদের যা প্রযোজন ঠিক সেইভাবে তোমাদের ধর্মশাস্ত্র তৈরি হয়েছে। ভগবান ধর্মাচরণের বিভিন্ন পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে-কোনো পথ ধরে স্বর্গে যাওয়া যায় সাহেব!' এর পর আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া মুশকিল হল। আমি কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারলাম না যে, আমাদের খ্রীস্টানধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এবং হিন্দুদের ধর্ম কেবল হিন্দুস্থানের জন্য। একথা কিছুতেই তাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে পারলাম না।

বেদের শিক্ষা হল—ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করবেন সঙ্কল্প করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনজন অবতার সৃষ্টি করলেন তার জন্য। একজন ব্রহ্মা, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান; একজন বিষ্ণু এবং একজন মহাদেব। ব্রহ্মাকে দিলেন তিনি সৃষ্টির দায়িত্ব, বিষ্ণুকে দিলেন পালনের দায়িত্ব এবং মহাদেবকে দিলেন সংহারের দায়িত্ব। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, এবং মহাদেব ধ্বংসের দেবতা। ভগবানের আদেশে ব্রহ্মাই চতুর্বেদ সৃষ্টি করলেন এবং নিজেও সেইজন্য চতুর্মুখ হলেন।

ইয়োরোপীয় পাদ্রী সাহেবদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা বলেন যে, এই ত্রয়ীর কল্পনা হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম বিশেষত্ব; আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় রহস্যাবৃত, কিন্তু তা নয়। তিনজন যদিও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট, তাহলেও তাঁরা আসলে এক ও অভিন্ন। এই বিষয়ে হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলোচনা করে দেখেছি, তাঁরা এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে তা থেকে তাঁদের পরিষ্কার মতামত কি তা জানা যায় না।[৭] তাঁরা বলেন যে তিনজন একই

৭। মুইর তাঁর '*Original Sanskrit Texts*'-এর মধ্যে এ-সম্বন্ধে যা উদ্ধৃত করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মনে হয়:

'I shall declare to thee that from composed of Hari and Hara (Vishnu and Mahadeva) combined, which is without beginning, middle or end, imperishable, undecaying. He who is Vishnu is Rudra; he who is Rudra is Pitamaha (Brahma); the substance is one, the gods are three: Rudra, Vishnu and Pitamaha'—Muir's *Original Sanskrit Texts*, Vol. IV, p. 237

ভগবানের অংশবিশেষ এবং তাঁরা দেবতা। কিন্তু 'দেবতা' বলতে তাঁরা ঠিক কি বোঝেন তা বলা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিত যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তাঁরাও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে তিনজনই একই দেবতা, কেবল তিন রূপে কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। একজন সৃষ্টিকর্তা, একজন ত্রাণকর্তা, একজন সংহারকর্তা।

আমার সঙ্গে রোমভাবেও রোয়া বা রথের (Father Heinrich Roth) পরিচয় হয়। জার্মান জেসুইট ফাদার রথ তখন আগ্রায় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁর মতন পণ্ডিত বিদেশীদের মধ্যে তখন কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। তিনি বলেন যে, এক দেবতার তিন রূপের কল্পনা নয় শুধু, দ্বিতীয়জনের অর্থাৎ বিষ্ণুর আবার দশাবতার রূপ আছে। এই দশাবতার রূপ সম্বন্ধে যেটুকু তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে এবং অন্য পাদ্রীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, তা আমাকে বললেন। পৃথিবীতে এক-এক বার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে পৃথিবী। যতবার এরকম যুগসঙ্কট দেখা দিয়েছে, ততবার দেবতা বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারের রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মানুষকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এরকম ন'বার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, এবং ন'বার বিষ্ণু নয় অবতারের রূপে আবির্ভূত হয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য।[৮] বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে আবির্ভাবের কাহিনীটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর (কৃষ্ণাবতার)। পৃথিবীতে দৈত্যদানবের প্রতিপত্তি যখন খুব বেড়ে গেল, তখন এক কুমারীর গর্ভে মধ্যরাত্রে বিষ্ণু অবতাররূপে জন্ম নিলেন। দেবদূতরা তাঁর আবির্ভাবে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্যোৎসব করল। সারারাত ধরে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল অনর্গল। কাহিনীর সঙ্গে খ্রীস্টানদের পৌরাণিক কাহিনীর যেন বেশ

৮। বার্নিয়েরের 'অবতার' সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে পাঠকরা হয়ত কৌতুকবোধ করবেন। কিন্তু একজন বিদেশী বিভাষী পর্যটকের পক্ষে এত গভীরভাবে হিন্দুধর্মের মর্মকথা উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্যে যে আন্তরিকতার পরিচয় আছে, তা সত্যই অতুলনীয়। অনেক বিষয়ে বার্নিয়েরের অস্পষ্ট ধারণা হলেও, তিনি যে হাস্যকর বিপরীত ধারণা করেছিলেন, তা নয়। তাঁর ধারণার অনেকটাই সত্য। ঠিক যে তিনি বুঝতে পারছেন না, এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েই তিনি লিখেছেন। 'অবতার' রূপ সম্বন্ধে বার্নিয়ের যা বলতে চেয়েছেন, তার চমৎকার ব্যাখ্যা 'গীতা'য় করা হয়েছে। যেমন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাদৃশ্য আছে মনে হয়। যাই হোক, কাহিনীটা বলি। অবতাররূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে, দানবের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন বিষ্ণু। দানবের বিশাল মূর্তি আকাশের সূর্যকে আচ্ছাদন করে ফেলল। অন্ধকার হয়ে গেল পৃথিবী। বিষ্ণুর অবতার তাকে বধ করলেন। ভূপৃষ্ঠে আছাড় খেয়ে পড়ল যখন দানব, তখন কেঁপে উঠল সারা পৃথিবী। মাটি ফুঁড়ে রসাতলে নরকে প্রবেশ করল দৈত্য। অবতার আবার ঊর্ধ্বে স্বর্গে চলে গেলেন। হিন্দুরা বলেন, বিষ্ণুর দশম অবতার মুসলমান যবনদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। একথা শাস্ত্রে লেখা নেই অবশ্য, এমনি প্রচলিত কিংবদন্তী।

হিন্দুরা বলেন যে, তৃতীয় দেবতা মহাদেবেরও পৃথিবীতে আবির্ভাবের কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই: এক রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হল, তখন রাজা একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি রকম পতি সে বরণ করতে চায়। কন্যা উত্তর দিল যে, দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে সে পতিরূপে বরণ করবে না। কন্যার এই উত্তর শুনে মহাদেব অগ্নিরূপে আবিভূ‍ত হলেন এবং রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা তার কন্যাকে মহাদেবের প্রস্তাবের কথা বললেন এবং কন্যাও সম্মতি জানাল বিনা দ্বিধায়। মহাদেব অগ্নিরূপেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন এবং যখন দেখলেন যে সভাসদরা বিবাহের বিরোধিতা করছেন তখন তিনি তাঁদের দাড়িতে প্রথম আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর তাঁদের দগ্ধ করে ভস্ম করলেন। রাজকন্যার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হল।[৯] বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে হিন্দুরা বলেন যে প্রথমে বিষ্ণু সিংহরূপ ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় রূপ বরাহের, তৃতীয় কূর্মের, চতুর্থ নাগের পঞ্চম হ্রস্বকায় বামনের, ষষ্ঠ নরসিংহের, সপ্তম ড্রাগনের, অষ্টম কৃষ্ণের, নবম হনুমানের, এবং দশম বীর অশ্বারোহীর।[১০]

৯। গিরিরাজ হিমালয়দুহিতা উমার সঙ্গে মহাদেবের শুভবিবাহের উপভোগ্য বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ের।

১০। বার্নিয়ের অনেক চেষ্টা করে বিষ্ণুর দশাবতার রূপ সম্বন্ধে যা নিজে বুঝেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন এখানে। বর্ণনাটি উপভোগ্য হলেও, যথার্থ নয়। কিন্তু তাহলেও তিনি যে অনেকটা নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছেন তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। বিষ্ণুর 'দশাবতার' রূপের এই সংস্কৃত শ্লোকটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত:

মৎস্যঃ কূর্মো, বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি তে দশ।

—অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম (পরশুরাম), রাম (দাশরথি রাম), রাম (বলরাম), বুদ্ধ ও কল্কি—এই হল বিষ্ণুর দশাবতার।

রেভারেণ্ড রথ যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা যে সত্য, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরই কাছ থেকে শোনা পুরাণকাহিনী আমি এখানে বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে অনেক বেশি লিখে ফেলেছি আমি, এবং হিন্দুদের দেবদেবী বা দেবমূর্তি যা তাদের দেবালয়ে দেখেছি, তা স্কেচ করে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, তাদের দেবভাষা যে সংস্কৃতভাষা তাও আমি নক্‌শা করে নিয়েছি। ফাদার কার্কারের (Father Kirker) *China Illustrata*-গ্রন্থে এ সব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১১] এখানে তার পুনরাবৃত্তি আর করব না। ফাদার রথ যখন রোমে ছিলেন তখন কার্কার তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। আমার মনে হয়, ঐ বইখানি যদি একবার আপনি পড়েন তাহলে অনেক কথা জানতে পারেন। 'অবতার' সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলে শেষ করি। ফাদার রথ যেভাবে 'অবতার' কথার প্রযোগ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। একদল পণ্ডিত 'অবতার' কথার এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন: দেবতারা বিভিন্ন অবতারের রূপ ধরে মর্তধামে অবতীর্ণ হন এবং নানারকম দৈবশক্তি ও কার্যকলাপের পরিচয় দিয়ে বিদায় নেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন: পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও বীর যাঁরা তাদের মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোনো দেহের ভিতরে আশ্রয় নেয়। তখন সেই দেহ এক ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করে সেই আত্মার সংস্পর্শে। মহামানবদের আত্মা এইভাবে যখন ভিন্ন দেহান্তর্গত হয়, তখনই সে দেবতার রূপ ধারণ করে। আত্মার সঙ্গে দেবতার যে একটা সম্পর্ক আছে একথা হিন্দুরা যে ভাবেই হোক, স্বীকার করেন। মানবাত্মা দেবতারই অংশবিশেষ, এই হল হিন্দুদের ধারণা।

কোনো কোনো পণ্ডিত অবতারবাদের আরও সূক্ষ্ম জটিল ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা

১১। ফাদার কার্কারের *China Illustrata*-গ্রন্থ আমস্টার্ডামে ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত অক্ষরের পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা তাম্রখোদাই প্রতিলিপি ছাপা হয়। ইয়োরোপে সংস্কৃত অক্ষর প্রথম মুদ্রিত হরফে এই গ্রন্থেই ছাপা হয়। তার আগে আর-কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হরফে সংস্কৃতভাষা রূপায়িত হয়নি। হবার কথাও নয়, কারণ ১৬৬৭ সালে মুদ্রণের সামান্য প্রচলন হয়েছিল মাত্র। আমাদের দেশে তখনও মুদ্রণ ও মুদ্রিত হরফে বই ছাপা আরম্ভ হয়নি। সুতরাং *China Illustrata*-গ্রন্থের এই পাঁচ পৃষ্ঠা সংস্কৃত মুদ্রিত হরফের তাম্রখোদাই প্রতিলিপি হল, সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রকাশিত সংস্কৃত মুদ্রিত হরফের নমুনা। পাদ্রী কার্কার উর্জবুর্গ 'Wurtzburg' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার (Oriental Languages) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ফাদার কার্কার আদিযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

বলেন যে, দেবতার বিভিন্ন অবতারের কল্পনা তাঁর বিভিন্ন গুণাগুণ প্রকাশের কৌশল মাত্র। অবতার কথার এ ছাড়া কোনো শব্দগত আভিধানিক অর্থ নেই। আধ্যাত্মিক অর্থে অবতার কথার তাৎপর্য বুঝতে হবে। খুব বিচক্ষণ পণ্ডিতের মধ্যে কেউ-কেউ বলেন যে, অবতারের কল্পনার মতন আজগুবি কল্পনা আর হয় না। শাস্ত্রকাররা এই সব আজগুবি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, সাধারণ লোককে ধর্মের আওতার মধ্যে রাখবার জন্য। তারা বলেন যে, মানুষের আত্মা যদি দেবতার অংশবিশেষ হয় তাহলে অবতারের সমস্ত কল্পনা অর্থহীন হয়ে যায় এবং ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যেন আমরাই আমাদের পূজার্চনার জন্য নানারকম ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছি, দেবদেবীর কল্পনা করেছি। তা হয় না। অবাস্তব কথা ও অর্থহীন যুক্তি।

পাদ্রী কার্কার ও রথের কাছে হিন্দুধর্মের এই বিবরণের জন্য যেমন আমি বিশেষভাবে ঋণী, তেমনি মশিয়ে লর্ড ও আব্রাহাম রোজারের কাছেও আমার ঋণ কম নয়।[১২] এই পাদ্রী পণ্ডিতদের মূল্যবান গ্রন্থাদি থেকে হিন্দুস্থানের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উপকরণ আমি সংগ্রহ করেছি কিন্তু তাঁরা যতটা পরিশ্রম করে দীর্ঘ ধরে সেগুলির সুবিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হবে না। এখানে তাদের সেই বিবরণ থেকে আমি যতটা সম্ভব হিন্দুদের বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলব।

সংস্কৃতচর্চা ও কাশীধামের কথা

গঙ্গানদীর তীরে কাশী। যেমন তার প্রাকৃতিক অবস্থান, তেমনি মনোরম পরিবেশ। এই কাশী বা বারাণসীই হল হিন্দুদের সংস্কৃতবিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার

১২। সুরাটের চ্যাপলেন ছিলেন হেন্‌রী লর্ড (Henri Lord)। তিনি এ-সব বিষয়ে কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (ক) A *A Display of two Forraigne Sects in the East Indies*; (খ) *A Discoverie of the Sect of the Banians*; (গ) *The Religion of the Persees.* (Imprinted at London for Francis Constable, and are to be sold at his Shoppe in Paule's Churchyard, at the signe of the Crane, 1630)

আব্রাহাম রোজার (Abraham Rozer) পুলিকাটের প্রথম ডাচ চ্যাপলেন ছিলেন (১৬৩১-১৬৪১ খ্রীঃ অঃ)। ভারতের আদি ডাচ উপনিবেশের গির্জার প্রথম চ্যাপলেন রোজারও ধর্মবিষয়ে বই লিখেছিলেন। ১৬৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই প্রকাশিত হয়।

প্রধান কেন্দ্র। 'It is the Athens of India, whither resort the Brahmans and other devotees, who are the only persons who apply their minds to study' এই বারাণসীই হল ভারতবর্ষের এথেন্স। এই বারাণসীতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভক্তদের সমাগম হয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমাগমস্থল। ব্রাহ্মণরাই মনপ্রাণ দিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শহরের মধ্যে আমরা কলেজ বা স্কুল বলতে যা বুঝি আজকাল তা নেই। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় থাকে, তার অধীন স্কুল-কলেজ থাকে, তেমন কিছু নেই বারাণসীতে। বিদ্যালয় যা আছে তা প্রাচীন যুগের বিদ্যালয়ের মতন। গুরুমশাই ও শিক্ষকরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বা শহরের বাইরে থাকেন, এবং প্রধানত বণিকরাই থাকেন শহরের মধ্যে। গুরুমশায়ের কাছে থেকে ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করে। সব গুরুমশায়ের ছাত্র সংখ্যা সমান নয়। কারও ছাত্রসংখ্যা মাত্র চারজন কারও পাঁচ-ছয়জন, আবার কারও বারো কি পনেরোজন। তার বেশি ছাত্র কারও নেই। ছাত্ররা সাধারণত দশ বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত গুরুর কাছে থাকে এবং সেই সময় গুরুমশাই তাদের ধীরে ধীরে নানা শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন। ধীরে সুস্থে শিক্ষা দেন, তার কারণ সাধারণত দেখা যায় গুরুমশাইরা খুব যে পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর, তা নন। ধীরে সুস্থে, মন্থর গতিতে তাঁরা সব কাজকর্ম করেন। এর কারণ বোধ হয় তাদের বিশেষ খাদ্য এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্য। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপের মধ্যে, এ ধরনের খাদ্য খেয়ে, খুব বেশি কাজকর্ম করা যায় বলে মনে হয় না। ছাত্রদের মধ্যে কোনো পরীক্ষালব্ধ সম্মান বা কৃতিত্বের জন্য কোনো প্রতিযোগিতা রেষারেষি বলে কিছু নেই, যেমন আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে আছে। শিক্ষার্থীরা সেইজন্য গুরুমশায়ের কাছ থেকে শান্ত সংযতভাবে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে এবং অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। স্থানীয় ধনিক ও বণিকরাই সাধারণত তাদের ভোজ্য-দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেন এবং তারা খিচুড়ির মতন খুব সাদাসিধে খাদ্য পেলেই খুশী হয়।

প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয় সংস্কৃতভাষা। এই সংস্কৃতভাষা নাকি এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা ছাড়া অন্য কেউ ভাল জানেন না এবং হিন্দুস্থানের লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করে তার সঙ্গে এই ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এই সংস্কৃতভাষার অক্ষরই প্রথম পাদ্রী কার্কার মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করেন, পাদ্রী রথের সাহায্যে। 'সংস্কৃত' কথার অর্থ হল যা অমার্জিত বা রূঢ় নয়, অর্থাৎ যা

পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ, এ রকম একটি ভাষা। হিন্দুদের বিশ্বাস, ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে চতুর্বেদ সৃষ্টি করেন যে ভাষায়, সেই ভাষা হল সংস্কৃতভাষা। সেইজন্য সংস্কৃতভাষা হিন্দুরা দেবভাষা ও বিশুদ্ধ পবিত্র ভাষা বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা ব্রহ্মার মতনই এই সংস্কৃতভাষা অনাদি ও অনন্ত। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আজগুবি কথায় অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না। সংস্কৃতভাষা যে প্রাচীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সংস্কৃতভাষায় রচিত হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে রীতিমত প্রাচীন গ্রন্থও অনেক আছে। দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র এবং অন্যান্য আরও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচিত হয়েছে। কাশীতে এই সব সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের বিশাল একটি পাঠাগার রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা পারদর্শী হবার পর তারা 'পুরাণ' পাঠ করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে বেশ খানিকটা দখল না থাকলে 'পুরাণ' পাঠ করা বা অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। বেদের সারকথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে পুরাণের মধ্যে বলা হয়েছে।* বেদ চারটি গ্রন্থ, অন্তত আমি যে বেদ কাশীতে দেখেছি তা সত্যিই যদি বেদ হয়, তাহলে তার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। 'বেদ' এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ গ্রন্থ যে আমার আগা দানেশমন্দ খাঁ অনেক চেষ্টা করেও এক কপিও সংগ্রহ করতে পারেননি। হিন্দুরা অত্যন্ত সাবধানে বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ লুকিয়ে রেখে দেয়, কারণ তাদের ধারণা মুসলমানরা জানতে পারলে সব পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে।

পুরাণপাঠ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীরা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করে। দর্শনশাস্ত্র খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনা রীতিমত কঠিন। তার উপর স্বভাব-শৈথিল্যও শিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। ইয়োরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বা শিক্ষক অধ্যাপকরা যে-রকম তৎপর, হিন্দুস্থানের টোলের গুরুমশাই বা ছাত্ররা তা নন। তার কারণ আগেই বলেছি। সবক্ষেত্রে এখানকার গতিটাই মন্থর।

হিন্দুস্থানে যে-সব খ্যাতনামা দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছয়-জনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ছয়জন দার্শনিকের অনুগামীদের নিয়ে ছয়টি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা মনে করেন, তাঁদের অনুসৃত দর্শনই অভ্রান্ত এবং একমাত্র সত্য দর্শন, বেদই তার

* পুরাণের সঙ্গে বেদের এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা ঠিক নয়।—অনুবাদক।

উৎস।[১৩] এছাড়া আরও একটি সপ্তম ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাঁদের 'বৌদ্ধ' (বার্নিয়েরের ভাষায়—'Baute') বলা হয়। বৌদ্ধরা নাকি আবার দ্বাদশটি শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। যাই হোক, এখন আর বৌদ্ধদের তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, হিন্দুস্থানে সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকরা ভয়ানক ঘৃণা ও উপেক্ষা করে এবং তাদের নাস্তিক ও ধর্মজ্ঞানহীন বলে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। বৌদ্ধরা এখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিচিত্র জীবন যাপন করে।[১৪]

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেই মূল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং এক-এক জন শাস্ত্রকার এক-এক ভাবে করেছেন। কারও পদ্ধতি ও রীতির সঙ্গে অন্য কারও কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ বলেন প্রত্যেক বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গঠিত। এই সব সূক্ষ্ম পদার্থ অবিভাজ্য, নাবেট বলে নয় কণার মতন ক্ষুদ্রতম বলে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন শাস্ত্রকার, যা শুনলে ডেমক্রিটাস (Democritus) ও এপিকিউরাসের (Epicurus) কথা মনে হয়। কিন্তু মতামতগুলি এমন শিথিল অসংলগ্ন ভঙ্গীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে সব কথা, সব যুক্তিতর্কই নিতান্তই ভাসা-ভাসা মনে হয়, কোনো অর্থ কিছু বোধগম্য হয় না বিশেষ। আর পণ্ডিতরা এমন সংস্কারগ্রস্ত ও অজ্ঞ এসব বিষয়ে যে এই দুর্বোধ্যতার জন্য কারা দায়ী, শাস্ত্রকাররা, না তাদের ভাষ্যকার এই পণ্ডিতেরা—তা সঠিক বলা যায় না।

কোনো দার্শনিক বলেন—উপাদান ও রূপ, এই নিয়েই জগৎ। এর বেশি কিছু তাঁদের বক্তব্য বোঝা যায় না এবং কোনো পণ্ডিতই ব্যাখ্যা করে বুঝতে চান না। উপাদানটা কি বস্তু এবং রূপই বা কি, তা তাঁরা কখনও বুঝিয়ে বলবেন না। আমার মনে হয়, ভাষ্যকার পণ্ডিতরা এ সব কথার তাৎপর্য নিজেরা কিছু জানেন না বা বোঝেন না। যদি জানতেন বা বুঝতেন, তাহলে আমাদের

১৩। বার্নিয়ের এখানে হিন্দুদের 'ষড়্দর্শনে'র কথা বলছেন। এই ষড় দর্শন হল: সাংখ্য ও যোগদর্শন, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন, এবং বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শন। কপিল সাংখ্যের, পতঞ্জলি যোগ-দর্শনের কণাদ বৈশেষিকের, গৌতম ন্যায়দর্শনের এবং বাদরায়ণ বেদান্ত বা উত্তর-মীমাংসার, জৈমিনি মীমাংসা বা পূর্ব-মীমাংসার প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত।

১৪। ভারতের বৌদ্ধদের সম্বন্ধে বার্নিয়েরের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কি অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, বার্নিয়েরের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেশের দার্শনিকদের মতন সেটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করতেন। উপাদান থেকেই রূপের জন্ম—এ কথা বোঝাবার জন্য তাঁরা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত দেন। অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন কাদামাটি থেকে মাটির পাত্রকে নানা ভাবে রূপ দেয়, তেমনি বিশ্বের বাস্তব উপাদান থেকে নানা রূপ সৃষ্টি করেন ভগবান।

কেউ বলেন যে শূন্য থেকে সবকিছুর উৎপত্তি এবং চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে সবকিছু গঠিত। কিন্তু শূন্যবাদ বা উপাদানে রূপান্তর সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাঁরা করতে পারেন না। যে-ব্যাখ্যা তাঁরা করেন, তা কারও বোধগম্য হয় বলে মনে হয় না।

কেউ বলেন, আলোক ও অন্ধকারই আসল, কিন্তু আসল তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁরা যে ভাবে করেন তা সত্যিই হাস্যকর। এমন যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বোঝাতে চেষ্টা করবেন এবং এমন লম্বা বক্তৃতা দেবেন যে তার ভিতর থেকে কোনো সারবস্তু কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনেকে আবার সাধনা, তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, উপবাস ইত্যাদির উপর এমন গুরুত্ব আরোপ করেন যে মনে হয় যেন ঐগুলিই চরম সত্য। একটা দীর্ঘ তালিকা তাঁরা আওড়ে যাবেন। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে কোনো বিচক্ষণ শাস্ত্রকার এসব কথা শাস্ত্রগ্রন্থে বলে যাননি। এত তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা কোনোকালে মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না।

অনেকে আবার এমন কথাও বলেন যে সবই দৈব বা অদৃষ্টচক্র মাত্র। এ ছাড়া আর কোনো জীবনদর্শনে তাঁরা বিশ্বাসী নন। তাঁরাও এমন সব কথা বলবেন যা শুনলেই বোঝা যায় যে কোনো শাস্ত্রকার কোনোকালে তা বলেননি।

এই সব দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে এগুলি সনাতন। এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়েছে, একথা প্রাচীন দার্শনিকদের মনে জাগেনি, হিন্দু দার্শনিকদের মনেও না। একজন হিন্দু দার্শনিক নাকি এ-সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন।[১৫]

১৫। বার্নিয়ের এখানে পূর্বোক্ত ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন সংক্ষেপে। কিন্তু সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শন যে এত সহজে ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তবু সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে হিন্দুদর্শনের নানা দিক সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহলী হয়ে তার মূল তত্ত্বকথা জানার চেষ্টা কম প্রশংসনীয় নয়। এর মধ্যে বার্নিয়েরের অদম্য আগ্রহ ও জাগ্রত অনুসন্ধানী মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা শ্রদ্ধার যোগ্য।

হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা

শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই ঔষধ ও পথ্যের তালিকা ছাড়া কিছু নয়। শারীরাবস্থার বা তত্ত্বের কোনো আলোচনা তার মধ্যে করা হয়নি। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানি পদ্যে লেখা। হিন্দুদের চিকিৎসা-প্রথার সঙ্গে আমাদের প্রথার পার্থক্য অনেক। কয়েকটি মূলনীতির উপর তাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি গঠিত। নীতিগুলি এই :

(ক) রোগীর অসুখ হলে তার পুষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই

(খ) অসুখের প্রধান চিকিৎসা হল উপবাস,

(গ) মাংসের কাথ ইত্যাদি রোগীর পথ্য নয়। অসুস্থ রোগীর এই জাতীয় পথ্য বিষবৎ বর্জনীয়

(ঘ) বিশেষ প্রয়োজন না হলে রোগীর দেহ থেকে রক্ত নেওয়া উচিত নয়।

এই চিকিৎসাপদ্ধতি সঙ্গত কি না, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তা বিচক্ষণ চিকিৎসকরা বিবেচনা করে দেখবেন। আমার বক্তব্য হল এই চিকিৎসা পদ্ধতি হিন্দুস্থানে বেশ ফলপ্রদ হয়েছে দেখা যায়। শুধু হিন্দুরা নয়, মোগল ও অন্যান্য মুসলমান চিকিৎসকরা এই একই পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করেন। উপবাস করতে হবে অসুখ হলে, একথা সকল শ্রেণীর চিকিৎসকরাই স্বীকার করেন। মোগল চিকিৎসকরা হিন্দুদের চেয়ে রোগীর দেহ থেকে রক্ত-নিষ্কাশনের পক্ষপাতী বেশি বলে মনে হয়। মাথার অসুখ লিভার বা কিডনীর কোনো অসুখের সম্ভাবনা থাকলে তাঁরা রোগীর দেহ থেকে রক্ত বার করে নেন। গোয়া বা প্যারিসের ডাক্তাররা যেভাবে অল্পস্বল্প করে নেন, মোগল চিকিৎসকরা তা করেন না।[১৬] তাঁরা প্রাচীন চিকিৎসকদের মতন এক-একজন রোগীর দেহ থেকে আঠার থেকে বিশ আউন্স পর্যন্ত রক্ত নিষ্কাশন করেন এবং তার ফলে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এইভাবে তাঁরা বলেন যে রোগীর দেহ

ষড়্‌দর্শনের ব্যাখ্যা। তার অনেকটাই শাস্ত্রকর বলে গণ্য হলেও তিনি তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি ও দৃষ্টি দিয়ে তার প্রত্যেকটি প্রতিপাদ্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

১৬। এই সময় গোয়ার চিকিৎসকরা বিশেষ মর্যাদা পেতেন এবং তার জন্য মাথায় ছাতি ধরে তাঁরা চলতে পারতেন। মাথায় ছাতি দিয়ে চলার অধিকার এককালে সকলের ছিল না। বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিরা সেই অধিকার অর্জন করতেন। গোয়ার ডাক্তারদের সম্বন্ধে জনৈক পর্যটক

থেকে বদরক্ত বার করে দিলে যে-কোনো বিষাক্ত রোগই হোক না কেন গোড়াতেই তার মূলে আঘাত করা হয় এবং রোগের দ্রুত উপশম হয়।

হিন্দুরা শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যে একেবারে অজ্ঞ তাতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষের শরীরের ভিতরের গড়ন স্বচক্ষে না দেখলে, শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা জ্ঞান হওয়াও সম্ভব নয়। হিন্দুরা কোনোদিন কোনো রোগীর দেহের মধ্যে অস্ত্রোপচার করেন না। তাঁরা দেখেননি কোনোদিন দেহের মধ্যে কি আছে, না-আছে। মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জন্তু-জানোয়ারের দেহও এইজন্য তাঁরা কোনোদিন কেটেকুটে দেখেননি। মধ্যে মধ্যে আমি যখন কোনো ছাগল বা ভেড়ার দেহ চিরে কেটে আমার মনিব আগাকে দেহের মধ্যে রক্তচলাচলের পদ্ধতির ব্যাখ্যা করতাম, তখন হিন্দুরা ভয়ে ও বিস্ময়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন। যাঁরা শরীরের ভিতর একটি শিরার দিকেও কোনোদিন চেয়ে দেখেননি, তাঁরা মানুষের দেহে কতগুলি শিরা-উপশিরা আছে, তা মুখস্থ বলে দিতে পারেন। হিন্দুরা বলেন, মানুষের শরীরে পাঁচ হাজার শিরা উপশিরা আছে একটিও বেশি বা কম নেই। যেন প্রত্যেকটি শিরা দেখে-দেখে তাঁরা গুণে রেখেছেন মনে হয়।

হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও হিন্দুদের নিজস্ব গণনা-পদ্ধতি আছে এবং সেই গণনানুসারে তারা গ্রহণাদির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্বিদদের মতন তাঁদের গণনা একেবারে নির্ভুল না হলেও অনেকটা যে নির্ভুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রহণাদি সম্পর্কে তাদের যা যুক্তি তার সঙ্গে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ একই কারণে হয় এবং কোনো দানব বা রাক্ষস সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলে। এই সময় কতকগুলি নিয়ম না পালন করলে মানুষের অমঙ্গল হতে পারে, এই তাঁদের বিশ্বাস। এখানকার জ্যোতির্বিদদের ধারণা, সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ। চন্দ্র জ্যোতির্ময় পদার্থ-বিশেষ। চন্দ্র থেকে মানুষের দেহে যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে আসে তাই প্রথম মগজে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে দেহের অন্যান্য

বলেছেন: 'There are in Goa many Heathen phisitions which observe their gravities with hats carried over them for the sunne, like the Protingales, which no other heathens doe, but (onely) Ambassadors, or some rich Marchants;' (*Voyage to the East Indies*—Hakluyt Soc. ed., 1885, Vol I, P. 230)

অংশে সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত শরীরটাকে সক্রিয় ও তেজোদ্দীপ্ত করে রাখে। হিন্দু জ্যোতিষীদের ধারণা হল—সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র দেবতা-বিশেষ। তাদের দৈবশক্তি আছে। সুমেরুর অন্তরালে সূর্যদেব যখন বিশ্রাম গ্রহণ করেন তখন বাইরের জগতে অন্ধকার নামে এবং রাত্রি হয়। এই সুমেরু পর্বত, তাঁরা বলেন, পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, দেখতে কতকটা উল্টানো পাঁউরুটির মতন এবং তার চূড়া যে কত লক্ষ ক্রোশ দূরে তার হিসেব নেই! সুতরাং তার অন্তরালে সূর্যদেব যখন লুকিয়ে থাকেন, তখন বাইরের পৃথিবীতে আলো প্রবেশ করে না।

হিন্দুদের ভৌগোলিক ধারণা

জ্যোতিষের মতন ভূগোল সম্বন্ধেও হিন্দুদের নানারকমের বিচিত্র ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁদের মতে পৃথিবীটা গোলাকার নয়, চ্যাপটা ত্রিকোণাকার। পৃথিবীতে সাতটি 'লোক' আছে এবং প্রত্যেকটি লোক সাগরবেষ্টিত। সাগরও একরকমের নয় নানারকমের। কোনো সাগর দুধের সাগর, কোনোটা চিনির, কোনোটা ননীর, কোনোটা বা সুরার ইত্যাদি। দুগ্ধসাগর, শর্করাসাগর সুরাসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন সাগরবেষ্টিত লোকে এক এক শ্রেণীর অতিমানুষ ও মানুষের বসবাস আছে। এইভাবে সাগর ও মৃত্তিকার সাতটি স্তর বা বেষ্টনী নিয়ে পৃথিবী গঠিত এবং তার মধ্যস্থলে সুমেরু পর্বত। প্রথম স্তরে, সুমেরুর শিখরের কাছে বড়-বড় দেবতাদের বাসস্থান ; দ্বিতীয় স্তরে ছোট-ছোট অসংখ্য দেবতারা বাস করেন। তাঁরা মানুষের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু বড়-বড় দেবতাদের মতন শক্তিশালী নন। এইভাবে পর-পর ছয়টি স্তরে অনেক রকম দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতাদের বাস আছে। সপ্তম স্তরে মানুষের বাস। এই সপ্তম স্তরই হল মর্ত্যলোক বা মাটির পৃথিবী। তাছাড়া, হিন্দুদের ধারণা, এই পৃথিবীটা অসংখ্য হাতির পিঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাতিগুলো যখন দোলে তখন পৃথিবীটাও দোলে, ভূমিকম্প হয়।

হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এতদিন আমরা তাদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেছি। সত্যই এটা ঠিক কি-না, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে এরকম ধারণা করা সঙ্গত কি-না, আমি এখনও বলতে পারব না। সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দুশাস্ত্রকাররা এই সব শাস্ত্রবিদ্যার চর্চা করে আসছেন এবং তাঁদের

শাস্ত্রও সংস্কৃতের মতন প্রাচীন ভাষায় রচিত। এতকালের প্রাচীন ঐতিহ্যকে হঠাৎ অপাংক্তেয় বলে বর্জন করাও কঠিন। খুব মুশকিলে পড়তে হয় এই জন্য। যাই হোক, এখন আমি হিন্দুদের দেবদেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

হিন্দু দেবদেবীর কথা

গঙ্গা নদী ধরে যেতে-যেতে আমি বারাণসীতে পৌঁছলাম। বারাণসীতে পৌঁছে সেখানকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বারাণসী প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র বলেও হিন্দুদের কাছে প্রসিদ্ধ। যে পণ্ডিতের কথা আমি বলছি তিনি তখনকার আমলে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। ফকির বা সাধকের মতন তিনি থাকতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের এমন খ্যাতি ছিল যে, তিনি সেইজন্য সম্রাট সাজাহানের কাছ থেকে বাৎসরিক দু'হাজার টাকার মতন বৃত্তি পেতেন। বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ চেহারা তাঁর। সাদা সিল্কের কাপড় আর গায়ে লাল সিল্কের চাদর জড়িয়ে থাকতেন তিনি। দিল্লীতে মধ্যে-মধ্যে এই পণ্ডিত মশাইকে আমি এই পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। রাজদরবারে বাদশাহের সামনেই হোক, বা ওমরাহদের কাছেই হোক, সব সময় তিনি এই পোশাক পরে হাজির হতেন। পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করতেন, মধ্যে মধ্যে পালকিতেও চড়তেন। প্রায় এক বছর ধরে এই পণ্ডিতমশাই আমার মনিব দানেশমন্দ খাঁর কাছে যাতায়াত করেছিলেন। যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে ধরে সম্রাট ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে বৃত্তি আদায় করা। ঔরঙ্গজীব তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে তিনি আমাকে ধরে বৃত্তি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময়, যখন তিনি আমার মনিবের কাছে যাতায়াত করতেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তখন মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমি নানাবিষয়ে আলোচনাও করতাম। অনেক বিষয় নিয়ে তর্কও হত তাঁর সঙ্গে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে যখন বারাণসীতে আমার দেখা হল, তখন তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে আরও ছয়জন কাশীর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলোচনার ব্যবস্থা করে দিলেন।[১৭] পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার এরকম অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে

১৭। ১৬৬৫ সালে আগ্রা থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়েরের সঙ্গী ছিলেন ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের। ঐ বছরের ১১ই থেকে ১৩ই ডিসেম্বর তাভার্নিয়ের বারাণসীতে

আমিও প্রস্তুত হলাম। ঠিক করলাম হিন্দুদের দেবতাসম্বন্ধে আলোচনা করব। সভা যখন আরম্ভ হল তখন আমি তাঁদের বললাম 'হিন্দুস্থান থেকে আমি এই মূর্তিপূজা সম্বন্ধে ও বহুদেবতার পূজা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ধারণা নিয়ে চলে যাচ্ছি। যে-দেশে আপনাদের মতন এরকম বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা আছেন, সে দেশে এরকম বহুদেবতা ও মূর্তিপূজার প্রবল প্রচলন হয় কেমন করে আমি ভাবতে পারি না। আমাকে আপনারা বুঝিয়ে দিন, এই পূজার অর্থ কি?' এই কথার উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন

'আমাদের দেবালয়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে, যেমন ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, ভবানী ইত্যাদি (নামগুলি যথাক্রমে বার্নিয়ের এইভাবে লিখেছেন—Brahma Mehadeu, Genich, Gavani)। এঁরাই প্রধান দেবদেবী। এঁরা ছাড়াও আরও অনেক দেবদেবী আছেন যাদের হিন্দুরা পূজা করে নানাভাবে। এই সব দেবদেবীর মূর্তি আমরা পূজা করি ঠিক। সাষ্টাঙ্গে আমরা মূর্তির সামনে প্রণাম করি, ফুল, লতাপাতা নানারকমের চাল, ঘি তেল খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদির নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দিই, জাঁকজমক-সহকারে অনুষ্ঠান করি। সবই ঠিক। কিন্তু একথাও ঠিক যে যখন দেবতার মূর্তিকে আমরা এইভাবে পূজা করি, তখন সত্যই মনে করি না যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (Bechen) প্রমুখ দেবতা তা মনে করি না। তাদেরই প্রতিমূর্তি যে তা সব সময় মনে রাখি। সাক্ষাৎ দেবতা ভাবি না। কেবল সেই সব মূর্তি কোনো বিশেষ দেবতার রূপ বলে তার সামনে আমরা পূজা করি। মূর্তিকে করি না, দেবতাকেই করি। তবু কেন মূর্তি গড়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি এ প্রশ্ন করা বাইরের লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মন্দিরে আমরা মূর্তি গড়ে এইজন্য প্রতিষ্ঠা করি যাতে সাধারণ লোক সামনে কিছু চোখে দেখে, সেই দেবতার ধ্যান করে তার আরাধনায় মনোনিবেশ করতে পারে। এ ছাড়া মূর্তিপূজার আর কোনো কারণ নেই। সামনে একটা প্রত্যক্ষ মূর্তি থাকলে তার উপর মনপ্রাণ নিবদ্ধ করে প্রার্থনা করা অনেক সহজ হয়। তার জন্যই মূর্তির কল্পনা। আসলে মনে মনে সব সময় আমরা দেবতার

ছিলেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে (*Travels*, Vol II pp 234—235) লিখে গেছেন: প্রকাণ্ড একটি মন্দিরের কাছে একটি বিরাট গৃহ আছে কাশীতে। এই গৃহটিতেই রাজা জয়সিংহের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয়ে সম্বংশের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজকুমারদেরও আমি এই বিদ্যালয়ে পড়তে দেখেছি। তাঁরা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কাছে লেখাপড়া শেখেন এবং পুরোহিতদের ভাষা বা দেবভাষা সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেন।

পূজা করি এবং তিনি একই দেবতা ও ঈশ্বর, যে-রূপেই বা যে-মূর্তিতেই তাঁকে কল্পনা করি না কেন।'

কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা আমাকে যা বলেছিলেন তার হুবহু বিবরণ আমি দিলাম। একটি কথাও এর মধ্যে যোগ করিনি বা বাদ দিইনি। তবে আমার সন্দেহ হয় যে, আমাকে তাঁরা এইভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন আমি খ্রীস্টান বলে। তাঁরা যেভাবে বহুদেবতার পূজা ও মূর্তিপূজার ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তা এক দেবতার পূজা বলে মনে হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে তার যে পার্থক্য আছে তা বোঝা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে এই একই বিষয়ে যে রকম ব্যাখ্যা শুনেছি তাতে অন্যরকম ধারণা হয় মনে, অর্থাৎ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে দেখা যায়।

হিন্দুদের কালগণনা

দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনার পর আমি কালগণনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলাম। পণ্ডিতেরা এই ব্যাপারে আমাকে সব চেয়ে বেশি তাক লাগিয়ে দিলেন। কালগণনার এমন এক বিচিত্র হিসেব দাখিল করলেন তাঁরা যা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। হিন্দু পণ্ডিতেরা এমন কথা বলেন না যে সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে একথা তাঁরা স্বীকার করেন। কিন্তু তার এমন একটা হিসেব দেন যা আমাদের কাছে অসীম অনন্তকালের মতন মনে হয়। তাঁরা বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে কালগণনা করা হয়, এবং তাকে চারটি যুগে ভাগ করে। যুগ বলতে আমরা যা বুঝি, তাঁরা তা বোঝেন না (বার্নিয়েরের 'Dgugues'—যুগ)। যুগের হিসেব শতক বা সহস্রকের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মোটামুটি এক কোটি বছর করে তাঁরা প্রত্যেকটি যুগের হিসেব করেন। সঠিক কত বছর তা বলতে পারব না। প্রথম যুগের নাম সত্যযুগ (State-Dgugue)। সত্যযুগ প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর ছিল শোনা যায়। দ্বিতীয় যুগের নাম ত্রেতাযুগ (Trita Dguguc)। ত্রেতাযুগের অস্তিত্ব ছিল বারো লক্ষ বছর। তৃতীয় যুগের নাম দ্বাপর যুগ (Duapar-Dgugue)। দ্বাপর যুগ প্রায় আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর ছিল। চতুর্থ যুগের নাম কলিযুগ (Kale-Dgugue)। কলিযুগ যে কত লক্ষ বছর ধরে চলবে তা বলা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন যে প্রথম তিনটি যুগ—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—শেষ হয়ে গেছে এবং চতুর্থ, অর্থাৎ কলিযুগেরও অনেকটা কেটে গেছে। কলিযুগের পরে আর কোনো

যুগের অভ্যুদয় হবে না। এই চতুর্থ যুগই বর্তমান পৃথিবীর জীবনের শেষ পর্ব। কলিযুগেই সৃষ্টির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কলিযুগের শেষে পৃথিবী আবার তার প্রাথমিক স্তরে ফিরে যাবে, সৃষ্টির আদিকালের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। যতবার পণ্ডিতদের (Pendets) জিজ্ঞাসা করেছি যে পৃথিবীর বয়স কত, ততবার তাঁরা নানাভাবে অঙ্ক কষে, হিসেব করে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ একজনের সঙ্গে অন্যজনের হিসেব কিছুতেই মেলে না। মেলে না যখন তখন তাঁরা যা বলেছেন তা থেকে এইটুকু শুধু বুঝেছি যে, পৃথিবীটা এত প্রাচীন যে তার বয়সের কোনো হিসেব নেই। তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছি যে কোথা থেকে তাঁরা এইসব হিসেব পেলেন, তখন তাঁরা কেবল বেদের নাম করে চুপ করে থেকেছেন। 'সব বেদে আছে'—এই তাদের বক্তব্য। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁদের জন্য বেদ রচনা করে তার মধ্যে এইসব সারগর্ভ কথা বলে গেছেন।

দেবদেবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের কাছে জানবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। কেউ কেউ বলেন, দেবতা তিন রকমের আছেন—ভাল, মন্দ ও উদাসীন। কেউ বলেন দেবতাদের উপাদান অগ্নি, কেউ বলেন আলোক। আবার কেউ বলেন, দেবতা হলেন ব্যাপক (বার্নিয়েরের Biapek'—ব্যাপক)। ব্যাপক কথার অর্থ আমি সঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। যা 'ব্যাপক', তা নাকি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে এবং তার ধ্বংস হয় না। আবার এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন যে, দেবতারা হলেন পরমেশ্বরের অংশ মাত্র। কেউ বলেন, দেবতারা হলেন একজাতীয় 'দৈব' জীব যাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

সুফীদের ধর্ম ও দর্শন

এইবার সুফীদের সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। হিন্দুস্থানে সম্প্রতি এই সুফীদের মতবাদ ও দর্শন নিয়ে খুব একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেন যে, হিন্দু পণ্ডিতেরা নাকি সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারা শিকো ও সুলতান সুজার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা, আপনি জানেন, সৃষ্টির মধ্যে এক সনাতন প্রাণশক্তির সন্ধান করতেন এবং মনে করতেন যে জীব মাত্রই সেই অনাদি অনন্ত প্রাণশক্তির কণা-বিশেষ ছাড়া কিছুই নয়। দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্ততেল থেকে সকলেই প্রায় নানাভাবে এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। হিন্দু পণ্ডিতেরাও প্রায় এই একই কথা বলেন

এবং একই ধরনের মত পোষণ করেন। এই মতবাদই হল সুফীদেব মতবাদ এবং পারস্যেব পণ্ডিত ও দার্শনিকেরাও নাকি এই মতবাদ সমর্থন কবেন। পাবস্যের কাব্যে—গুলশান রাজে[১৮] এই মতবাদই চমৎকার ভাষায় প্রকাশ কবা হয়েছে।

হিন্দুস্থানের হিন্দুদেব এই সব বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যানধাবণা, ধর্মকর্ম, দেবদেবী, দশন বিজ্ঞান ইত্যাদি দেখে-শুনে এবং এত কষ্ট স্বীকাব কবে আমার মনে হয়েছে যে পৃথিবীতে এমন কোনো আজগুবি বা অবিশ্বাস্য মতবাদ নেই যা মানুষের কাছে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।*

১৮। 'গুলশান রাজ' কাব্য (Mystic Rose Garden) ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়, সুফীদের সম্বন্ধে পনেরটি প্রশ্নের উত্তর হিসাবে।

* এর পর বার্নিয়ের ঔরঙ্গজীবের কাশ্মীর অভিযানের কথা বলেছেন। তার অনুবাদ করার কোনো প্রয়োজন এখন আছে বলে আমার মনে হয় না। তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

সোনার বাংলা

[ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের বাংলাদেশে দু'বার এসেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি বণিকরা তখন বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করছেন এবং মোগল শাসনের বনিয়াদ ক্রমেই শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছে। এই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, পরবর্তী পরিবর্তনের ধারা সঠিকভাবে বোঝা কঠিন। বার্নিয়ের আমাদের প্রায় তিনশ' বছর আগে তখনকার বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের সুন্দর বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বার্নিয়েরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও, সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য তিনি পরিবেশন করে গেছেন। —অনুবাদক।]

বাংলাদেশের সম্পদ প্রসঙ্গে

যুগে-যুগে বিভিন্ন লেখকরা মিশর দেশকে চিরকাল সোনার দেশ বলে গেছেন। ফল-মূল-ফসলে-ভরা এ রকম দেশ নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এখনও অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাঁরা মনে করেন, মিশরের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এ রকম দেশ কোথাও নেই। কিন্তু বাংলাদেশে দু'বার বেড়াতে এসে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি তাতে আমার মনে হয় যে মিশর সম্বন্ধে এতদিন যা বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ধান চাল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে আশপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেওয়া হয় এখান থেকে। গঙ্গানদীর উপর দিয়ে নৌকাভরা ধান চালান যায় পাটনায় এবং সমুদ্রপথে যায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে, মুসলিপত্তমে ও করোম্যাণ্ডাল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে। বিদেশেও ধান চাল যায় বাংলাদেশ থেকে, প্রধানত সিংহলে ও মালদ্বীপে। ধান ছাড়াও বাংলাদেশে চিনি পাওয়া যায় প্রচুর এবং গোলকুণ্ডা কর্ণাট প্রদেশে এই চিনি চালান যায়। বাইরে আরব, মেসোপোতামিয়া ও পারস্য দেশ পর্যন্ত বাংলার চিনি রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশে নানা রকমের মিষ্টান্নও তৈরি হয়। মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। বাংলাদেশের যে-সব অঞ্চলে পর্তুগীজরা বসতি গড়ে তুলেছে, নানারকমের মিষ্টান্নের প্রচলন সেই সব অঞ্চলেই খুব বেশি দেখা যায়। তার একটা কারণ হল, পর্তুগীজরা খুব ভাল মিষ্টান্ন তৈরি করতে পারে, খুব সুদক্ষ ময়রা তারা। শুধু তাই নয়, মিষ্টান্নের

ব্যবসা তাদের অন্যতম ব্যবসা। এ ছাড়া লেবু, আম, আনারস প্রভৃতি ফলেরও ব্যবসা করে তারা।[১]

বাংলাদেশের আহার্যের প্রাচুর্য

বাংলাদেশে অবশ্য মিশরের মত গম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এটা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৈন্যের পরিচয় নয়। খুব বেশি গম বাংলাদেশে উৎপন্ন না হবার কারণ হল, বাঙালীরা গম তেমন পছন্দ করে না, গম তাদের প্রধান খাদ্যশস্যও নয়। বাঙালীরা ভাত খায়, তাই ধানের চাষই বেশি হয় বাংলায়। তাহলেও গম যে একেবারেই হয় না, তা নয়। যা হয় তাই যথেষ্ট। গম দিয়ে দেশী কারিগররা যে সব বিস্কুট তৈরি করে, ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগীজ নাবিক ও ব্যবসায়ীরা জাহাজে তাই তৃপ্তি করে খায়।[২] তিন-চার রকমের তরী-

১। পর্তুগীজরা যে ভাল মিষ্টান্ন তৈরি করতে পারত এবং মিষ্টান্নের ব্যবসা করত, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এ ছাড়া, আমাদের দেশের অধিকাংশ ফলফুলের কথাও আমরা পর্তুগীজরা আসার আগে জানতাম না। এ সম্বন্ধে ড° সুরেন্দ্রনাথ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *'History of Bengal'* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬৮ পৃষ্ঠা) যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

"It is seldom realised that many of our common flowers and fruits were totally unknown before the Portuguese came. 'The noxious weed that brings solace' to many and now forms a staple product of Rangpur was brought by the Portuguese, as was the common article of food, Potato—which is relished by princes and peasants alike. Tobacco and Potato came from North America. From Brazil they brought Cashewnut, which goes by the name of Hijli Badam, because it thrives so well in the sandy soil of the Hijli littoral . ...We are indebted to the Portuguese for Kamranga which finds so much favour with our children. To this list may be added Peyara, which found an appreciative poet in Monmohan Basu. The little Krishnakali that cheers our countryside in its yellow, red and white is another gift of the once dreaded Feringi."

২। একসময় আমাদের বাংলাদেশে যে যথেষ্ট দেশী বেকারী ছিল এবং বাঙালী কারিগররা (প্রধানত মুসলমান) যে নানা রকমের পাঁউরুটি বিস্কুট তৈরি করত, বার্নিয়ের তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বিস্কুটগুলোকে বার্নিয়ের "sea-biscuits" বলেছেন, তার কারণ তিনি জাহাজের ফিরিঙ্গী নাবিকদের একরকম দেশী বিস্কুট খুব বেশি খেতে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ধারণা হয়েছিল যে বিস্কুটগুলো বোধ হয় সমুদ্রযাত্রীদের জন্যই তৈরি হয়।

তরকারী, ভাত মাখন ইত্যাদিই হল বাঙালীদের প্রধান খাদ্য এবং খুব সামান্য মূল্যেই এই সব খাদ্য পাওয়া যায়। এক টাকায় কুড়িটার বেশি মুর্গী কিনতে পাওয়া যায়। হাঁসও খুব সস্তা। ছাগল ভেড়ার তো অভাব নেই। শুয়োরের দাম এত সস্তা যে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে প্রধানত শুয়োরের মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে। এই শুয়োরের মাংসই নুনে জারিয়ে ইংরেজ ও ডাচরা জাহাজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। নানা রকমের মাছ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বাংলাদেশে যে তা বলে শেষ করা যায় না। এককথায় বলা যায়, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের কোনো অভাব নেই বাংলাদেশে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের এই প্রাচুর্যের জন্যই পর্তুগীজ ও অন্যান্য খ্রীস্টানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বসতিকেন্দ্র থেকে ডাচদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এসে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে। অনেক খ্রীস্টান গির্জা আছে বাংলাদেশে এবং খ্রীস্টানদের স্বাধীন ধর্মানুষ্ঠানে কোনো বাধা নেই কোথাও। জেসুইট ও অগাস্টিন্ ধর্মযাজকদের মুখে শুনেছি যে কেবল হুগলীতেই নাকি আট-নয় হাজার খ্রীস্টানের বাস এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোট খ্রীস্টানের সংখ্যা হল হাজার পঁচিশ। বাংলাদেশের প্রতি খ্রীস্টানদের এই বিশেষ প্রীতির অন্যতম কারণ হল, বাংলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাঙালী মেয়েদের কোমল প্রকৃতি। এইজন্য পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি খ্রীস্টানদের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু আছে যে বাংলাদেশে আসার দরজা আছে একশটা, কিন্তু যাবার দরজা একটিও নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশে আসার আকর্ষণ আছে অনেক এবং একবার এলে আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণের কারণ

বাংলাদেশের প্রতি বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ হল, বাংলায় পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য বেশি। বাণিজ্যের উপযোগী এত রকমের সুন্দর সুন্দর পণ্য আর কোথাও উৎপন্ন হয় বলে মনে হয় না। চিনির কথা তো আগেই বলেছি এবং চিনির ব্যবসায়ের কথাও উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, তুলো ও রেশমের এত রকমের জিনিস তৈরি হয় বাংলায় এবং এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে এই বাংলা-দেশকে হিন্দুস্থানের কাপড়চোপড়ের প্রধান আড়ৎ বললে ভুল হয় না। শুধু হিন্দুস্থানের বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, প্রতিবেশী সমস্ত দেশের এবং ইয়োরোপেরও কাপড়চোপড়ের আড়ৎ হল বাংলাদেশ। সরু মোটা, সাদা রঙিন,

নানারকমের তাঁতের কাপড় তৈরি হয় বাংলায়। তাঁতের কাপড়ের এরকম প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমি কোথাও কখনও দেখিনি। দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। ডাচরা এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জাপানে ও ইয়োরোপে চালান দেয়। ইংরেজ ও পর্তুগীজ বণিকরা এবং দেশীয় বণিকরাও প্রধানত এই কাপড়ের ব্যবসায়ই করে। তাঁতের কাপড়ের মতন সিল্কের কাপড়ও প্রচুর তৈরি হয় এবং তার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। সিল্কের কাপড়ও বাংলাদেশ থেকে সব জায়গায় চালান যায়, লাহোরে, কাবুলে এবং ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে। পারস্য, সিরিয়া, সৈয়দ বা বৈরাটের সিল্কের মতন বাংলাদেশের সিল্ক খুব সূক্ষ্ম না হলেও, এত সুলভ মূল্যে সিল্ক কোথাও পাওয়া যায় না।

দেশের অভিজ্ঞ লোকদের মুখে শুনেছি, বাংলার তন্তুবায়দের প্রতি যদি আর একটু যত্ন নেওয়া হত এবং তাদের দিকে নজর দেওয়া হত, তাহলে অনেক সস্তায় আরও অনেক ভাল ভাল তাঁতের ও রেশমের কাপড় তারা তৈরি করতে পারত।[৩] ডাচদের কাশিমবাজারের রেশমকুঠিতে সাত-আটশ তাঁতি কাজ করে শুনেছি। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদেরও এরকম অনেক কুঠি আছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে সোরাও (Saltpetre) উৎপন্ন হয় প্রচুর। পাটনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সোরা আমদানিও করা হয়।[৪] গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকা করে সোরা চালান দেওয়ার সুবিধা খুব এবং বিদেশী বণিকরা এইভাবে সোরা হিন্দুস্থানের নানা অঞ্চলে চালান দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে গালা, মরিচ, আফিম, মোম প্রভৃতি নানারকমের ব্যবসায়ের জিনিস পাওয়া যায়। মাখনও প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে পাওয়া যায়। কিন্তু এত বড় বড় মাটির পাত্রে ঘি মাখন থাকে যে বাইরে চালান দেওয়া কষ্টকর। তবু সমুদ্রপথে বাইরে যথেষ্ট মাখন চালান দেওয়া হয়।[৫]

৩। বাংলাদেশের রেশমের কাপড়ের সুলভতা এবং বাঙালী তন্তুবায়দের প্রতি দেশের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সম্বন্ধে বার্নিয়েরের অভিমত প্রণিধানযোগ্য হলেও বাংলার রেশমের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয় বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে "History of the Cotton Manufacture of Dacca District" এবং যতীন্দ্রমোহন রায়ের "ঢাকার ইতিহাস" গ্রন্থে যে বিবরণ আছে তা পঠিতব্য।

৪। ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগীজদের একাধিক সোরার কারখানা ছিল ছাপরা জেলায়।

৫। ঘি মাখনের ব্যবসা ভারতের অন্যতম ব্যবসা। তার মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিকাও প্রধান।

বাংলার জলবায়ু

বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল। ডাচ ও ইংরেজরা যখন প্রথম বাংলাদেশে আসে তখন তাদের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। 'আমি একবার বালাসোরের বন্দরে দুটি বৃটিশ জাহাজকে অবস্থান করতে দেখেছিলাম। প্রায় এক বছর কাল জাহাজ দুটি বন্দরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ হল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছিল বলে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের কোনো উপায় ছিল না। এক বছর পরে যখন জাহাজ দুটির দেশে ফিরে যাবার সময় হল তখন দেখা গেল যে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার মতন লোকজন বা নাবিক-লস্কর নেই। জাহাজের অধিকাংশ নাবিক-লস্করই অসুখে ভুগে মারা গেছে। কিছুকাল পরে অবশ্য ডাচ ও ইংরেজরা আরও সাবধানে থাকতে আরম্ভ করে, এবং অসুখ-বিসুখের প্রাবল্যও কমে যায়। জাহাজের কাপ্তেনরা লক্ষ্য রাখেন যাতে জাহাজের লস্কর নাবিকরা বেশি সুরাপান না করে, এবং এদেশীয় নারীর সংস্পর্শে আসতে না পারে। তাতে কিছুটা রোগব্যাধির উপদ্রব কমে যায়। সুরা সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্যানারি বা গ্রেভ বা শিরাজ জাতীয় সুরা খারাপ জলবায়ুতে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে মন্দ নয়, পরিমিত পানে ক্ষতি হয় না। সুতরাং

ভারতের এই ঘিয়ের ব্যবসার প্রাধান্যের কথা বোঝা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের এই হিসেব থেকে।

তিন মাসের হিসেব (এপ্রিল-জুন)

	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১
পরিমাণ : (পাউণ্ড)	৪৬৯,৫৮১ :	৬১১,২৫৪ :	৫৩০,৫৪৩
মূল্য : (টাকা)	১,৬৯,৯০৫ :	২,২৬,৯৪০ :	২,০০,১১৭

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘিয়ের ব্যবসা বাংলাদেশে যে কি রকম চলত, তা পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির ঘিয়ের ব্যবসার কাহিনী থেকেই বোঝা যায়। তাঁর জীবনচরিত থেকে এই ব্যবসায়ের কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তর্কবাচস্পতি মহাশয় বীরভূমে প্রত্যেক বিঘায় দুই আনা কর ধায় করিয়া দশ হাজার বিঘা জঙ্গলভূমি চাষ করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষিকার্যোপযোগী পাঁচ শত গরু ক্রয় করেন। যে সকল গাভী ক্রয় করিতেন, তাহাদের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হইত, তাহা কলিকাতায় আনাইয়া বিক্রীত হইত। তৎকালে রেলের পথ হয়নাই, সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ ঘৃত কলিকাতায় আনাইতেন। উক্ত কার্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন।" (শ্রীশম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন : তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত ; ১৩০০ সাল ; পৃষ্ঠা ২৪)।

একটু হিসেব করে সংযত হয়ে চললেই স্বাস্থ্যহানির কোনো কারণ ঘটতে পারে বলে আমার মনে হয় না। মৃত্যুর হারও অনেক পরিমাণে কমে যেতে পারে। বুলেপঞ্জ নামে এক জাতীয় দেশী মদ আছে যা গুড় থেকে তৈরি হয় এবং এদেশী লোক লেবু জল ইত্যাদি মিশিয়ে পান করে। আস্বাদ খুব ভাল, পানীয় হিসাবেও মনোরম, কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর স্বাস্থ্যের পক্ষে।৬

৬। 'বুলেপঞ্জ' কথাটি মনে হয়, দুটি কথার বিচিত্র সংমিশ্রণ এবং বার্নিয়ের তাকে দেশী মদের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'Bowl' ও 'Punch' এই কথা দুটির পরিণতি হয়েছে বুলেপঞ্জ। H. Meredith Parker নামে জনৈক সিভিলিয়ান (নিম্নবঙ্গে সুপরি৩৫) 'Bole Ponjis containing the tale of the Buccaneer, A bottle of Red Ink, The Decline and Fall of Ghosts and other Ingredients 2 Vols.'—নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৫১ সালে। এ নাম নিয়ে অবশ্য আরও অনেক বিদেশী লেখক করেছেন। ওভিংটন (Ovington) তাঁর 'A Voyage to Suratte in the year 1689 (London, 1696)' গ্রন্থে লিখেছেন বাংলাদেশের দেশী মদ সম্বন্ধে: Bengal is a much stronger spirit than that of Goa, though both are made use of by the Europeans in making punch.

বার্নিয়ের ও তাভার্নিয়েরের (Tavernier) বাংলাদেশের বিবরণের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। খাদ্যশস্য বা পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে বার্নিয়ের যা বলেছেন, প্রায় সেই ভাষায় দেখা যায় তাভার্নিয়েরও তাই বলেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য তাভার্নিয়েরের বর্ণনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল।

বাংলাদেশের চিনি প্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের বলেছেন: 'This kingdom (Bengal) also abounds in Sugar so that it furnishes with it the Kingdoms of Golkonda and Karnatec.' (Tavernier, Vol. II, P. 140)

বাংলাদেশের তুলা ও রেশমপ্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের বলেছেন: 'As to the commodities of great value, and which draw the commerce of Strangers thither (to Bengale) I know not whether there be a Country in the world that affords more and greater variety for besides Sugar there is store of cottons and silks, that it may be said that Bengale is as it were the general magazine thereof, not only for Indostan but also for all the circumjacent Kingdoms and for Europe itself.' (Tavernier, Vol II, P. 140 f.)

বাংলাদেশের মাখনপ্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের বলেছেন: 'Butter is to be had there in so great plenty.' (Tavernier, Vol. II, P. 141)

বিদেশীদের আকর্ষণপ্রসঙ্গে তাভার্নিয়ের বলেছেন: 'In a word, Bengale is a country abounding in all things; and it is for this very reason that so many Portugueses, Mesticks and other Chirstians are fled thither..' (Vol. II, P 140.)

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার আগে মনে রাখা দরকার যে রাজমহল থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত প্রায় তিনশ মাইল লম্বা গঙ্গার উভয় তীর সে-দেশের শোভাবর্ধন করছে। এর মধ্যে অসংখ্য খাল আছে, যা পণ্যদ্রব্যের চলাচলের সুবিধার জন্য এবং জলপ্রবাহের জন্য সুদূর অতীত কালে কাটা হয়েছে।[৭] মানুষের দৈহিক মেহনতের এ এক অপূর্ব ভাবনীয় নিদর্শন। এই সব খালের দুই দিকে সারিবদ্ধ নগর ও গ্রাম গড়ে উঠেছে। লোকজনের বসতিও যথেষ্ট আছে। তার মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত, আখক্ষেত, ফসলক্ষেত, নানারকমের সব্জি বাগান, সরষে ও তিলের ক্ষেত, আর দুই-তিন ফুট উঁচু তুঁতগাছের সারি রেশমি গুটীপোকার খাদ্যের জন্য বিরাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে লোভনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হল, গঙ্গার দুই তীরের মধ্যবর্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলি। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেতে দু-সাতদিনও লেগে যায় অনেক সময়। ছোট বড় নানা আকারের দ্বীপ সব, কিন্তু একটি বিশেষত্ব সকলেরই আছে—এমন শস্যশ্যামলা উর্বরা দ্বীপ সচরাচর দেখা যায় না। প্রত্যেকটি দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে ঘেরা, তার মধ্যে নানারকমের ফলের গাছ, আনারসের বাগান। হাজার হাজার আঁকাবাঁকা খাল নালা তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে, কতদূরে যে তা বলা যায় না, একেবারে দৃষ্টির অগোচরে। এ থেকে দেখলে মনে হয় যেন দ্বীপের মধ্যে গাছের বাঁকানো তোরণশ্রেণী দিয়ে সাজানো আঁকাবাঁকা পথ সব।

মগ দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী

সমুদ্রের কাছকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় জনবসতিশূন্য হয়ে গেছে। প্রধানত আরাকানের জলদস্যু বা বোম্বেটেদের অত্যাচারে এই সব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গেছে।[৮] এখন এই দ্বীপগুলি দেখলে মনে হয় না যে এককালে এখানে

৭। বার্নিয়ের যে সব কাটা খালের কথা এখানে বলেছেন, তার অধিকাংশই অবশ্য কাটা খাল নয়। নদ নদীর প্রাচুর্য দেখে এবং তার পাশের বাঁধগুলো দেখে বার্নিয়েরের মনে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে নদীগুলি মানুষের মেহনতে কাটা খাল ছাড়া কিছু নয়। আসলে বার্নিয়ের যাকে খাল বলেছেন তার অধিকাংশই হল নদী।

৮। বার্নিয়ের এর পূর্বেও মগদস্যুদের লুণ্ঠনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন (এই গ্রন্থের ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার যে কতদূর পর্যন্ত চরমে উঠেছিল এবং বাংলার

লোকালয় ছিল। ধূ-ধূ করছে জনমানবশূন্য গ্রামের পর গ্রাম। মানুষ নেই, বন্য জন্তুর উপদ্রব বেড়েছে তার বদলে। একসময় সেখানে মানুষের বসবাস ছিল, এখন সেখানে হরিণ শুয়োর আর বন্যকুক্কুট চরে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে। তারই আকর্ষণে বাঘেরও আনাগোনা আছে সেখানে। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে অনেক সময় বাঘগুলো সাঁতার দিয়ে চলে যায়। নদীর উপর সাধারণত ছোট ছোট নৌকায় করে চলে বেড়াতে হয়। এ ছাড়া নদীপথে চলাচলের আর অন্য কোনো যান নেই। নৌকা থেকে এই সব দ্বীপের যে কোনো স্থানে অবতরণ করার বিপদ আছে অনেক। তার কারণ, স্থানগুলি নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা নৌকা কোনো গাছের ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তীরে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে রাতের ঝোঁকে নৌকার যে-কোনো আরোহীকে বাঘে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে। এরকম দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে থাকে। রাতে তীরে নৌকা নোঙর করে আরোহীরা যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, তখন বাঘ এসে সন্তর্পণে ঢোকে নৌকার ভিতর এবং শিকার ধরে নিয়ে চলে যায়। এ-অঞ্চলের মাঝিমাল্লাদের মুখে এরকম কাহিনী অনেক শোনা যায়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যে কি ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন বংশের (প্রধানত ব্রাহ্মণ) কুলজী থেকে তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সংকলন করেছেন (প্রবাসী চৈত্র ১৩৫১)। বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারও দেখা যায় মগের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পায়নি। মগের এই দৌরাত্ম্যের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে 'মগদোষ' বলা হয়। কুলপঞ্জী ও এই মগাদিদের বিবরণের মধ্যে ঘটকেরা অজ্ঞাতসারে বহু করুণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন কুলপঞ্জী (হাতেলেখা) থেকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এগুলি যদি উদ্ধার না করতেন, তাহলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের কথা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারতাম না।

কুলগ্রন্থ থেকে মগদৌরাত্ম্যের কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করছি (ক) 'বন্দ্যঘটী অর্থাৎ ব্যানার্জি বংশের একটি বিখ্যাত শাখা 'সাগরদিয়া' নামে পরিচিত। এই শাখায় জহ্নু প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। তাঁর এক পৌত্র (বলভদ্রের পুত্র) শ্রীপতির নাম ধ্রুবানন্দ তাঁর 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শ্রীপতি ১৫০০ সনে জীবিত ছিলেন। তাঁর এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়: 'ততো বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যা মগেন নীতা সর্বনাশাজ্জানিঃ।' এই ঘটনা আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬০০-১৬৫০ সাল) ঘটে। রামচন্দ্রের বাড়ি কোথায় ছিল জানা যায় না। কুলাবস্থান থেকে মনে হয়, নদীয়া যশোহর অঞ্চলেই তাঁর বাস ছিল।

(খ) উক্ত রামচন্দ্রের এক ভাইয়ের নাম রাঘব। তিনিও ঐ একই অঞ্চলের বাসিন্দা বলে মনে হয়। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ চাঁদ মগবংশে বিবাহ করেন। কিন্তু—'চাঁদস্য পিতৃতন্ত্রকালে মৃ

পিপ্‌লি বন্দর থেকে হুগলীর পথে বার্নিয়ের

পিপলি বন্দর[১] থেকে হুগলী পর্যন্ত আমার নৌকাযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা এইভাবে বর্ণনা করব। এই সব দ্বীপ ও ছোট ছোট অসংখ্য খালনালার ভিতর দিয়ে পিপ্‌লি থেকে নদীপথে নৌকায় করে আমার হুগলী পৌঁছতে প্রায় নয় দিন লেগেছিল। সেই নৌকাযাত্রার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে আছে আজও। এমন কোনো দিন যায়নি, যেদিন নতুন কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিনি। হয় কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা, অথবা দুঃসাহসিক কোনো ঘটনা, একটা-না-একটা কিছু ঘটেছে। যে-নৌকায় আমি যাত্রা করেছিলাম সেটি একখানি সাতদাঁড়যুক্ত নৌকা। পিপলি থেকে বেরিয়ে যখন আমরা প্রায় দশ-বারো মাইল জলপথ পার হয়ে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়েছি, উপকূল ধরে তখন এই সব দ্বীপ ও খালের দিকে যেতে যেতে দেখলাম, বড় বড় রুইমাছের মতন মাছের ঝাঁক তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে একজাতীয় তিমি মাছ। মাছগুলোর কাছাকাছি নৌকা নিয়ে যেতে বললাম মাঝিদের। কাছে গিয়ে মনে হল, মাছগুলো যেন মড়ার মতন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। দু-চারটে মাছ মন্থরগতিতে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে, আর বাকিগুলো যেন দিশাহারা ও বিহ্বল হয়ে প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার জন্য। আমরা হাত দিয়েই প্রায় গোটা চব্বিশ মাছ ধরলাম এবং দেখলাম

— —

যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিনাশ জ্ঞাত সাধুঃ পশ্চাৎ মগেন নীতা। পরে বাকি তার ভাইকেও মগ দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়—'চাঁদ বিনোদ রাঘারাম যদু মধু মগেন নীতা। কেবল তাই নয়, তার তিন ভগ্নীকেও মগেরা নিয়ে যায়—'কন্ত. স্বরূপা মণিরূপা রূপ রমঞ্জরী এতাঃ কন্যাঃ মগেন নীতা সর্বনাশাজ্জানিঃ।'

(গ) খড়দহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন যোগেশন ভগীরথপুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে: 'কৃষ্ণচরণস্য ফিরাঙ্গি অপবাদের বিক্রমপুর কাঁটালতলি গ্রামে।' কৃষ্ণচরণের ভাই রামদেব সম্বন্ধে লেখা আছে 'রামদেবস্য ফিরাঙ্গিতে নীতা মগসংপর্কঃ।' রামদেব নিঃসন্তান ছিলেন। একটি গ্রন্থে কৃষ্ণচরণ নামে একটি কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে—

'কৃষ্ণচরণ বন্দ্যাবর পাইয়া ফিরিঙ্গি ডর
কাঁঠালতলা কবি পরিত্যাগ।'

১। পিপ্‌লি বা পিপলিপত্তন বলে পরিচিত। একদা উড়িষ্যার উপকূলে, সুবর্ণরেখা নদী থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে, বিখ্যাত বন্দর ছিল। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা এখানে পর্তুগীজদের কুঠির বদলে একটি নতুন কুঠি স্থাপন করেছিলেন বাণিজ্যের জন্য। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য অনেক বন্দরের মতন পিপ্‌লিপত্তনেরও পতন হয়। এখানেই বার্নিয়ের পূর্বোল্লিখিত ইংরেজদের বাণিজ্যপোত দেখেছিলেন।

মাছগুলোর মুখ দিয়ে ব্লাডারের মতন রক্তাভ একরকম কি যেন বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হল এই ব্লাডারের সাহায্যেই বোধ হয় মাছগুলো ভেসে বেড়ায়, ডুবে যায় না। কিন্তু তাহলেও এগুলো এইভাবে মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে কেন বুঝতে পারলাম না। ডলফিন বা তিমিমাছের তাড়া খেয়ে ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করতে গিয়ে হয়ত এই ব্লাডারটা পেটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং রক্তাভ হয়েছে। কথাটা অন্তত শতাধিক নাবিক ও মাঝির কাছে বলেছি এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেছি। অনেকেই আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি। একজন ডাচ নাবিক মাং আমাকে বলেছিল যে বড় নৌকা করে চীনের উপকূল দিয়ে যেতে যেতে সে এইরকম মাছ দেখেছে এবং ঠিক আমাদেরই মতন হাত দিয়ে অনেক মাছ ধরেছে।

পরদিন বেলা পড়ে গেল, আমাদের নৌকা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ধীরে ধীরে চলল। এমন একটি স্থান আমরা নোঙর করবার জন্য বেছে নিলাম যেখানে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। সেইখানে নেমে আমরা সেদিনের মতন (রাতে) বিশ্রাম নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। তীরে নেমে প্রথমে আগুন জ্বালানো হল তারপর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বললাম, আমার খাবার জন্য গোটা দুই রুটী আর কয়েকটা মাছ তৈরি করতে। তাই দিয়ে বেশ ভালভাবেই সান্ধ্য-ভোজন শেষ করা গেল। মাছগুলোর স্বাদ খুব চমৎকার। তারপর আবার নৌকায় উঠে মাঝিদের বললাম, রাত পর্যন্ত নৌকা বাইতে। রাতের অন্ধকারে খালের আঁকাবাঁকা পথ চিনে নৌকা চালানো খুবই কঠিন। যে-কোনো সময় পথ হারিয়ে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং বড় খাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারের আগে বেরিয়ে এসে আমরা একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে রাত কাটাবার সঙ্কল্প করলাম। একটি বড় গাছের মোটা ডালে নৌকাটি বাঁধা হল শক্ত করে। তীর থেকে অনেকটা দূরে নৌকা সরিয়ে রাখা হল, বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য। রাতে বসে আছি নৌকায়, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় প্রকৃতির এক বিচিত্র রূপ আমার নজরে পড়ল। দিল্লীতে থাকাকালীন এরকম দৃশ্য বারদুই দেখেছিলাম মনে আছে। দেখলাম, চাঁদের রামধনু। নৌকার সঙ্গীদের সব ঘুম থেকে ডেকে তুললাম দেখাবার জন্য। সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমার নৌকায় দুজন পর্তুগীজ নাবিক ছিল। এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি তাদের আমার নৌকায় স্থান দিয়েছিলাম। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়ে গেল সেই পর্তুগীজ নাবিক দুজন। তারা বলল যে এরকম রামধনু

তারা এর আগে আর কখনও কোথাও দেখেনি এবং কারও কাছে শোনেওনি রাতের এই রামধনুর কথা।

তৃতীয় দিন আমরা খালের মধ্যে একরকম পথ হারিয়ে প্রায় নিখোঁজ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম বলা চলে। কাছাকাছি দ্বীপে কয়েকজন পর্তুগীজ লবণ তৈরির কাজ করত। তারাই আমাদের সে-যাত্রা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। তারা না থাকলে আমাদের পক্ষে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। সেই রাতে আবার আমরা একটি ছোট খালের মধ্যে নৌকা ভিড়ালাম। আমার পর্তুগীজ সঙ্গীরা তার আগের দিন ঐ রকম বিচিত্র দৃশ্য দেখে সেই রাতে আর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেনি। আকাশের দিকে চেয়ে জেগে ছিল তারা। ঘুম থেকে সে রাতে তারা আমাকে ডেকে তুলল, আবার ঐ রামধনুর দৃশ্য দেখবার জন্য। ঠিক সে দিনের রামধনুর মতনই সুন্দর ও মনোহর। কোনো আলোকমণ্ডল বা তারকামণ্ডলকে যে আমি ভুল করে রামধনু বলছি তা নয়। বর্ষাকালে দিল্লীতে সে-রকম তারকামণ্ডল আমি আকাশ আলোকিত করতে বহুবার দেখেছি। কিন্তু সাধারণত সেগুলি অনেক উঁচুতে দেখা যায়। পর পর তিন-চার রাত ধরে আমি দেখেছি এবং মধ্যে মধ্যে দ্বিগুণ আকারেও দেখেছি। কিন্তু আমি যে আলোকমণ্ডলের কথা বলছি তা চন্দ্রকে ঘিরে বৃত্তাকারে উদ্ভাসিত নয়। চাঁদের বিপরীত দিকে, ঠিক দিনের আলোর রামধনুর মতন উদ্ভাসিত। যখনই রাতের এই রামধনু দেখেছি তখনই দেখেছি চাঁদ রয়েছে পশ্চিমে, আর ঐ আলোকমণ্ডল পুবে। চাঁদ মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদ। তা না হলে ঐ রকম আলোকরেখা বিচ্ছুরিত হয়ে রামধনুর আকার ধারণ করত না। আলো যে খুব উজ্জ্বল সাদা তা নয়। নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সুতরাং আমি প্রাচীনদের চাইতে অনেক বেশি ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ দার্শনিক আরিস্ততেলের মতে, তাঁর আগের যুগের কেউ চাঁদের রামধনু চোখে দেখেনি কোনোদিন।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার বড় খাল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট খালের মধ্যে ঢুকলাম নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সেই রাতটি একটি স্মরণীয় রাত। হঠাৎ যেন চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেল মনে হল। পরিপার্শ্ব থমথমে হয়ে উঠলো। হাওয়ার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, অনুভবও করা যায় না। বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল যেন আমাদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসেরও কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমে বাতাস বেশ গরম হয়ে উঠল। চারিদিকের ঝোপে-ঝাড়ে

জোনাকি পোকাগুলো এমনভাবে জ্বলছিল যে মনে হচ্ছিল যেন বনে আগুন ধরে গেছে। তারই মধ্যে আবার সত্যই আগুনের মত কি যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠছিল। দূরে গভীর বনের মধ্যে যেন আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। মাঝিরা বেশ ভীত হয়ে উঠল দেখলাম। তাদের বিশ্বাস, এসব বনের ভূতপ্রেতের অপকৌশল ছাড়া কিছু নয়। আগুনের এই বিচিত্র লীলার মধ্যে দুটি দৃশ্যের কথা আমার বেশ মনে আছে। একটি গোলাকার বলের মতন আগুন, আর একটি প্রজ্বলিত বৃক্ষের মত দেখতে। মিনিট পনরো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল।

পঞ্চম রাত্রিটি সবচেয়ে বিপজ্জনক ও মারাত্মক হয়েছিল। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। এমন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল যে হঠাৎ যে আমরা গাছপালার মধ্যে নিরাপদে থেকেও এবং আমাদের নৌকা বেশ শক্ত করে বাঁধা থাকলেও প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল যেন আমরা ছিটকে গিয়ে বড় খালের মধ্যে পড়ে কোথায় তলিয়ে যাব। তাই গেলামও, কারণ নৌকাদড়ি ঝড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ আমাদের মাথায়, কতকটা প্রাণের দায়ে, বুদ্ধি খেলে গেল। আমরা তৎক্ষণাৎ (আমি ও আমার দুজন পর্তুগীজ সঙ্গী) গাছের ডাল প্রাণপণে আকড়ে ধরে ঝুলতে লাগলাম। প্রায় দু-ঘণ্টা এইভাবে ঝুলে রইলাম ডাল ধরে। প্রবল বেগে ঝড় বইতে লাগল। আমার ভারতীয় মাঝিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল। কেউ আমরা কারও দিকে চেয়ে দেখবার সুযোগ পাইনি। গাছের ডাল ধরে ঝড়ের মধ্যে যখন আমরা ঝুলে ছিলাম, তখন আমাদের রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। কলকল করে অঝোরে বর্ষণ হচ্ছিল এবং এমন সশব্দে চারিদিক আলোকিত করে বজ্রপাত হচ্ছিল যে আমাদের প্রতি মহূর্তেই মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি মাথায় পড়বে। এইভাবে সে-রাত আমাদের কাটল। কোনোরকমে আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম।

বাকি পথটা আমাদের ভালই কেটেছিল, বেশ আরামে। নয় দিনের দিন আমরা হুগলী (Ogouly) পৌছলাম চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, গঙ্গার উভয় তীরের মনোরম দৃশ্য দেখে চোখাজুড়িয়ে গেল। চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে সেই দিকে। নৌকা গঙ্গার বুকে ভেসে চলল। হুগলী পৌছলাম। আমার বাক্স-পেটরা, জামা-কাপড় সব ভিজে গেছে তখন। মুর্গীগুলো মরে গেছে, মাছের অবস্থাও তথৈবচ এবং বিস্কুটগুলো সব জলে ভিজে ফুলে ফেপে উঠেছে।

Marx to Engels

London, 2 June, 1853

About the Hebrews and Arabians your letter interested me very much For the rest 1 A *general* relationship can be proved among all Oriental tribes, between the settlement of one section of the tribe and the continuance of the other in nomadic life, since history began. (2) In Mohammed's time the trade route from Europe to Asia had been considerably modified and the cities to Arabia, which took a great part in the trade to India, etc were in a state of commercial decay, this in any case contributed to the impulse. (3) As to religion, the question resolves it elf into the general and therefore easily answered one why does the history of the East *appear* as a history of religions ?

On the formation of Oriental cities one can read nothing more brilliant, vivid and striking than old Francois Bernier (nine years physician to Aurengzebe) *Voyages contenant la description des etats du Grand Mogol, etc.* [*Travels Containing a Description of the States of the Great Mogul, etc*] He also describes the military system, the way these great armies were fed, etc , very well On these two points he remarks, among other things "The cavalry forms the principal section, the infantry is not so big as is generally rumoured, unless all the servants and people from the bazars or markets who follow the army are confused with the real fighting force , for in that case I could well believe that they would be right in putting the number of men in the army accompanying the king along at 200,000 or 300,000 and sometimes even more, when for example it is certain that he will be a long time absent from the principal town. And this will not appear so very astonishing to one who knows the strange encumbrance of tents, kitchens, clothes, furniture and quite frequently even of women, and consequently also the elephants, camels, oxen, horses, porters, foragers, provision sellers, merchants of all kinds and servitors which these

armies carry in their wake ; or to one who understands the particular state and government of the country, namely that the *king is the sole and only proprietor of all the land** in the kingdom, from which it follows by a certain necessary consequence that the whole of a *capital city** like Delhi or Agra lives almost entirely on the army and is therefore obliged to follow the king if he takes the field for any length of time For these towns are and cannot be anything like a Paris, *being properly speaking nothing but military camps,** a little better and more conveniently situated than in the open country."

On the occasion of the march of the Great Mogul into Kashmir with an army. of 400,000 men, etc. he says : "The difficulty is to understand whence and how such a great army, such a great number of men and animals, can subsist in the field. For this it is only necessary to suppose, what is perfectly true. that the Indians are very sober and very simple in their food, and that of all that great number of horsemen not the tenth nor even the twentieth part eats meat during the march. So long as they have their *kicheri*, or mixture of rice and other vegetables over which when it is cooked they pour melted butter, they are satisfied. Further it is necessary to know that camels have extreme endurance of work, hunger and thirst, live on little and eat anything, and that as soon as the army has arrived the camel drivers lead them to graze in the open country where they eat everything they can find. Moreover, the same merchants who keep the bazaars in Delhi are forced to maintain them in the country too, likewise the small merchants, etc.… And finally with regard to forage, all these poor folk go roaming on all sides in the villages to buy and to earn something, and their great and common resort is to scrape whole fields with a sort of small trowel, to crush or cleanse the small herb which they have scratched up and to bring it to sell to the army.…"*

* Underlined by Marx.

* Quated from the French.

Bernier rightly considers that the basic form of all phenomena in the East—he refers to Turkey, Persia, Hindustan—is to be found in the fact that *no private property in land existed* This is the real key, even to the Oriental heaven

ENGELS TO MARX

[Manchester] 6 June [1853]

The absence of property in land is indeed the key to the whole of the East Here lies its political and religious history But how does it come about that the Oriental do not arrive at landed property, even in its feudal form ? I think it is mainly due to the climate, together with the nature of the soil, especially with the great stretches of desert which extend from the Sahara straight across Arabia, Persia, India and Tartary up to the highest Asiatic plateau. Artificial irrigation is here the first condition of agriculture and this is a matter either for the communes, the provinces or the central government And an Oriental government never had more than three departments finance (plunder at home), war (plunder at home and abroad), and public works (provision for reproduction). The British government in India has administered numbers 1 and 2 in a rather more formal manner and dropped number 3 entirely, and Indian agriculture is being ruined Free competition discredits itself there completely. This artificial fertilisation of the land, which immediately ceased when the irrigation system fell into decay, explains the otherwise curious fact that whole stretches which were once brilliantly cultivated are now waste and bare (Palmyra, Petra, the ruins in the Yemen, districts in Egypt, Persia and Hindustan) ; it explains the fact that one single devastating war could depopulate a country for centuries and strip it of its whole civilisation. Here too, I think, comes in the destruction of the Southern Arabian trade before Mohammed, which you very rightly regard as one of the chief factors in the Mohammedan revolution. I do not know the trade history of the

first six centuries after Christ thoroughly enough to be able to judge how far general material world conditions caused the trade routes through Persia to the Black Sea and through the Persian Gulf to Syria and Asia Minor to be preferred to the route over the Red Sea. But in any case the relative security of the caravans in the ordered Persian Empire of the Sassanids was not without considerable effect, while between the years 200 and 600 the Yemen was almost continuously subjugated, invaded and plundered by the Abyssinians The cities of Southern Arabian, which were still flourishing in the time of the Romans, were sheer ruined wastes in the seventh century , within five hundred years the neighbouring Bedouins had adopted purely mythical, fabulous traditions of their origin (See the Koran and the Arabian historian Novairi), and the alphabet in which the inscriptions in that part are written was almost totally unknown, *although there was no other*, so that even *writing* had actually fallen into oblivion Things of this sort imply, besides a "superseding" caused by some kind of general trade conditions, some absolutely direct and violent destruction which can only be explained by the Ethiopian invasion The expulsion of the Abyssinians took place about forty years before Mohammed and was obviously the first act of the awakening Arabian national consciousness, which was also spurred by Persian invasions from the North, pushing forward almost to Mecca. I am only starting on the history of Mohammed himself in the next few days , up till now, however, the movement has seemed to me to have the character of a Bedouin reaction against the settled but degenerate fellahin of the towns, who at that time had also become very decadent in their religion, mingling a corrupt nature-cult with corrupt Judaism and Christianity.

Old Bernier's things are really very fine. It is a real delight once more to read something by a sober old clear-headed Frenchman, who keeps hitting the nail on the head without appearing to notice it.…

Marx and Engels : Selected Correspondence ; translated and edited by Dona Torr ; London 1943, Letters 22 and 23.